শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩৩শ বর্ষ, ৩৩শ খণ্ড ১ম সংখ্যা। | বৈশাখ। | ১৩৩৩ সাল। ১৮৪৮ শকাব্দাঃ

নববর্ষ।

পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া আমরা আজ নববর্ষকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি। অতীতের অভাব-অভিযোগ ও দুর্ব্বলতাকে বিদায় দিয়া, বর্ত্তমানের উদ্যম ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং ভবিষ্যতের আশা ও আকাঙ্ক্ষা বক্ষে ধারণ করিয়া আমরা আবার কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতেছি।

হিন্দু-পত্রিকা আজ ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই সুদীর্ঘকাল সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্বের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া হিন্দু-পত্রিকা হিন্দুজাতির সেবা করিয়া আসিতেছে। হিন্দু-পত্রিকা-কার্য্যালয় যশোহরে অবস্থিত। যশোহর ম্যালেরিয়ার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। প্রেসের কর্ম্মচারিগণের অসুস্থতা নিবন্ধন গতবৎসর বহু চেষ্টা করিয়াও আমরা হিন্দু-পত্রিকার প্রকাশ নিয়মিত করিতে পারি নাই। তজ্জন্য পাঠক পাঠিকাগণের নিকট ক্রটী স্বীকার করিতেছি, এবং ভবিষ্যতে যাহাতে নিয়মিত প্রকাশের পক্ষে কোনও বিঘ্ন না ঘটে তজ্জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিব।

হিন্দু আজ ধ্বংসোন্মুখ জাতি। ভিতরের অনাচারে এবং বাহিরের অত্যাচারে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট আজ লুপ্ত প্রায়। অত্যুদার হিন্দুধর্ম্ম আজ লোকচা সঙ্কীর্ণতার নামান্তর-মাত্র। যে ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব, বিশ্ব-ব্যাপকতা ও সার্ব্বজ দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার অঙ্গে অনুদারতা বা সঙ্কীর্ণতার কে লেপন করিয়াছে? যেই করুক, হে হিন্দু সন্তান! তোমা মুছিতেই হইবে। হে অমৃতের পুত্র, তোমাকে আজ মৃ করিতেই হইবে। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু!

সনাতনধর্ম্মের মূল তত্ত্ব।

লেখক—সম্পাদক।

শাশ্বতস্য হি ধর্ম্মস্য জন্মস্থানং মতং বুধৈঃ
পুণ্যভূর্ভারতং বর্ষং, নাম্না সিন্ধু-নদস্য হি
সিন্ধুতীর-নিবাসাংশ্চ নরান্ বৈদেশিকাঃ পুরা।
হিন্দুরিত্যাখ্যয়া প্রাহুর্জিহ্বাঽপাটবদোষতঃ।
তস্মাৎ সনাতনো ধর্ম্মো ভারতীয়োঽপরৈ র্নৃভিঃ
হিন্দুধর্ম্ম ইতি প্রোক্তো ভারতীয়ৈস্ততঃ পরম্।
তস্যৈব মূলতত্ত্বানি রত্নানীব মহান্তি বৈ
প্রকাশ্য কৃৎস্নে জগতি কৃতার্থং মাং সমর্থয়ে। ১

(১) পণ্ডিতদিগের মত এই যে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষই শাশ্বত (সনাতন) ধর্ম্মের জন্মস্থান। প্রাচীন সময়ে বিদেশীয় লোকেরা সিন্ধুনদের তীরবাসী মনুষ্যদিগকে জিহ্বাজড়তাবশতঃ "হিন্দু" নামে অভিহিত করিতেন। তজ্জন্য ভারতীয় সনাতনধর্ম্ম ভিন্ন-দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক 'হিন্দুধর্ম্ম' নামে অভিহিত হইতে থাকে। ক্রমে ভারতবাসীও সনাতনধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম-নামে অভিহিত করেন। সেই সনাতনধর্ম্মের অমূল্য রত্নস্বরূপ মূলতত্ত্বগুলি জগতে সম্যক্ প্রচার করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করি।

(১) 'হিন্দু' কাহাকে বলি,'হিন্দুধর্ম্ম' বলিলে কি বুঝায়—এই কথার আলোচনা করিতে গেলে জানা যায় যে, পূর্ব্বে সিন্ধুতীরবাসী বেদবিশ্বাসী আর্য্যবংশীয় জনগণকে বৈদেশিকেরা 'হিন্দু' বলিতেন। তাঁহারা সিন্ধুনদীকে ও তৎসমীপবর্ত্তিস্থানকে এবং সিন্ধুতীরবাসিদিগকে হিন্দু বলিতেন। 'সপ্ত সিন্ধু'কে তাঁহারা 'হপ্তহিন্দু' বলিতেন। সপ্তসিন্ধুর নাম এই—সিন্ধু বা ইণ্ডাস, বিতস্তা বা ঝিলাম্, পরুষ্ণী ইরাবতী বা রাবী, অসিক্লী চেনাব্ বাচন্দ্রভাগা, বিপাশা বা বিয়াস, শতদ্রু বা স ট্লেজ এবং সরস্বতী। কেহ কেহ বলেন—কুভ্য বা কাবুল নদী। আবেস্তাতে ভারতবর্ষের নাম ছিল "হিন্দু"। প্রাচীন পারসীকভাষায় ভারতবর্ষকে 'হিন্দু' বলা হইত। 'হিন্দু' কথার 'ন'-কারের উচ্চারণ হইত না। হিদু ও হিন্দু সিন্ধুশব্দ হইতে উৎপন্ন। আবেস্তায় ভেন্দিদাদের প্রথম অধ্যায়ে অহুর মজ্দা (অসুর ময়) যে সমস্ত দেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমস্থ অংশের নাম পাওয়া যায়। ঐদেশ 'হপ্তহিন্দু' বা সপ্তসিন্ধু নামে বর্ণিত আছে। ঐ দেশে ভীষণ গ্রীষ্ম হয়। বেদে উহাকে সপ্তসিন্ধু বলে। (ঋগ্বেদ ৮ম, ২৪ সূ, ২৭ মন্ত্র।) ঐ সকল বৈদেশিক মানব, জিহ্বাদোষে 'স' স্থানে 'হ' উচ্চারণ করিতেন। 'সপ্ত'কে তাঁহারা 'হপ্ত' এবং 'সিন্ধু'কে 'হিন্দু' বলিতেন। শেষে তাঁহাদের কাছে সমগ্র ভারতের অধিবাসীরাই 'হিন্দু' নামে অভিহিত হন। 'হিন্দু' শব্দ সংস্কৃত নহে। বেদাদিগ্রন্থে 'হিন্দু' শব্দ পাওয়া যায় না। প্রথমে বৈদেশিকেরা ভারতবাসীদিগকে 'হিন্দু' বলিতেন, শেষে ভারতবাসীরাও ঐ সুপরিচিত নামে নিজেদের পরিচয় দিতে থাকেন।

হিন্দুদের দেশ এখন হিন্দুস্থান নামে পরিচিত। হিন্দুদিগের বা ভারতবাসী আর্য্যসন্তানদিগের মধ্যে প্রথম যে ধর্ম্মের অভিব্যক্তি হয়, তাহার নাম ছিল ধর্ম্ম এবং তাহা সনাতন, কারণ তাহার কেহ কর্ত্তা ছিল না। সনাতন ধর্ম্মই পরে হিন্দুধর্ম্ম নাম পাইয়াছে। ভারতবাসীদিগের মধ্যে যে ধর্ম্মের প্রথম অভিব্যক্তি হয়, সে ধর্ম্মের মূল বেদ বা শ্রুতি। ভারতবাসীরা বেদকেই সর্ব্বোচ্চস্থান প্রদান করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস—বেদ ঈশ্বরের বাণী; উহাতে ভ্রমপ্রমাদের লেশও নাই। ভারতবাসীদের নাম—পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সনাতনধর্ম্মই হিন্দু-ধর্ম্ম নাম ধারণ করে।

শ্রুতি দুই প্রকার—বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। হারীত বলেন—"শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকীচ"। 'শ্রুতি' শব্দের অর্থ—নিরূপণে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—

'শ্রূয়ত এব, নতু কেনচিৎ ক্রিয়ত ইতি।' গুরুপরম্পরায় শ্রুত হইয়া আসিতেছে, কেহই প্রণয়ন করেন নাই। শ্রুতির সঙ্কলন হইয়াছে বহুবার। এই শ্রুতির মধ্যে বৈদিকী শ্রুতি বেদসংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ প্রভৃতি নানা নামে প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রুতির অর্থ-প্রকাশের জন্য ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ রচিত হয়। ঐ সকল গ্রন্থের স্বাতন্ত্র্য নাই। উহারা বেদানুগত হইলেই প্রমাণরূপে গৃহীত হয়, আর শ্রুতিবিরুদ্ধ হইলেই অ-প্রমাণ জ্ঞানে উপেক্ষিত হয়। এ বিষয়ে নিয়ম এই যে "শ্রুতিস্মৃতি বিরোধেতু শ্রুতিরেব গরীয়সী।" শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ হইলে শ্রুতির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। আরও দেখা যায়—'শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধোযত্র দৃশ্যতে। তত্র শ্রৌতং প্রমাণং স্যাত্ দ্বয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা।" শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে বিরোধ হইলে শ্রুতিই গ্রাহ্য; স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ হইলে পুরাণ অগ্রাহ্য, স্মৃতি গ্রাহ্য।

ধর্ম্মের লক্ষণ মহর্ষি মনুর মতে ৪ প্রকার যথা—শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মতুষ্টি। শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্যচ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্। এই সকলের দ্বারাই ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। শ্রুতির কথা বলা হইয়াছে। স্মৃতিকে সাধারণতঃ 'ধর্ম্ম শাস্ত্র' বলে। 'শ্রুতিস্তু বেদোবিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।' ধর্ম্মসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও সংহিতা নামে পরিচিত গ্রন্থসমূহ স্মৃতি। আপস্তম্ব প্রভৃতি-প্রণীত ধর্ম্মসূত্র, গোভিলাদি-প্রণীত গৃহ্যসূত্র, মনু অত্রি প্রভৃতির সংহিতা এ সবই স্মৃতি। পুরাণকে কেহ কেহ 'স্মৃতি'র মধ্যে গণনা করেন। শ্রুতি ও স্মৃতিতে ধর্ম্মতত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে।

এমন অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে, যাহার কথা শ্রুতি-স্মৃতিতে পাই না, কিন্তু প্রাচীনকাল হইতে ধার্ম্মিক লোকেরা উহা পালন করিয়া আসিয়াছেন, উহাও অনুষ্ঠেয়। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—"পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ স সদাচার উচ্যতে।" ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি দেশে সজ্জনগণের চিরপ্রচলিত যে আচার তাহাই সদাচার।

আত্মতুষ্টিও ধর্ম্মের লক্ষণ। আমরা বুঝি, যে কর্ম্ম করিলে আত্মতুষ্টি বা মনের প্রসাদ বা সন্তোষ জন্মে—তাহা ধর্ম্ম, আর যাহা করিতে মন চায় না, করিলেও মন অতৃপ্ত হয়—তাহা অধর্ম্ম। ইহাই আত্মতুষ্টির আসল কথা। ইহা শাস্ত্রেই আছে—যৎকর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ। তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতন্তু বর্জ্জয়েৎ।"

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে যাহা আছে, তাহাতে যদি আত্মতুষ্টি না হয়, তবে তাহাও ত্যাজ্য। বেদে অহিংসার কথা আছে, আবার বিহিত পশুবধের কথাও আছে। কিন্তু বিহিত পশুবধের কথা থাকিলেও উহাতে যাহার আত্মতুষ্টি হয় না, তাহার পক্ষে উহা অকর্ত্তব্য।

পরমেশ্বর-বিশ্বাসো ভক্তিশ্চেশ্বর-পাদয়োঃ
কায়েন মনসা বাচা সত্যসংসেবনং পরম্।
পরদ্রব্যে লোষ্টদৃষ্টির্মাতৃদৃষ্টিশ্চ যোষিতি
আত্মজায়াতিরিক্তায়াং, হিংসাত্যাগঃ শমোদমঃ।
জ্ঞান-বিজ্ঞান-সেবাচ ক্ষমাস্তিক্যং দয়াধৃতিঃ
বাহ্যাভ্যন্তর-শৌচঞ্চ ক্রোধত্যাগো নৃসেবনং।
চিন্তয়া কার্য্যতশ্চৈব পরমঙ্গল-সাধনম্।
এতৎ শাশ্বত-ধর্ম্মস্য লক্ষণং সমুদাহৃতম্।
এষু চিত্তং সমাধায় ব্রতমেতন্মহত্তরং
সাধয়িত্বা কৃতার্থোঽহংভবিষ্যামীতি মে মতিঃ। ২

পরমেশ্বরে বিশ্বাস, ভগবচ্চরণে ভক্তি, কায়মনোবাক্যে শ্রেষ্ঠবস্তু সত্যের সংসেবন, পরদ্রব্যে বিরাগ, স্বীয় পত্নী-ভিন্ন সমুদায় স্ত্রীলোকের প্রতি মাতৃজ্ঞান, অহিংসা, শম, দম, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেবা, ক্ষমা, আস্তিক্য, দয়া, ধৃতি, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, অক্রোধিতা, নরসেবা, চিন্তা ও কার্য্য দ্বারা পরহিত সাধন,—এইগুলি শাশ্বতধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া কথিত হয়। এই সকলে চিত্ত সন্নিবেশ করিয়া এই মহত্তর ব্রত সাধন করিয়া কৃতার্থ হইব—ইহাই আমার অভিমত। ২

(২) উপর্য্যুক্ত ভগবদ্‌বিশ্বাস প্রভৃতিই প্রকৃত ধর্ম্মের লক্ষণ। বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানবৈচিত্র্য প্রকৃত ধর্ম্মলক্ষণ নহে। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিচিত্র আহার-ব্যবহার ক্রিয়াকাণ্ড প্রকৃতধর্ম্ম হইতে বহুদূরে। কোনও বিশেষ স্থান অর্থাৎ মন্দির, মস্‌জিদ বা গির্জ্জা ভিন্ন অন্যত্র যে ভগবানের আরাধনা হয় না এরূপ নয়। ভগবান্ সর্ব্বময়, সর্ব্বত্রই তাঁহার আরাধনার স্থান। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত, ইস্‌লামশাস্ত্রীয়, বাইবেলানুমোদিত অথবা বৌদ্ধসম্মত কিংবা পারসীক সম্প্রদায়ের অনুমত পন্থা ভিন্ন যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, তাহাও নহে। যেরূপেই হউক, হৃদয় পবিত্র হইলে, তাঁহার কৃপা-লাভের সুযোগ উপস্থিত হয়।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বা মহাপুরুষগণের প্রবর্ত্তিত প্রথা-পদ্ধতি আচার-ব্যবহার

যে সর্ব্বদেশে সকল সময়ে সর্ব্বশ্রেণীর মানবের উপর সমভাবে কার্য্যকারী হইবেই এরূপ বিশ্বাস ভ্রান্ত। দেশকাল-পাত্রের পরিবর্ত্তনে ধর্ম্মকর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তন ঘটে, ইহা অমোঘ সত্য। সর্ব্বদেশে সকল সমাজেই বহুপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এখনও ঘটিতেছে। এই সকল পরিবর্ত্তন-দর্শনে "ধর্ম্মনাশ হইল" বলিয়া চীৎকার করিবার কারণ নাই। প্রাচীন সকল আচার এখন চলিতেই পারে না। বৈদিকযুগের প্রথাপদ্ধতি পৌরাণিক সময়ে অবিকল বজায় থাকে নাই। আবার স্মৃতির বা পুরাণের অনুশাসন এখন কড়ায় গণ্ডায় পালন করা অসম্ভব ও অনাবশ্যক। ধর্ম্মের বাহিরের খোসা লইয়া বৃথা বিবাদ না করিয়া, যাহা প্রকৃত সনাতনবস্তু পরমসত্য তাহারই উপর নির্ভর করা উচিত। আচার অনুষ্ঠান সময়ের স্রোতে যে ভাবে যেখানে গিয়া দাঁড়ায়, সেইভাবে সেইখানে রাখিয়াই তাহার সেবা করা কর্ত্তব্য।

শাশ্বতধর্ম্মের লক্ষণগুলি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতেই সেব্য। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্। ধৃতি, ক্ষমা, মনঃসংযম, পরস্বাপহরণ না করা, শুচিভাব, ইন্দ্রিয় সংযম, নৈতিকজ্ঞান, ঈশ্বরজ্ঞান, সত্য এবং অক্রোধ—এ গুলি সনাতনধর্ম্মের লক্ষণ। এগুলি যে শাশ্বতধর্ম্মের লক্ষণ তাহাতে সংশয় নাই।

শাশ্বতস্যাস্য ধর্ম্মস্য ত্বঙ্গভূতঃ স্মৃতঃ খলু
এষ বর্ণাশ্রমোধর্ম্মো ন স্বাতন্ত্র্যমতোঽর্হতি।
শাশ্বতস্যাস্য ধর্ম্মস্য মূলতত্ত্বৈঃ সমং সদা
বর্ণাশ্রমানুকূলস্য ধর্ম্মস্যাস্তি সমন্বয়ঃ।
সম্প্রদায়গতো ভেদো যথাপ্নোতি সমন্বয়ং
সম্প্রদায়িষু সৌহার্দ্দং যথা নিত্যং বিবর্দ্ধতে,
সামঞ্জস্যঞ্চ সর্ব্বত্র যথা স্থানং প্রপদ্যতে
তথা কৃত্বা জীবিতং মে সাফল্যং যাতু সাম্প্রতম্। ৩

বর্ণাশ্রমধর্ম্মও এই সনাতনধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ, সুতরাং উহার স্বতন্ত্রতা সঙ্গত নহে। এই শাশ্বতধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলির সহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সমন্বয় আছে। যাহাতে সাম্প্রদায়িক ভেদের সমন্বয় হয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের সৌহার্দ্দ বর্দ্ধিত হয়, সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য সাধিত হয়, তাহা করিয়া আমার জীবন সাফল্য-মণ্ডিত হউক্। (৩)

(৩) বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-রক্ষার জন্য সম্প্রতি অনেকে বদ্ধপরিকর। তাঁহারা বলেন—বর্ণাশ্রমধর্ম্মই হিন্দুর বিশেষত্ব। উহার লোপ হইলে হিন্দুর ধর্ম্মজীবন অন্তঃসারশূন্য হইবে——হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিক মৃত্যু সংঘটিত হইবে। আমরা তাঁহাদের কথার আলোচনা করিতে চাই। আমাদের বিশ্বাস—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সনাতনধর্ম্মের অঙ্গ। বর্ণবিভাগ ও আশ্রমবিভাগ অনুসারে যে আচার-অনুষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্য, সংক্ষেপে তাহারই নাম বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।

বর্ণ অর্থ রঙ্। গায়ের রঙের ভিন্নতাহেতু যে আচার—ব্যবহার বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপন, ও উপাসনাপদ্ধতি প্রভৃতির পার্থক্য ঘটিত, তাহাই প্রথম বর্ণভেদের রহস্য। গায়ের রঙ্ অনুসারে আচার-ব্যবহারের গণ্ডী প্রথমে ছিল না। প্রাচীনকালে যখন শ্বেতবর্ণ যজ্ঞকারী মানবগণ অন্যবর্ণের মনুষ্যের সংশ্রবে আসেন নাই, তখন তাঁহাদের মধ্যে একই বর্ণ ছিল; বর্ণভেদ ছিল না। ঐ অবস্থার বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই—এক এব পুরাবেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ। দেবোনারায়ণশ্চৈক একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ। পুরাকালে সর্ব্ববাঙ্ময় প্রণব একমাত্র বেদ ছিল। এক দেব ছিলেন নারায়ণ। একমাত্র অগ্নি ছিলেন। একটী মাত্র বর্ণ ছিল। এই একবর্ণ শ্বেতকায় আর্য্য বর্ণ। বেদে আমরা 'আর্য্য-বর্ণ' কথা পাই। 'প্রার্য্যং বর্ণমাবৎ" ইত্যাদি।

যখন শ্বেতকায় আর্য্যগণ কৃষ্ণকায় অনার্য্যগণের সংসর্গে আসিলেন, তখন বর্ণ-ভেদের সূচনা হইল। শ্বেতকায়গণের বিবাহাদি-ব্যাপার ও যজ্ঞাদি-প্রথা একরূপ, কৃষ্ণকায় অনার্য্যগণের অন্যরূপ। এই শ্বেত-কৃষ্ণভেদই প্রথম বর্ণভেদ। বর্ণিগণের স্বতন্ত্র আচারাদিই আদিম বর্ণধর্ম্ম। আর্য্যেতরগণের সংস্পর্শে দীর্ঘকাল বাসের পর যখন আর্য্যেতর জাতিরা আর্য্যসভ্যতা গ্রহণ করিল এবং উভয়ের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ আরব্ধ হইল, তখন অনেক রঙের লোক জন্মিল। তখন কেহ কালা, কেহ ধলা, কেহ মিশ্রিতবর্ণ হইল। তখন আর বর্ণানুসারে ধর্ম্ম চলিল না। (তখন সকল বর্ণেরই একরূপ ধর্ম্ম হইল।) তখন গায়ের রঙ্ ছাড়িয়া ব্যক্তিগত গুণানুসারে ধর্ম্মের বা কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান বিভিন্ন হইল। একই পিতামাতার সন্তানেরা উপযোগিতা অনুসারে ভিন্ন ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় গায়ের শ্বেতবর্ণ ছাড়িয়া আন্তরিক গুণ সাত্ত্বিকতাই শ্বেতবর্ণের স্থলে গৃহীত হইল। শাস্ত্রে যে কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদের কথা আছে, সে গুণের ভেদে। ধর্ম্ম তখন গায়ের রঙের জ্ঞাপক না হইয়া আন্তরিক গুণ ও তদনুযায়ী কর্ম্মের জ্ঞাপক হইল। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে পাই—নবিশেষোঽস্তি বর্ণানাং

সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্। বর্ণের ভেদ নাই, সমস্তই ব্রহ্মময়। ব্রহ্মা কর্তৃক একরূপে সৃষ্ট হইয়া পরে কর্ম্মানুসারে ভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে কর্ম্মগুণে বহু কৃষ্ণকায় ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলেন। কর্ম্মদোষে বহু শ্বেতকায় ব্যক্তিও শূদ্র হইলেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই ৪ জাতির উৎপত্তির মূলে গুণকর্ম্ম। আর্য্য অনার্য্যের মিশ্রিতসমাজে সুবিধার জন্য কর্ম্মভেদ বা ব্যবসায়-ভেদ প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বে এ ভাব ছিলনা। একই পরিবারস্থ লোকেরা তখন নানাকার্য্য করিতেন। পিতা হয় ত যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিতেন, পুত্র চিকিৎসা করিতেন, মাতা ময়দা পিষিতেন। এরূপ সকলে মিলিয়া প্রয়োজনমত ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতেন। দীর্ঘকাল পরে সমাজের পুষ্টি হইল; শ্রমবিভাগের প্রবর্ত্তন প্রয়োজন হইল। তখন ব্যবসায় দ্বারা বিভিন্ন গণ্ডী—সৃষ্টির সূচনা হইল। সমাজ প্রথম ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। এক সম্প্রদায় বিদ্বান্ ও পূতচরিত্র লোক 'ব্রাহ্মণ' নাম পাইলেন। তাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্ম আধ্যাত্মিক ব্যাপারাদির ভার পাইলেন। আর একদল সাহসী রণনিপুণ দেশপ্রাণ লোক 'ক্ষত্রিয়' হইলেন। কৃষি-বাণিজ্য, বৈশ্য নামক একদল সহিষ্ণু ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের মস্তকে ন্যস্ত হইল। শ্রমিকগণ 'শূদ্র' নাম পাইলেন। যাঁহারা জ্ঞানে গুণে বিদ্যায় পরহিতৈষণায় শীর্ষস্থানীয় সাত্ত্বিক মানব তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। শৌর্য্যে সাহসে যাহারা সিংহসদৃশ তাঁহারা ক্ষত্রিয়। সমাজের ধনবলের যাঁহারা সংরক্ষক, তাঁহারা বৈশ্য ও শ্রমিকেরা শূদ্র।

কিরূপ গুণবান্ লোক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইত্যাদি হইলেন, তাহারা বর্ণনা এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্। জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্। শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, ঈশ্বরপরতা ও সত্য ব্রাহ্মণের লক্ষণ। এটা শুধু পুঁথিগতই ছিলনা। দাসীপুত্র সত্যকাম জাবালের উপাখ্যানে দেখিতে পাই—'নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ এরূপ সঙ্কটস্থলে কঠোর সত্য বলিতে পারে না। জাবাল সত্যবাদীছিলেন, সঙ্কটে সত্যত্যাগ করিতেন না। তজ্জন্য গোতম ঐ লক্ষণ দ্বারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবতে আছে—শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা। ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যং চ ক্ষাত্রলক্ষণম্। অর্থাৎ শৌর্য্য, বীর্য্য,

ধৃতি, তেজ, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ ও সত্য ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ। ব্রাহ্মণ সত্যসেবায় শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়-বৈশ্যও সত্যবিহীন ছিলেন না।

বৈশ্য সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে—দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্। আস্তিক্যমুদ্যমোনিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণম্। অর্থাৎ দেবতা, গুরু ও ঈশ্বরে ভক্তি, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের পরিপোষণ অথবা বর্ণত্রয়ের প্রতিপালন, আস্তিকতা ও নিত্য উদ্যম বৈশ্যের লক্ষণ।

শূদ্র সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে—শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া। অমন্ত্রযজ্ঞোহ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্। অর্থাৎ শূদ্রের লক্ষণ সন্নতি, শৌচ, অকপটে প্রভুসেবা, অমন্ত্রক যজ্ঞ, অস্তেয়, সত্য ও গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষা।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে ভৃগুভরদ্বাজসংবাদে আমরা ভৃগুমুনির মুখেশুনিতে পাই—

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ।
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্ বিঘষাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতঃ সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে।
সত্যং দানমথাদ্রোহঃ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ।
ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নসঙ্গতঃ।
দানাদানরতির্যস্তু সবৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে।
বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ।
সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোহ শুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ সবৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ। ২২—২৭

ভৃগু বলিলেন—জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কার দ্বারা যে ব্যক্তি সংস্কৃত ও শুচি, বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, ষট্‌কর্ম্মশালী (ষট্‌কর্ম্ম অর্থ—সন্ধ্যা, জপ, হোম, দেবপূজা, অতিথি-সৎকার এই ৬টী, অথবা যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, সৎপাত্রে দান ও সৎপ্রতিগ্রহ এই ৬টী) শৌচাচারস্থ, দেবপ্রসাদভোজী, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ তিনি ব্রাহ্মণ।—অর্থাৎ এই সকল গুণ ও কর্ম্ম থাকিলে ব্রাহ্মণ হয়। সত্য, দান, অদ্রোহ, অনৃশংসতা, অকার্য্যে লজ্জা, মন্দকর্ম্মে ঘৃণা ও তপস্যা যাহাতে দেখিবে, তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ

করিবে। যিনি বেদাধ্যয়ন করেন, যিনি ক্ষত্রোচিত আর্ত্তরক্ষণব্রতে দীক্ষিত, সৎপাত্রে দান ও ন্যায্য-প্রাপ্য-গ্রহণে যাহার অনুরাগ, তিনিই ক্ষত্রিয়। পশুরক্ষণে, কৃষি ও ধনোপার্জ্জনে রত শুচি ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন মানব বৈশ্য। যাহার সকল খাদ্যেই অনুরাগ, যে ব্যক্তি সকল কার্য্যই করে—অর্থাৎ যাহার কার্য্যাকার্য্য বিচার নাই, যে ব্যক্তি অশুচি, যে (অক্ষমতাহেতু) বেদ ত্যাগ করিয়াছে, সেই অনুন্নত মানব শূদ্র বলিয়া কথিত হয়। এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, গুণকর্ম্মানুসারেই ব্রাহ্মণাদি-বর্ণভেদ হয়।

হিন্দুশাস্ত্রের সার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ব্রাহ্মণাদির কর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাও এস্থলে আলোচিত হইতেছে—

শমোদমস্তপঃ শৌচমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবং,
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্।
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্।
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, অহিংসা, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, আস্তিকতা— এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান, প্রভুভাব—এইগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম। কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম। পরিচর্য্যা শূদ্রের স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্ম।

গুণকর্ম্ম না থাকিলে কেবল ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ হয় না একথা শাস্ত্রেই আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখা যায়—যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ। পুরুষের বর্ণবোধক যে সকল লক্ষণ বলা হইল, তাহা যদি অন্যত্র অর্থাৎ ভিন্নবর্ণজাত মানবে দেখা যায়, তাহা হইলে, সেই লক্ষণ দ্বারা সেই লোককে সেই বর্ণের বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। স্পষ্টার্থ এই যে, ব্রাহ্মণের লক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহা যদি শূদ্রবংশীয় লোকে থাকে, তবে সেই লক্ষণ দ্বারা সেই শূদ্র বংশীয় মানবকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট উক্তি আছে—যথা শূদ্রে চৈতদ্‌ ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে, ন বৈ শূদ্রো ভবেৎ শূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো নহি। শূদ্রের যে লক্ষণ বলা হইল, তাহা যদি শূদ্রে, এবং ব্রাহ্মণের যে লক্ষণ বলা হইল, তাহা যদি ব্রাহ্মণে না থাকে, তবে সেই শূদ্র শূদ্র নহে, সেই ব্রাহ্মণও

ব্রাহ্মণ নহে। অর্থাৎ—যাহার শূদ্রোচিত লক্ষণ আছে, সে ব্যক্তি যে বংশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন শূদ্র, আর যাহার শূদ্রলক্ষণ নাই সে শূদ্রবংশীয় হইলেও শূদ্র নহে। যে ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ আছে, সে ব্যক্তি যে বংশেই জন্মগ্রহণ করুক্ না কেন ব্রাহ্মণ, আর যাহার ব্রাহ্মণোচিত লক্ষণ নাই সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণ নহে। এই সকল বচনের আলোচনায় জানা যায় ব্রাহ্মণত্বাদি বংশগত নহে, গুণকর্ম্মগত।

(ক্রমশঃ)

ওমা! একথা যেন ভুলি না।

লেখক—শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।

ধরম করম, ভজন, পূজন,
এ সবইত কিছু মাগো, হল না।
(তবু) সবেতে তুমিই, তোমাতে সবই
ওমা! একথা যেন কভু ভুলি না॥
ইন্দ্রিয়গণ, অই গো অনুক্ষণ,
বাঁধিয়া রেখেছে বাঁধন ভীষণ।
তারা সে সবাই তোমারি স্বজন॥
ওমা! একথা যেন কভু ভুলি না॥
মা! ঐ বাঁধনবশে, মন আবেশে,
চলেছি কোন্ অজানা দেশে ভেসে।
মা! তারি মাঝে যেন তোমা ভুলি না।
(মাগো) তোমারি স্বজিত পথের পথিক ;—
সে পথ বাঁকা কি সোঁজা তা বুঝি না।
পথ ত তোমার, তোমারি পথিক ;
ওমা! এ কথা যেন কভু ভুলি না॥
মোহের তরণী, করমসাগরে,
ছুটেছে ওই গো, আশা পাল ভরে॥

দুরন্ত তুফান, ক্ষিপ্ত রিপু যত।
দেখাইছে অই বিভীষিকা শত॥
সে তরীতে তুমি তবু কর্ণধার।
তবু সে তরণী হয় মা তোমার॥
ও মা! একথা যেন কভু ভুলিনা।
(আমি) বিবেকবিহীন আশায় মলিন।
অভাব পূরণ সদা আকিঞ্চন॥
তাতেই অভাব আরো গুরুতর।
হৃদয় সদাই কাঁপে থর থর॥
কোথা যাই কি যে করি কারে ধরি!
তবুও তোমায় ভুলে যে মা! মরি!
এ সবি যে মা! তোমারি ছলনা।
ওমা! একথা যেন কভু ভুলিনা॥

"চণ্ডী ও গীতোক্ত নিষ্কামবাদ।"

লেখক—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নিজে 'মানুষ' হয়ে, মনস্বিতাসম্পন্নতায় সুসম্পন্ন হ'তে পার্‌লে দেশ-ধর্ম্মে জন-সমাজকে মনস্বিতার আদর্শে সংস্থাপিত করিবার সাহায্য না করে গেলে মনুষ্য-ঋণ শোধ হইবে কি প্রকারে?

মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করে, যদি 'মানুষ' হ'য়ে জন্মাতে নাও পেরে থাকি, তবু ত "মনুষ্যত্বে" (দ্বি-জরূপেও ত একবার মানুষ হবার চেষ্টাও কত্তে হবে ত?) মনস্বিতায় উন্নীত হয়ে, মানুষপর্য্যায়ে অগ্রসর হয়ে, আবার প্রজাপত্য "প্রজাপত্য ক্রমাৎ" মনুষ্য-প্রজননের সম্ভাবনা রেখে, মনুষ্যত্ব সম্পন্ন 'পুত্র' উৎপাদন করে বংশক্রমরক্ষা করে; অন্ততঃ স্বজন স্বপল্লীর মধ্যে

মনস্বিতায় উন্নীত করিবার জন্য জন-সমাজকে সাহায্য করে তার পর ত নিষ্কাম বৈরাগ্য ?

'পিতৃ-ঋণ,' প্রজননের দ্বারা 'প্রজাপত্য ক্রমাৎ' পুত্র দ্বারা বংশরক্ষা না কল্লে শোধ হয় না, এমন ত শুনেছি। শুধু 'পুত্র' নয় বংশধর-পুত্র। পুত্ ত মুত্ অথবা পুত্ না ভূত? পুত্র নয় যে পুত্র দ্বারা 'ভূত-পিণ্ড' লাভ হ'তে পারে।

বংশের ধারা রক্ষা কর্ত্তে পারে, এমন আদর্শ-চরিত্র পুত্র হওয়া চাই। তবেই আমার মনে হয় 'পুন্নাম' নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে। পুণ্য ধর্ম্মশীল জ্ঞানী-গুণী পুত্রলাভ, আত্মার যোগ্যতায়। নিজে না উন্নীত হয়ে পুত্র প্রজনন কত্তে যে পারা যায়, এমন ত আমার মনে হয় না। সুতরাং উপযুক্ত পুত্রলাভ দ্বারা বংশক্রম-রক্ষা করিয়া বংশধর রাখিতে না পারিলে ব্রহ্মার সৃষ্টিই উল্টে পাল্টে যায়। এমন কি ব্রহ্মাকেও দেউলিয়া ও নির্ব্বংশ হইতে হয় যে? সুতরাং পিতৃ-ঋণ মোচন বা শোধ করাও ত কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম?

'দেব-ঋণ'—ইহাও ত বড় শক্ত ঋণ—নিষ্কাম-ধর্ম্মলাভ করে যে মোক্ষমার্গে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ ক'র্ব্ব, দেবতারাও যে সে পথের 'কণ্টক' হয়ে দাঁড়াবেন? ভগবানের সৃষ্টিটায় আমরা ভূত-প্রেত-পিশাচ, অথবা নরাকৃতি কীট, পতঙ্গ, শৃগাল, ছাগ, কুকুর, বিড়াল বা সিংহ ব্যাঘ্র কতকগুলা নর-প্রেত, নর-পশু, পাষণ্ড বংশ-বিস্তার করে রেখে, সোণার সৃষ্টিটা একটা 'উল্তগুণ' অবস্থায় রেখে যাব। নিজেও যদি চির-কৌমার্য্য ব্রত ধারণ করি, তবুও ত আমার সমাজ স্ব-দেশের জন্য স্ব-ধর্ম্মের নিকট দায়ী? কাজেই এ-ঋণটা শোধ না দিলে দেবতারা নিষ্কাম ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ পথের কাঁটা হ'বেন। কাজেই, নিজের পশুভাব দানবভাব দলন করিয়া, দেব ভাব উচ্চাধিষ্ঠিত ভাব আত্মার স্বভাবে আত্ম-ভাবে ফুটাইয়া, সেই ভাব-সৌরভ বিকীরণ করিয়া, দেব-ভাবান্বিত দেব-স্বভাব বংশধর রক্ষা করিয়া "প্রজাপত্য ক্রমাৎ" প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি-রক্ষার্থ সৃষ্টিধর পুত্র-রক্ষা করিয়া তবে ত নিষ্কাম-মার্গ?

তারপর ঋষি-ঋণ। জ্ঞান-মার্গে প্রজ্ঞাবলসম্পন্ন সাধনতপস্যাপরায়ণ ধর্ম্মাচারী হইয়া তত্ত্বোপদেশ লাভ করিয়া স্বয়ং তত্ত্বজ্ঞানদর্শন-সম্পন্ন হইয়া, সমাগত শিষ্য মণ্ডলীকে ব্রহ্ম-তত্ত্বে তত্ত্বোপদেশ দ্বারা ব্রহ্মের-মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে নিজে মহিমান্বিত 'মহর্ষিত্ব' লাভ না করিয়া, এবং মহর্ষিত্ব লাভ করিয়া জন-সমাজকে একটু অগ্রসর করিয়া দিয়া না যাইলে কি ফল?

ঋষিদিগের ও অনেকের 'দারা' অপত্য ছিল। তাহা না হইলে, ঋষিরা "প্রজাপত্য ক্রমাৎ" প্রজনন-ধর্ম্ম পালন না করিলে তত্ত্বজ্ঞান সুসম্পন্ন করিবার জন্ম উপযুক্ত মস্তিষ্ক-ভাণ্ড সৃষ্টি হইবে কা'র দ্বারা? 'শিষ্য' ও 'পুত্র' ক্রমাৎ বংশ-রক্ষা করিয়া যাইতে হইবে ত? 'ধী'সম্পন্ন মস্তিষ্ক-প্রজনন, উপদেশ দ্বারা শিষ্যে; এবং পুত্র জন্মদ্বারা সন্তানে বংশ এক আধটাও ত রাখিয়া যাইতে হইবে? তারপর ত নিষ্কাম ধর্ম্ম।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সংসার ধর্ম্ম করিতেই হইতেছে। ভার্য্যাগ্রহণ ব্যতীত প্রজনন ও সৃষ্টি-রক্ষণ ও বিস্তার করা যায় না, এবং 'কাম' ব্যতীত পুত্রাদিজন্মলাভ হয় না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য অর্জ্জুনও সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়াছিলেন, আবার কাম-যাচিত পত্নীকে গ্রহণ করিয়া পুত্র প্রজনন করিয়াছিলেন। বভ্রুবাহণ-জন্মবৃত্তান্তে তাহার পরিচয়। ভীম ঘটোৎকচের জন্মদান করিয়াছিলেন। অনার্য্য রাক্ষসীগর্ভজাত পুত্র ঘটোৎকচও পাণ্ডুপুত্রগণের স্ব-কার্য্য সাধন, এবং ঈশ্বর-কার্য্য ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপনকার্য্যেও পিতা, পিতৃব্যদিগের সেবা আনুগত্য ও কার্য্যসাধনের জন্য আগমন করিয়া কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভগবানের কার্য্য-সাধনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল।

অনার্য্য, ব্রাহ্মণ্য-দ্বেষী, ম্লেচ্ছ, রাক্ষস ঘটোৎকচ নিধনে যখন যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণ শোকমগ্ন তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডুপুত্রগণের শোকাপনোদন করিবার জন্য যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতেই বিবৃত আছে।

ভগবান এইরূপে সকলেরই মৃত্যুর ফাঁদ কুরুক্ষেত্র-সমরক্ষেত্রে পাতিয়া রাখিয়া কর্ম্মচক্রে নিয়তি-নির্দ্দেশ সমাপ্ত করিয়া ধরা-ভার লাঘব করিয়াছিলেন। 'ব্রহ্ম-কর্ম্মসমাধিনা'—ঘটোৎকচেরও জন্মের কারণ ভীমকে পিতৃত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সুতরাং 'সংসার' প্রবর্ত্তিত রাখিয়াই এবং কর্ম্মচক্রে রাখিয়াই "কাম ও কর্ম্ম উভয় সমাবেশেই বেশ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিষ্কাম ধর্ম্ম-পালন করাইয়াছিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস-প্রখ্যাত নিষ্কাম ধর্ম্মের এই ত ইতিহাস মহাভারত হ'তে পাওয়া যায়।

আবার ভীষ্মদেবের ন্যায় নিষ্কাম কর্ম্মী সত্যে দৃঢ়-নিষ্ঠ মহাত্মা ত দ্বিতীয় দেখা যায় না। তিনি অধর্ম্মাচারী সাক্ষাৎ 'অধর্ম্ম' দুরাচার দুর্য্যোধনের পক্ষে থাকিয়াও যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কর্ত্তব্য ধর্ম্মে সত্যে আবদ্ধ থাকিয়া অধর্ম্ম

পক্ষে দাঁড়াইয়াও ধর্ম্মের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন নাই। ভগবানের পাদপদ্মে মতি ও রতি রাখিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার, অর্জ্জুনকে নরনারায়ণ জানিয়াও অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের পক্ষে জয়-যুক্ত রাখিয়া অথচ যুদ্ধ কর্ত্তব্যে ক্ষাত্র শৌর্য্যবীর্য্যপরাক্রম-প্রদর্শনের এতটুকু ও ত্রুটি করেন নাই। স্বয়ং ঋষি বেদব্যাস, নিষ্কাম ভাবে ভাতৃবধূ সহবাস করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু বিদূরের জন্মপরিচয়ে। বাহ্যতঃ ব্যবহারে কামক্রিয়া করিয়াও ঋষি ধর্ম্ম, যতি-ধর্ম্ম, গার্হস্থ্য ও সমাজ ব্যবহারেও পতিত হন নাই। অব্যর্থবীর্য্য, এবং অব্যর্থ বাক্য উঁহাদের জন্ম বৃত্তান্তে পরিচয় পাওয়া যায়। এখন Legitimate, Illegitimate Intercourse ব্যাস পরাশরের আচরণে কতটা প্রমাণিত হইয়াছিল, আর আমরা স্বীয় পত্নীতে, এবং এক-পত্নীত্বে, পত্নীর সতীত্বমর্য্যাদায়, কুন্তী, দ্রৌপদীর ন্যায় 'সতী' নয়, অথচ আমরা Legitimate বা Illegitimate সন্তান প্রজনন স্থষ্টির মর্য্যাদায় আমরা পুত্র রক্ষা ও বংশ বিস্তার-ক্রমরক্ষায় কতটা সক্ষম বা সমর্থ হইয়াছি বিচার্য্য বিষয়।

কুন্তী দেবীর পঞ্চ পুরুষ সহবাসে রতিদান প্রাপ্ত হইয়া পাঁচটি পুত্রলাভে distinctly পরিষ্কাররূপে পুত্রের ব্যবহার-যোগ্যতায় ও মর্য্যাদায় পিতৃ-বীর্য্যের পরিচয় দান করিতেছে কিনা বিচার্য্য। আর আমরা পুত্র ক্রমরক্ষায় বংশ গৌরব কুল গৌরব, পিতৃ-দেব-ঋষি-গৌরব গোত্র-মর্য্যাদা, আর্য্যত্ব গৌরব ইত্যাদি ত দূরের কথা, মনুষ্যত্বগৌরবরক্ষায় পুত্র-ক্রমরক্ষায় কতটা উপযোগী হইয়াছি তাহাও বিচার্য্য।

সুতরাং নিষ্কাম ধর্ম্মটা কি? আর নিষ্কাম কর্ম্মটা কি? সংসার-ক্ষেত্রে বিচার্য্য। যতি, বৈরাগী, সন্ন্যাসী ত্যাগপন্থীর কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। তাঁরা সংসার ছাড়িয়াছেন, অবশ্য কৃপা করিয়া; আমাদের ছাড়িতে পারেন নাই। আর আমরা স্বীয় ভক্ত-মর্য্যাদায় ও ভক্তি-মর্য্যাদায় তাঁহাদিগকেও, সকলকে ছাড়িতে পারি না।

কিন্তু, ভগবান্ ত সংসারচক্রে সংসারী হইয়া আসিয়াছিলেন? সংসারীদের জন্য, (ঊর্দ্ধরেতা যতি সন্ন্যাসী নয়,) মৈথুন-ধর্ম্মী সংসারের নর-নারীর নিকট, গোপগোয়ালিনীদের নিকট, রাখাল গোপালদের নিকট, রাক্ষস অসুর দানব-দিগের নিকট, তাদের জন্যই ত ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। দুষ্ক্রিয়াম্বিত-দিগকে বিনাশ করিয়া সাধুদিগকে পরিত্রাণের জন্য? নিষ্কাম-ধর্ম্ম তাদেরই

দিয়া পরিপালন করাইবার জন্য? যেমন মহাত্মা গান্ধী Wholesale Soul Purification আত্মশুদ্ধি করাইতেছেন আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ভারতবাসীকে লইয়া, এমনিই ধরণেই ত শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্কাম ধর্ম্ম পালন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন? সে নিষ্কাম ধর্ম্ম এবং নিষ্কাম কর্ম্মটা কি?

জীবনে, মরণে, সংসারে, গার্হস্থধর্ম্মে, অথবা ত্যাগে বৈরাগে, সর্ব্বাবস্থায় ঈশ্বরের অভিপ্রেত ভাবে কার্য্য করিয়া জ্ঞান-বিবেক-প্রণোদিত বিচারবুদ্ধি পরিচালনা করিয়া ঈশ্বরাদিষ্ট ঈশ্বরের কর্ম্ম সাধন ঈশ্বর-জ্ঞানে ঈশ্বর-মর্য্যাদায় আত্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া—

অথবা হেলায় ফেলায় ঈশ্বর বিস্মৃত হইয়া উদর ও শিশ্নানুগত হইয়া, 'স্ব' কে "শ্ব" এ পরিণত করিয়া 'G-O D' 'D-O-G'এ পরিণত করিয়া শিশ্নোদর-ধর্ম্মপরায়ণতায় প্রমত্ত উদ্‌ভ্রান্ততায় আত্মবিবেক আত্ম-জ্ঞান আত্মার সম্পদ আত্মমর্য্যাদা হারাইয়া পাপে অধর্ম্মে নিমগ্ন থাকিয়া?

অথবা 'জড়বৎ' অচল অটল অচেতন আলস্যে পড়িয়া থাকিয়া ভোগের অধীনে ভোগ-সেবার জন্য ভোগের পাছে পাছে দৌড়িয়া ভোগই ভগবান্ বলিয়া? অথবা ভগবান্ই ভাগ্যবিতাধা ভোগ-প্রদাতা জানিয়া আপনাকে সংযত করিয়া আত্মসংযত, ইন্দ্রিয়বিকারশূন্য প্রবৃত্তি দমন করিয়া রিপুবশ্যতাত্যাগ করতঃ আত্মার মর্য্যাদায় ভগবদীয় ভাব প্রণোদিত হইয়া ভগবদীয় কৃপালব্ধ 'ভোগ' ভগবৎপ্রসাদরূপে গ্রহণ করিয়া অতৃপ্ত বাসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া, ভগবদীয় কর্ম্ম প্রারব্ধকার্য্য নিষ্পন্ন সুসম্পন্ন ভাবে করিয়া কর্ম্ম সাঙ্গ করিয়া, কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া, ক্ষমা বৈগুণ্যাপরাধ মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া, শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করত সৎ-চিৎ-আনন্দে আত্মসমর্পণ করা? নিষ্কাম ধর্ম্ম ও নিষ্কাম কর্ম্ম কি? ইতি —

ব্রহ্মচর্য্য।

লেখক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তর্কবাগীশ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দৈহিক উত্তাপের বিনাশ হইলে উদরের পরিপাকশক্তি বিলুপ্ত হয়; আহার্য্য বস্তুর সামান্য পরিবর্ত্তনও অসহ্য হয়; সকল সময়ই যেন প্রতিশ্যায় আবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। খুব অল্প সময়েই শরীর সুস্থ বলিয়া প্রতীতি হয়। ঋতু-পরিবর্ত্তনের সময় প্রায়শ তাহার শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হয়। দেশব্যাপী কোন রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে, সে ব্যক্তিই সর্ব্বপ্রথমে ব্যাধি-নিপীড়িত হইয়া পড়ে। চাক্ষুষ তেজের অপচয় হইলে যৌবনোদ্‌গমের প্রথমভাগেই উপনেত্র (চস্‌মা) গ্রহণের প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায়, প্রায় অধিকাংশ লোকই উপনেত্র গ্রহণ করিয়াছে। শুক্র দুর্ব্বল হইলে সন্তানোৎপাদন-শক্তি চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়, তাই স্ত্রী বন্ধ্যা ও পুরুষ নিঃসন্তান হইয়া পড়ে। আর যদি শোণিত অপেক্ষা শুক্র দুর্ব্বল হয়, তবে কন্যাই অধিকপরিমাণে হইয়া থাকে। পুত্র অপেক্ষা কন্যা অধিকপরিমাণে হইলে ক্রমে ক্রমে পাপ-সঞ্চার হইয়া সমাজের দারুণ অধঃপতন সংঘটিত হয়।

সর্ব্বোপরি শুক্রের সহিত মনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় বীর্য্যনাশের সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত নিরতিশয় বলহীন হইয়া পড়ে। মনুষ্যমাত্রেরই স্পৃহনীয় মনুষ্যত্ব, ধর্ম্ম-অর্থকাম-মোক্ষরূপ পুরুষার্থ-সাধনশক্তি, স্বাধীনচিত্ততা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায়, জাতীয়তা, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও জিতেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি গুণসমূহ একমাত্র মানসিক শক্তির উপরেই নির্ভর করিয়া অবস্থিত। ঐ শক্তির অপচয় হইলে সকল শক্তিই বিলয় প্রাপ্ত হয়। দুর্ব্বলচেতা মানব ইচ্ছা করিয়াও কখনই সংযম-রক্ষা করিতে পারে না, অধিকন্তু ইন্দ্রিয়বৃত্তির দাস হওয়ায় ক্রমশঃ স্ত্রীজাতিরও দাস হইয়া পড়ে। বিষ-সদৃশ বিষয়-ভোগে অনির্ব্বচনীয় হৃন্মর্ম্মচ্ছেদকর দুঃখ অনুভব করিয়া, ঐ দুঃখজিহাসু হইয়াও চিত্তের দুর্ব্বলত্ব নিবন্ধন কখনও তাহা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। বিষয় উপস্থিত না থাকিলে তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য শত শত প্রতিজ্ঞা করিয়াও বিষয়টী চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট হইলেই আসক্তি-বশতঃ তাহার বশীভূত হইয়া পড়ে; তাহার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাসকল অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিথিল হইয়া যায়।

এইরূপে ব্রহ্মচর্য্যের বিলয়ে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লোপ হয়, জীবন অতিশয় ভারাক্রান্ত বলিয়া মনে হয়। আজ এই ভারতবর্ষে প্রদীপ্ততেজঃসম্পন্ন সত্যমাত্রনিষ্ঠ পূর্ব্বতন মহর্ষিগণের ন্যায় নৈষ্ঠিক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্রমহাশক্তি-সম্পন্ন দুর্ব্বলত্রাতা সত্য ও তেজঃপরায়ণ প্রকৃত ক্ষত্রিয় বিরলই দৃষ্টিগোচর হয়। ব্রাহ্মণের সেই শক্তি ও ক্ষত্রিয়ের সেই তেজ ইহার কিছুই নাই। যে সকল মহর্ষিগণ অমোঘবীর্য্য সত্যবাক্য ও অচিন্তনীয়শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, যাঁহারা স্বীয় অসামান্য তপঃপ্রভাবে জগতের পাপরাশি বিধ্বস্ত করিয়া জ্ঞান-প্রভাকরের প্রদীপ্তপ্রভা বিকিরণ করিয়া আপামর সাধারণের অজ্ঞান অন্ধকারকে চিরকালের জন্য জলনিধির অতল জলে বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই পুণ্যময় ধরাতলপবিত্রকর কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা এইরূপ নির্ব্বীর্য্য লুপ্তশক্তি ও অসত্যপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছি। আর্য্যসন্তানগণ সেই বীর্য্য-ধারণ-জনিত অপরিমিততেজঃশক্তিশূন্য হইয়াছে বিধায় পরমানন্দময়ী ভারতমাতার উৎফুল্ল বদনকমলে কলঙ্ককালিমা অঙ্কিত হইয়াছে। পবিত্র-চরিত্র মহর্ষিগণের দিব্যনেত্র ও জ্ঞান-নেত্রের বিনাশ হইয়াছে বলিয়া আমরা উপনেত্র ভিন্ন দেখিতে পারিতেছি না। আমরা সেই ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিবৃন্দের পরমানন্দময় অবাঙ্মনসগোচর সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম-তত্ত্ব-চিন্তা বিস্মৃত হইয়া শরীর ও মনকে অতীতের শ্মশানদৃশ্য স্মরণ করিবার জন্য নিয়োজিত করিয়াছি। বৈদিক মন্ত্রের দর্শন বা বিশুদ্ধ উচ্চারণ সুদূরপরাহত হইয়াছে। পদার্থ গ্রহণ করিয়াই সহস্র সহস্র লোকের পরস্পর বিশাল সংগ্রাম চলিতেছে। কঠোর তপস্যা করিয়া তদীয় মধুময় ফলরূপ জ্ঞান অর্জ্জন বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অতিদূরে—কোথায় জ্ঞানে বিষয়তাকে অতিক্রম করিয়া মহীধরের কোন মসীময় গুহায় লুকায়িত রহিয়াছে জানি না, কিন্তু আজ অজ্ঞান-ঘোর-ঘনঘটা ভারতগগনকে ঘোর মসীময় আবরণে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। এই সকল দুর্ভাগ্য ও দুর্দ্দশা—কেবল সেই ব্রহ্মচর্য্যনাশের একমাত্র অসন্দিগ্ধ অবিসংবাদী ফল। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের যদি পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় এবং ব্রাহ্মণের সন্তানগণ আবার যদি উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া গুরুগৃহে বাস করতঃ ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তবে হয় ত কোন দিন দুঃখমগ্ন ভারতবর্ষের মলিন বদনে আনন্দের সুধাময় হাস্য উদিত হইতে পারে এবং সমগ্র সমাজে শান্তি-সলিল-সেকে ত্রিবিধ সন্তাপের দারুণ জ্বালা-নিবৃত্তি হইতে পারে। ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে দক্ষ বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মচর্য্যং সদা রক্ষেদষ্টধা মৈথুনাৎ পৃথক্। স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং

গুহ্যভাষণম্। সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেবচ। এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥”

এই ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাবে আধ্যাত্মিক, আদিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ উন্নতিই সম্যক্‌রূপে সাধিত হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনেও বলিয়াছেন “ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ” ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা হইলে বীর্য্যশক্তি লাভ হইয়া থাকে। এই বীর্য্যশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে মনুষ্যমাত্রেরই শারীরিক ও মানসিক প্রসন্নতা অনায়াসে অধিগত হয়। নিখিল আময় চিরকালের জন্য তিরোহিত হয় ও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবাধিত উপচয় ও দৃঢ়তা নিরন্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তখন মনুষ্য আপনার মানুষ-সুলভ লঘিমাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দৈব বা আসুরশক্তি-সম্পদে প্রদীপ্ত বলিয়া প্রতীত হয়। এই অভিসন্ধি মনে করিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন—“শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং”। যোগদর্শনে বিভূতিপাদে যে সকল সিদ্ধির প্রকারভেদ বর্ণিত হইয়াছে—যথা সূর্য্যে সংযম করিলে ভুবনজ্ঞান এবং সংস্কারে সংযম করিলে পরচিত্তজ্ঞান প্রভৃতি অধিগত হয়, সেই সকল শক্তির সাধন সংযম করিতে হইলে প্রথমতঃ চিত্তসংযম করা অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য্য একমাত্র প্রয়োজন, কারণ চিত্তস্থৈর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে অল্পা-য়াসেই তাহার যে কোন স্থানে সংযমসাধন করা যায়।

ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ যে মহামূল্য দুর্লভ অষ্টসিদ্ধি আয়ত্ত করিয়া সংসারে প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্য দিয়া বাক্যের অব্যর্থতা, চেষ্টার অপ্রতিঘাত ও অমানুষ দুর্লভ দৈহিকবল প্রভৃতি অনির্ব্বচনীয় শক্তিগুলি সাধারণজনগণের চক্ষুর গোচরীভূত করিয়াছেন—যে শক্তির অতীতস্মৃতিও আজ দীনহীন ভারতবাসীর কঙ্কাল-মাত্রাবশিষ্ট দেহে নবীন জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়া দেয়—যে সকল প্রধান প্রধান কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীর মহাপুরুষ স্বীয় অমোঘশক্তি-প্রভাবে ধর্ম্ম, সমাজ, দেশ ও দেশবাসীর উপকার—রূপ মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া আপনার অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠার প্রভাবে আধিদৈবিক শক্তির উন্নতিলাভের একমাত্র ফল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ছান্দোগ্যোপনিষদেও ইহাই বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ আছে——

“তদ্য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতি তেষামেব ব্রহ্মলোকাস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারোভবতি॥” ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠাদ্বারা লোক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় ও ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারে॥ যে সকল মহাত্মা কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-প্রভাবে দৈবীশক্তি লাভ করিয়া জগতে বরণীয় হইয়া যশঃ-সুধাকরের

মধুর কিরণে লোকের মোহ তিমির দুর করতঃ আনন্দাম্ভোধির শীতল পীযূষধারায় পিপাসু মানসচকোরের চিরপরিতৃপ্তি সম্পাদন করিয়া অনন্তশান্তি বিধান করিয়াছেন, যে মহাত্মা সৌরকুল-গৌরব রাজর্ষি শান্তনুনন্দন পবিত্রসলিলা-ভাগীরথীর পূতজঠরসম্ভূত দৈবতস্বভাব দেবব্রত পিতার আনন্দবৃদ্ধির জন্য জন্মজন্মান্তরবাঞ্ছিত বিশাল সাম্রাজ্য, প্রভূত ঐশ্বর্য্য, সকল-জন-মোহনীয় সম্ভোগলালসা একটীমাত্র বাক্যে বিসর্জ্জন করিয়া স্বাধীনমৃত্যু হইয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষও তাঁহাদেরই অন্যতম। সেই দেবব্রতও কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-সাধনে দৈবশক্তি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এই মরজগতে অমরদুর্লভ ভীষণ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া "ভীষ্ম" সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার অনিন্দনীয় যশশ্চন্দ্রমা আনন্দচন্দ্রিকা বিকিরণ করিয়া ভারতগগনকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল। ভীষ্ম ভয়ঙ্করশক্তি অধিগম করায় ক্ষত্রিয়কুলান্তক পরশুরামকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিগতাভিমান করিয়াছিলেন। এই সকল শক্তির একমাত্র মূল কারণ সেই ব্রহ্মচর্য্য। ত্রেতাযুগে রবিকুলচূড়ামণি মহারাজ দশরথের নন্দন সৌমিত্রেয় লক্ষ্মণ, যুবতী পত্নী ও রাজ্যসুখ অম্লানবদনে অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের অনুগমন করিয়া অরণ্যবাসক্লেশ অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং কর্ব্বূরকুলগৌরব ভাস্কর সুরাসুরবিজয়ী মন্দোদরীনন্দন ইন্দ্রজিৎ মেঘনাথকে চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত আহার, বিহার ও নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সমরভূমিতে নিহত করিয়াছিলেন, তাহাও কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-প্রভাবে অধিগত দেবতাদুর্লভ মহাশক্তির একমাত্র ফল।

যখন সুরারিকুল বিপুল মদগর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া বিশাল ভুজবলে দেবগণকে সংগ্রামক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া অশেষ সুষমামণ্ডিত নন্দনকানন—অলঙ্কৃত অমরাবতী হইতে বিতাড়িত করিয়া আপনারাই নাকনায়ক হইয়া বসিয়াছিল, এবং দৈত্য-প্রভাবে লুপ্তশক্তি ত্রিদিবনিবাসচ্যুত অমরসকল নরের সঙ্গে মর্ত্ত্যধামে বনে বনে বিচরণ করতঃ চক্ষুর জলে বক্ষঃ ভাসাইয়া ছিল, দেবতাদিগের সেই দুর্দ্দিনে সনাতনধর্ম্মের সেই দারুণ বিপ্লবে, অধর্ম্মের সেই বিশ্বনাশি প্রসারে, ব্রহ্মচর্য্যা-নুষ্ঠানলব্ধশক্তি ব্রাহ্মণ দধীচির অস্থিনির্ম্মিত বজ্রপ্রহরণই একমাত্র অশরণ দীনদেবকুলের অনন্যসাধারণ অবলম্বন হইয়াছিল। মহর্ষিদধীচি দেবকুলের একটীমাত্র প্রার্থনাবাক্যে সর্ব্বজন প্রার্থনীয় মহামূল্য দুর্লভ মনুষ্য জীবনকে অকাতরে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। অপ্রতিহত প্রদীপ্ত সুতীক্ষ্ণ দৈবতমহাস্ত্র সকল সেই মহাশক্তি দৈতেয়গণের অঙ্গসংযোগে ব্যর্থ ও নিষ্প্রতিভ হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্য-

প্রভাবলব্ধ দৃঢ়শক্তি দধীচিমুনির কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট অস্থিই বজ্রমূর্ত্তিধারণ করিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ দৈত্যবংশের ধ্বংশসাধনে একমাত্র সমর্থ হইয়াছিল। অতএব ব্রহ্মচর্য্য-প্রভাবে শারীরিক মানসিক প্রভৃতি যাবতীয় শক্তির উপচয় ও দৃঢ়তা সম্যগ্‌রূপে সাধিত হয় বলিয়া মনুষ্যমাত্রেরই অচিন্তনীয় শক্তি ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহর্ষি বাল্মীকির মুখনিঃসৃত সামান্য "মানিষাদ,প্রতিষ্ঠাংত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥" এই বাক্যটী দ্বারা ব্যাধনন্দন নিমেষে ভস্মীভূত হইল, ইহাও ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাব লব্ধ সত্যনিষ্ঠার ফল বই আর কিছুই নহে।

এই সকল ইন্দ্রিয়ের সংযম সংসাধিত না হইলে আত্ম-প্রসাদের মূলীভূত অন্তঃকরণতত্ত্বের বা মন ইন্দ্রিয়ের সংযম বা বশ্যতা সংঘটন অসম্ভব। চিত্ত স্থির করিতে না পারিলে ঐহিক সুখসাধন কিংবা পারত্রিক শ্রেয়ঃসাধন অধিগত করিতে প্রচেষ্টা গগন-কুসুম-সংগ্রহ-যত্নের ন্যায় ভিত্তিহীন বা সর্ব্বতো-ভাবে যে অমূলক ইহা মনীষিবৃন্দের অবিদিত নহে। শ্রুতি যে গাহিয়াছেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" তাহারও অর্থ ইহাই। বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম ও শোধনদ্বারা চিদ্দর্পণস্বরূপ অন্তরিন্দ্রিয়ের আবিলতা মালিন্য সম্যগ্‌রূপে অপনয়ন করাই বল, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহার প্রভাবেই আত্মার প্রভাব, আত্মার স্বরূপ, আত্মার স্বচ্ছতা, আত্মার মহত্ত্বরূপ বাক্য ও মনের অগোচর বস্তুসকল মানব-মানসে প্রতিভাত হয়। তখনই মানব "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্।" এই বেদান্ত ও উপনিষদের সার, পুরুষার্থের শ্রেষ্ঠ অর্থ, জীবগণের বাঞ্ছিতের পরাকাষ্ঠা, কোটি কোটি জন্মসঞ্চিত পুণ্যরাশির স্পৃহণীয় মহান্ পরিণাম আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিকনিবৃত্তি, নিরবচ্ছিন্ন অবিনাশী মহোজ্জ্বল পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্যসৃষ্টির ইহাই উদ্দেশ্য, ইহাই পরমেশ্বরের ঈপ্সিত, ইহাই মঙ্গলময় নিয়ন্তার নিয়ন্তৃত মঙ্গল ও ইহাই পরাৎপরের লীলাকৈবল্য। এই জন্যই শ্রুতি উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"
ওঁ শান্তিঃ।

সনাতনধর্ম্মের মূলতত্ত্ব।

লেখক—সম্পাদক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(এই সংখ্যার ১১ পৃষ্ঠার পর হইতে অবশিষ্টাংশ)

মহর্ষি অত্রি ব্রাহ্মণকুলজাতদিগকে গুণকর্ম্মানুসারে নানাভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন—

বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥
অস্ত্রাহতাশ্চ সংগ্রামে ধন্বিনঃ সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভা নির্জ্জিতাযেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥
কৃষিকর্ম্মরতোযশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥
লাক্ষালবণসম্মিশ্রং কুপ্যস্য ক্ষীরসর্পিষঃ।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চণ্ডাল উচ্যতে॥

যে ব্যক্তি নিত্য বেদান্ত পাঠ করেন, সর্ব্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করেন, সাংখ্যযোগবিচারে রত থাকেন, সেই ব্রাহ্মণকুলজাত ব্যক্তিই দ্বিজ বা যথার্থ ব্রাহ্মণ। যুদ্ধে সর্ব্বসমক্ষে ধনুর্ধারী হইয়া অস্ত্রাহত হন, এবং যিনি সর্ব্ববিধ আরম্ভ জয় করেন, ব্রাহ্মণবংশজাত সেই ব্যক্তি "ক্ষত্রিয়"। যিনি কৃষিকর্ম্মকারী ও গোপালক, আর বাণিজ্যে রত, সেই ব্রাহ্মণবংশীয় লোক 'বৈশ্য'। লাক্ষা, লবণ, কাঁসা, পিত্তল, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু মাংস বিক্রয় করেন—এমন ব্রাহ্মণবংশীয় লোক 'শূদ্র'। সৎকর্ম্মবিহীন ধর্ম্মকর্ম্মহীন, মূর্খ ও নির্দ্দয় ব্রাহ্মণবংশজ লোক 'চণ্ডাল'। এখানে দেখা যাইতেছে, এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াও কর্ম্মগুণে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহ শূদ্র ও কেহ চণ্ডাল আখ্যা পাইতেছেন। গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণভেদই যথার্থ শাস্ত্রসঙ্গত।

এক জনের সন্তানগণ গুণকর্ম্মানুসারে ভিন্ন বর্ণ হইত ইহা শাস্ত্রে আছে। পুত্রো গৃৎসমদস্য চ শুনকঃ যস্য শৌনকাঃ। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ। এতদ্বংশে সমুদ্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ। গৃৎসমদের পুত্র শুনক। কর্ম্মের বৈচিত্রবশতঃ শুনকের পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। গুণকর্ম্মের সমাদর সকল দেশেই আছে ছিল ও থাকিবে। গুণের পূজা—সৎকর্ম্মের মর্য্যাদা জগৎ হইতে তিরোহিত হইতে পারে না।

গুণানুসারে উন্নয়ন ও দোষানুসারে অবনয়ন ভারতবর্ষে ছিল—শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ পাই। ধর্ম্মসূত্রে আছে—বর্ণান্তরগমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাম্। গুণের উৎকর্ষে উৎকৃষ্টবর্ণপ্রাপ্তি এবং গুণের অপকর্ষে হীনবর্ণপ্রাপ্তি হয়। উগ্রতপা গাধিনন্দন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, ইহা সকলেই জানে। রাজা বীতহব্য ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন—ইহাও শাস্ত্রে আছে। শুনুন্—'শৃণু রাজন্ যথা রাজা বীতহব্যো মহাযশাঃ। রাজর্ষিদুর্লভং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণ্যং লোকসৎকৃতম্। হরিবংশে আছে—নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ, বৈশ্য নাভাগারিষ্টের পুত্রদ্বয় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। শূদ্র কবষের ঋষিত্বপ্রাপ্তির কথা বেদপাঠক জানেন।

বর্ণভেদের গোঁড়ায় গুণকর্ম্ম। বংশগত বর্ণভেদ অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয়। পতনের দিনেই বর্ণভেদ বংশগত হইয়াছে। ইহাতে সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত হইয়াছে কিনা তাহা সুধীজন বুঝিবেন। বংশগত বর্ণভেদের প্রধান দোষ এই যে গুণার্জ্জন ব্যতীত যদি সম্মান পাওয়া যায়, তাহা হইলে গুণলাভের জন্য আর কাহারও আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ হয় না। যে শ্রেষ্ঠত্ব গুণকর্ম্মে ছিল তাহা এখন বংশগত। কৌলীন্যপ্রথা বংশগত হওয়ায় সমাজের যে সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, বর্ণভেদ বংশগত হওয়ায় তদপেক্ষা অল্প অনিষ্ট হয় নাই। বংশগত বর্ণভেদের ফলে ব্রাহ্মণ পাচকের জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। পূর্ব্বে কিন্তু "শূদ্রেষু দাসগোপাল-কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাং ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য" দাস, গোপালক, বংশমিত্র, বর্গাদার, প্রভৃতির অন্ন ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিতেন। সনাতনধর্ম্মের বর্ণ গুণকর্ম্মগত সনাতনধর্ম্মানুসারে "বর্ণধর্ম্ম" বলিলে বুঝিব—যাহার যেমন গুণ আছে তাহার ধর্ম্ম অর্থাৎ কার্য্য তদনুসারে হইবে।

বর্ণের কথা বলা হইল। এখন আশ্রমের কথার আলোচনা করা যাউক। আশ্রম ৪টী ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস বা ভিক্ষু। বর্ত্তমানে ব্রহ্মচর্য্য নাই—কার্য্যতঃ ব্রহ্মচর্য্য দেখা যায় না। মহানির্ব্বাণতন্ত্রও কলিতে

ব্রহ্মচর্য্য নাই বলিয়াছেন। মহাদেব বলিয়াছেন 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমোনাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে, গৃহস্থো ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌযুগে।" কলিতে ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ নাই, কেবল গৃহস্থ ও ভিক্ষুক এই দুই আশ্রম আছে। গৃহস্থাশ্রম আছে, স্বীকার করি, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমের কর্ত্তব্য-পালন একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যে ব্রতপালন ও বেদাধ্যয়ন বা বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইত। বর্ত্তমানকালের শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা যে চরিত্রের উৎকর্ষ ও যথার্থ মানুষ তৈয়ার হইতেছে না, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং পুঁথিতে আশ্রমধর্ম্ম লেখা থাকিলেও, কর্ম্মক্ষেত্রে পাওয়া যাইতেছে না? বানপ্রস্থের ব্যাপারটা এই যে ৫০ বৎসরের অধিক বয়সে অথবা পুত্রের পুত্র হইলে সংসার ছাড়িয়া কোন বনে বাস করিয়া জ্ঞানচর্চ্চায় ও ঈশ্বরারাধনায় কালক্ষেপ করা। তাহা ত কৈ কাহাকেও করিতে দেখি না। তাহার পর ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী। নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস না করিয়া পরব্রহ্মে বিলীন হইবার চেষ্টা ভিক্ষু আশ্রমে হয়। এদেশে ভিক্ষু ধর্ম্ম ষোল আনা পালন করেন এমন লোক এখন দেখি না। ভিক্ষুক অসংখ্য আছে, কিন্তু প্রকৃত ভিক্ষু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেহ যদি সমর্থ হন, তিনি ভিক্ষুধর্ম্ম পালন করুন তাহাতে বাধা নাই। জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষালাভ করাই বর্ত্তমান ব্রহ্মচর্য্য, প্রথমে ঐহিক ও পারত্রিক জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, মন ও দেহ পুষ্ট করিতে হইবে। পরে বিবাহ করিয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে এবং পৌত্রাদি জন্মিলে সংসারের ভার তাহাদের উপর দিয়া শাস্ত্রচর্চ্চা, ভগবৎ প্রসঙ্গ ও দেশের কার্য্য করা যাইতে পারে। চতুর্থাশ্রমের কর্ত্তব্য পালন বর্ত্তমানে অসম্ভব। আশ্রমধর্ম্মের এই অবস্থা। বর্ণধর্ম্মের ত গোঁড়ামই গলদ। এই বর্ণাশ্রমের দোহাই দিয়া যাঁহারা সনাতনধর্ম্মকে দূরে ফেলিতে চাহেন, তাঁহারা সমাজের হিত করিতে চাহেন কি? বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আসল জিনিষ নাই, আছে কেবল আড়ম্বর।

গুণকর্ম্মগত বর্ণভেদ সব দেশেই আছে। জ্ঞানচর্চাকারী, যুদ্ধাদিকারী, বাণিজ্যাদি-পরায়ণ ও সেবক সকল সমাজেই আছেন। তবে অন্যদেশে সেই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে আহার বিবাহ ও জলস্পর্শাদির বাধা নাই অথচ এদেশে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নামে ঐ সকল অন্যায়ই চলে। অনেকে বলেন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হিন্দুর বিশেষত্ব, কিন্তু বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইয়াছে কি? সাহেবেরা গায়ের রংটা ঠিক রাখিয়াছেন, কিন্তু আমাদের শোণিতের বিশুদ্ধি রক্ষা পাইয়াছে কি? আমরা বর্ণ হারাইয়া এখন 'বিবর্ণ' হইয়াছি, অথচ বর্ণধর্ম্ম লইয়া লড়াই করিয়া আসর জমাইতেছি।

এখন কথা এই যে, বর্ত্তমান বংশানুসারি বর্ণভেদ অযৌক্তিক বা অশাস্ত্রীয় যাহাই হউক্ না কেন, ইহা যে ফুৎকারে উড়িয়া যাইতে পারে না তাহা স্থির। দীর্ঘকালের বদ্ধমূল সংস্কার সহজে ত্যাগ করা যায় না। তবে আশা আছে, সনাতনধর্ম্মের মূলতত্ত্বের প্রচার ও শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল অযৌক্তিক সংস্কার দূরীভূত হইবে এবং ক্রমে লোকে গুণকর্ম্মের মর্য্যাদা বুঝিবে। ক্রমে নিয়মবন্ধন শিথিল হইতে হইতে শেষে একরূপ একটা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইবে।

সনাতনধর্ম্মের মূলতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মূলতত্ত্বের সহিত বর্ত্তমান বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরোধ হইলে মূলতত্ত্বেরই মর্য্যাদা রাখিতে হইবে। বর্ত্তমান অযৌক্তিক বর্ণাশ্রমাচারের অনুরোধ প্রকৃত ধর্ম্মের অবমাননা করা সঙ্গত নহে।

সনাতনে ধর্ম্মবিধৌ সেবাধর্ম্মো মহান্ মতঃ।
যঃ সেবতে সদা লোকান্ স শ্রেষ্ঠো ধার্ম্মিকঃ স্মৃতঃ।
সেবা চতুর্ব্বিধা প্রোক্তা তাস্বাদ্যা জ্ঞানদানতঃ,
দ্বিতীয়ার্ত্তত্রাণরূপা চতুর্থী কায়িকা মতা,
কৃষ্যাদ্যর্জ্জিতবিত্তস্য পরার্থে ত্যাগ উচ্যতে
সেবা তৃতীয়া. সেবায়াং কুশলো ধার্ম্মিকাগ্রণীঃ।　৪

সনাতনধর্ম্মে সেবাধর্ম্ম মহৎ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যিনি সর্ব্বদা জনসাধারণের সেবা করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক। সেবা চতুর্ব্বিধঃ—প্রথমতঃ জ্ঞানদ্বারা সেবা; দ্বিতীয়তঃ ভীত বা উৎপীড়িত ব্যক্তির রক্ষণ; তৃতীয়তঃ কৃষি-বাণিজ্যাদি উপায়ে অর্জ্জিত অর্থের পরোপকারার্থে দান; এবং চতুর্থতঃ কায়িক পরিশ্রম দ্বারা সেবা। যিনি সেবায় কুশল, তিনিই শ্রেষ্ঠ-ধার্ম্মিক। (৪)

(৪) হিন্দুশাস্ত্রে আছে—ধার্ম্মিক মানব প্রত্যহ পঞ্চমহাযজ্ঞ করিবেন। ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ এই ৫টী মহাযজ্ঞ। পঞ্চ হবৈ মহাযজ্ঞাঃ তানেতান্ অহরহঃ কুর্ব্বীত। (শতপথশ্রুতি।) ব্রহ্মযজ্ঞ অধ্যাপন জ্ঞানদান। পিতৃযজ্ঞ পিতৃপুরুষের উদ্দেশে যথাশক্তি দান। দেবযজ্ঞ পূজাহোম প্রভৃতি। ভূতযজ্ঞ গবাদি পশুগণকে অন্নাদিদান। মনুষ্যযজ্ঞ অতিথিসেবা। ইহার মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞ বা জ্ঞানদানই শ্রেষ্ঠদান। এই জ্ঞানদান ১ম শ্রেণীর সেবা। জ্ঞানদাতা একভাবে সেবক। শিক্ষা একজাতীয় সেবা। আর্ত্তত্রাণ ২য় শ্রেণীর সেবা। ইহাকে প্রাণদান নাম দেওয়া যাইতে পারে। ১ম জ্ঞানদান, ২য় প্রাণদান, তৃতীয় ধনদান, চতুর্থ কায়িকশ্রম দ্বারা সেবা। কায়িকসেবা, শূদ্রকর্ম্ম। কৃষ্যাদি দ্বারা অর্জ্জিত ধনের দান ধনদানসেবা, বিশেষভাবে ইহা বৈশ্যকর্ম্ম।

আর্ত্তত্রাণ ক্ষত্রধর্ম্ম এবং জ্ঞানদান ব্রাহ্মণধর্ম্ম। আচার্য্য, যোদ্ধা, বণিক্ ও শ্রমিক সকলেই সমাজসেবক। যিনি যত উচ্চে, তাঁহার সেবা সমাজের তত হিতকরী। ব্রাহ্মণ যদি সমাজে জ্ঞানবিতরণ না করেন, ক্ষত্রিয় যদি আর্ত্তত্রাণে অমনোযোগী হন, বৈশ্য যদি কৃষিবাণিজ্যাদিলব্ধ অর্থ দ্বারা সমাজের সেবা না করিয়া নিজের উদরপূরণেই মনোযোগ করেন, আর শূদ্র যদি কায়িকশ্রম দ্বারা সমাজের সেবা না করেন, তবে তাঁহাদিগকে ধার্ম্মিক বলিব না। যিনি স্ব স্ব বর্ণোচিত গুণের অনুযায়ি সেবা দ্বারা সমাজের কল্যাণসাধন করেন, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক। এই সেবাকার্য্য গুণের বা উপযোগিতার পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

পৃথিব্যাং মানবঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রাণিষ্বেষঃ স্বরাড়্ মতঃ,
ভূতেষু সদয়ঃ কার্য্যো ব্যবহারস্ততো নৃভিঃ।
শাশ্বতস্যাস্য ধর্ম্মস্য ভারতীয়স্য নিশ্চিতং
সদয়-ব্যবহারোঽয়ং পুণ্যমঙ্গমিতীরিতম্। ৫

পৃথিবীস্থ প্রাণিগণের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ ও অপর প্রাণীদিগের সম্রাট্‌স্বরূপ। অতএব ইতরপ্রাণীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করা মনুষ্যদিগের কর্ত্তব্য। এইরূপ সদয় ব্যবহার, ভারতীয় শাশ্বতধর্ম্মের পবিত্র অঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। (৫)

(৫) মনুষ্য-জন্মই শ্রেষ্ঠজন্ম। মানুষের অপর প্রাণীর প্রতি কর্ত্তব্য আছে। যে যত উচ্চাধিকারী তাহার দায়িত্বও তত অধিক। মনুষ্যের কর্ত্তব্যের মধ্যে 'ভূতযজ্ঞ' আছে। প্রাণিগণকে আহার-দান ও তাহাদের প্রতি কোমল ব্যবহার করা এই 'ভূতযজ্ঞের' অন্তর্গত। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের এই অংশ পরমপবিত্র ও বিশ্বপ্রেমের সূচক। হিন্দু শাস্ত্রে আছে—গবাদি পশুকে সেবা করা—ঘাস দেওয়া প্রভৃতি হিন্দুর দৈনন্দিন কর্ত্তব্য। হিন্দু শাস্ত্রে আছে, অহিংসা দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবে। যদি উহা অসম্ভব হয়, তবে অল্প হিংসা করা যাইতে পারিবে। অহিংসাই পরম আদর্শ, তবে সম্পূর্ণরূপে আদর্শপালন অসম্ভব হইলে যতদূর সম্ভব অহিংসার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে।

দেশকালব্যক্তিভেদাদ্ বহিরাবরণানি হি
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য ভিদ্যন্তে বহুধা খলু,
তেষাং ভেদেঽপি ধর্ম্মস্য মূলতত্ত্বং ন ভিদ্যতে
বহিরাবরণেভ্যস্ত্ব ভিন্নং তত্ত্বং বিবিচ্য বৈ
সামঞ্জস্যেন কর্ত্তব্যং ধর্ম্মজীবন-যাপনম্।

তন্মূলতত্ত্বং বিস্মৃত্য প্রাণভূতং মহত্তরম্
বহিরাবরণে যত্নো ন কার্য্যো হিতমিচ্ছুভিঃ।
সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষানলঃ সর্ব্বশুভান্তকঃ
যথা ন লভতে বৃদ্ধিং তথা কার্য্যং হি সর্ব্বদা! ৬

দেশকালপাত্রভেদে সনাতনধর্ম্মের বহিরাবরণের বহু ভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু, বহিরাবরণের অর্থাৎ বাহ্য আচার-ব্যবহারের ভেদে ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের কোন ভেদ বা বৈলক্ষণ্য হয় না। বহিরাবরণ হইতে মূলতত্ত্ব ভিন্ন পদার্থ,—ইহা বিবেচনা করিয়া যথাসম্ভব সামঞ্জস্যসাধন করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ মহত্তর মূলতত্ত্বগুলি ভুলিয়া শুধু বহিরাবরণে যত্নপ্রদর্শন, মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য নহে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবহ্নি সর্ব্বপ্রকার অশুভের আকর, অতএব যাহাতে উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, তাহাই সর্ব্বদা করা কর্ত্তব্য। (৬)

(৬) সনাতনধর্ম্মের বহিরাবরণ বিভিন্ন স্থানের নানাবিধ আচার ব্যবহার পূজাপার্ব্বণ প্রথাপদ্ধতি ইত্যাদি। আচার অনুষ্ঠানের পার্থক্যের প্রতি জোর দেওয়া উচিত নয়। শাক্ত বৈষ্ণবের বিরোধ, বৌদ্ধ ও যাজ্ঞিকের বিরোধ, হিন্দু-খৃষ্টান্—মুসলমানের বিরোধ—কেবল ধর্ম্মের বহিরাবরণ বা খোসা লইয়া। মূলে তত্ত্ব লইয়া গোল নাই। অনেক সময় দেশাচার বা বহিরাবরণ মূলতত্ত্বকে অতিক্রম করে, ইহা সঙ্গত নয়। ঐ সকল দেশাচার ধর্ম্ম নয়।

অনেকস্থলে হিন্দুসমাজের 'নিম্নবর্ণ'—নামে পরিচিত জাতির লোকদিগকে দেবমন্দিরে উঠিতে দেওয়া হয় না। এটা ঘোর অন্যায়। দেবতা শুচিহিন্দু-সাধারণের, মন্দিরও শুচিলোকদিগের জন্য। তবে সকল অবস্থায় সকলের পক্ষে দেব বিগ্রহ স্পর্শ করা সঙ্গত নয়। শুচিহিন্দুমাত্রেরই মন্দিরে যাবার অধিকার থাকা উচিত। এদেশে 'উচ্চবর্ণ'নামে পরিচিত লোকেরা 'নীচবর্ণ'নামে পরিচিত জাতির লোকদিগের দ্বারা আনীত জল পান করেন না। ইহা একান্তই অন্যায়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কাহারও শরীর দ্বারা স্পৃষ্ট জল ব্যবহার্য্য নয় ইহা সত্য, কিন্তু নিম্নবর্ণের লোকেরা জলের আধারটী পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলে দোষ হইবে, ইহা আচার হইতে পারে, তবে সদাচার নহে, অত্যাচার। অশুচি-স্পৃষ্ট জলপাত্রের জল না খাইলাম, কিন্তু শুচিনিম্নবর্ণের স্পৃষ্ট পাত্রের জল না খাইবার হেতু নাই।

স্পর্শদোষ সকল স্থানে ধরা হয় না। কাশ্মীরে মুসলমান্ 'ভৃত্যের' দ্বারা ব্রাহ্মণকে অন্ন পাঠান যায়। অন্নপাত্রটী কাপড়ে মুড়িয়া একগাছি লাঠীর মাথায়

বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ভৃত্য লাঠীর গোঁড়া ধরিয়া লইয়া যায়। উহাতে লাঠীর আগায় বাঁধা অন্নপাত্র কলুষিত হয় না। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ আহার করিতে বসিলে, তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্তভাগে যদি কোনও কায়স্থের গাত্রবস্ত্রের প্রান্ত সংস্পৃষ্ট হয়, তবে ব্রাহ্মণের অন্ন দূষিত হয়। এই সকল বৈচিত্র্য শৌচাচার-বিধানের হাস্যকর অপব্যবহার। এদেশের নিম্নবর্ণের স্পৃষ্ট পাত্রের জলে দোষ হয়, অথচ তাহাদেরই আনীত "সোডাওয়াটার্" 'বরফে' দোষ হয় না। দেশের পক্ষে এসকলই অনিষ্টকর।

অজ্ঞতা, অভ্যাস ও সম্প্রদায়গত সংস্কারের প্রতি বেশী মমতা বা গোঁড়ামী বশতই সাম্প্রদায়িক বিরোধ ঘটে। নিজের মতের প্রতি অন্ধ অনুরাগ থাকে থাকুক, কিন্তু অপরের মতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কর্ত্তব্য নহে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের সাম্প্রদায়িক বিরোধে জগতে যত অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে, অন্য কোন কারণেই তত হয় নাই। সনাতনধর্ম্মের আসনে সাম্প্রদায়িক আচারকে বসাইয়া, সেই সাম্প্রদায়িক আচাররূপ ধর্ম্মের নামে, মানুষ মানুষের উপর যে পৈশাচিক অত্যাচার করিয়াছে, তাহা জগতের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। সকল সম্প্রদায়ই যদি তাঁহাদের ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের প্রতি মনোযোগ করেন, তাহা হইলে বিরোধ থাকে না।

জগত্যাং বহবঃ সন্তি ধর্ম্মাচারাঃ পৃথগ্‌বিধাঃ
সর্ব্ব এবানুবর্ত্তন্তে তে সনাতনধর্ম্মকম্,
কেচিৎ স্পষ্টতয়া কেচিত্তথাস্পষ্টতয়া চ তে,
উপজীবন্তি ধর্ম্মস্য মূলান্যস্য মহান্তি হি।
তেষু তেষু চ ভিন্নেষু সম্প্রদায়েম্ববস্থিতম্—
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলতত্ত্বং যথা যথা—
বিকাশং লভতে ক্ষিপ্রং তথা কার্য্যমমায়য়া। ৭

পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকারের বহু ধর্ম্মাচার প্রচলিত আছে; উহারা সকলেই সনাতনধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করে। কোন ধর্ম্মাচার স্পষ্টভাবে এবং কোনওটী বা অস্পষ্টভাবে সনাতনধর্ম্মের মহৎ মূলতত্ত্বগুলির অনুবর্ত্তন করিয়া জীবিত আছে। সেই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ে অবস্থিত সনাতনধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি যে উপায়ে শীঘ্র বিকাশ লাভ করে, তাহাই অকপটে করা কর্ত্তব্য। (৭)

(৭) পুণ্যভূমিভারতে পরমর্ষিগণের মুখারবিন্দনিঃসৃত সনাতনধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। ঐ ধর্ম্মের জ্যোতি অন্য দেশে বিকীর্ণ হইয়া তত্তদ্দেশের ধর্ম্মজীবন

গঠন করিয়াছে। বেদই মানবজাতির ভারতীয় সনাতনধর্ম্মের আদিম গ্রন্থ। ঐ বেদই মূল প্রমাণ। চীন, ব্যাবিলোনিয়া, মিশর, আসিরীয়া, প্রভৃতি সকল দেশেই প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মজ্যোতি বিকীর্ণ হইয়াছিল। পারসীক, চীন, ইহুদী, খ্রীষ্টান, মুসলমান্ সকলেই বেদ হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছেন। এককথায় সকলেই বেদের অনুগামী। তবে কেহ সাক্ষাদ্ ভাবে, কেহ বা পরোক্ষ-ভাবে হিন্দুর বেদের অনুবর্ত্তন করেন—একথা আমরা স্বতন্ত্রপ্রবন্ধে প্রকাশ করিব। মহর্ষি মনু ইহার আভাস দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'এতদ্দেশ-প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ। স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ। এই দেশের অগ্রজন্মা বা জ্ঞানী ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে পৃথিবীর সকল মানুষ স্বীয় স্বীয় আচরণ শিক্ষা করে।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্যন্তর্যামিবৎ স্থিতঃ।
ইদং তথ্যং মানবানাং সর্বেষাং মনসি স্ফুটং
যথা স্যাদঙ্কিতং, চিত্তং ভবেৎ তদ্ভাবভাবিতং
যেন যেন হি রূপেণ, তথা কার্য্যং বিপশ্চিতা। ৮

ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে বিদ্যমান আছেন; এই তথ্য যে উপায়ে সকল মানবের মনে স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয় এবং তাহাদের চিত্ত সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, বিদ্বান্ ব্যক্তির তাহা করাই কর্ত্তব্য। (৮)

(৮) ঈশ্বর সকলের অন্তরে বিরাজিত ইহা বৈদিক সত্য। তিনি জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যেই আছেন। উচ্চ নিম্ন সকলের মধ্যেই তিনি আছেন। সকল মানুষই ভগবানের আধার—এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলে, যেমন আত্মসম্মান বর্দ্ধিত হইবে, তেমন অন্যের প্রতি অবজ্ঞা করিবারও কোনও সম্ভব থাকিবে না। সকল মানুষের মধ্যে অন্তর্যামী আছেন—মনে হইলে ঘৃণা বিদ্বেষ বিরোধ দূরে যায়। সর্ব্বদেশে এই সত্য ঘোষণা করিতে হইবে। বেদে আছে—ভগবান্ অন্তর্যামী, তিনি আকাশ বাতাস জল ও জীব সকলে থাকিয়া সকলের নিয়মন করেন। এই সত্য যাহাতে সকল মানবের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। নিম্নবর্ণের লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইবে। কেহই যাহাতে ধর্ম্মশিক্ষায় বঞ্চিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে সকলকে একরূপ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। অধিকার অনুসারে বিভিন্নরূপ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হইবে। সকলেই যে বেদমন্ত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবে তাহা নহে। যাহার যেরূপ যোগ্যতা, তাহাকে সেইরূপ

শিক্ষা দেওয়াই সঙ্গত। কিন্তু এ বিষয়ে কুসংস্কার থাকা উচিত নয়। পূর্ব্বে শূদ্রগণও বেদশিক্ষা করিতে পারিতেন। যজুর্ব্বেদে আছে—'যথেমাং বাচং কল্যাণীং বদানি ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় স্বায় চারণায় ইত্যাদি। অর্থাৎ এই বেদবাণী আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, দাস ও চারণগণকে বলি। এখানে ভারতীয় সমাজের ব্রাহ্মণাদি ৪ জাতির কথাই যে বলা হইয়াছে তাহা নয়, পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতির কথা বলা হইতেছে, কারণ গুণকর্ম্মানুসারে সকল মানবই ৪ বর্ণের অন্তর্গত হয় অর্থাৎ সকল দেশেই জ্ঞানদাতা আর্ত্তত্রাতা ধনদাতা ও কায়িক শ্রম দ্বারা সমাজসেবক আছেন. তাঁহারাই ব্রাহ্মণাদিজাতির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, খৃষ্টান্ মুসলমান্ প্রভৃতি জাতির সম্বন্ধেও এই অনুশাসন প্রযোজ্য। পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিকগণকে শূদ্র বলা যায়। সমস্ত শিক্ষকদিগকে ব্রাহ্মণ, সমস্ত যোদ্ধ্‌বর্গকে ক্ষত্রিয় ও সমস্ত কৃষি-বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদিগকে বৈশ্য বলা যায়। মানুষমাত্রেরই ঈশ্বরের উপাসনা কর্ত্তব্য। যে যেমন অধিকারী, সে সেই ভাবে করিবে।

বেদে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' অদ্বয় ব্রহ্মের কথা আছে, কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মের ধারণা করা অসম্ভব বিধায় উপাসনার সময়ে তাঁহার এক একটী ভাব লইয়া আরম্ভ করিতে হয়। হিন্দুর মধ্যে যেমন অধিকার অনুসারে বিভিন্নরূপ ভাবে ধারণা করিতে বলা হইয়াছে, বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন মানবের মধ্যেও সেইরূপ নানাভাবের ধারণার প্রয়োজন আছে।

আলম্বন ভিন্ন অনন্তের চিন্তা হয় না—এজন্য হিন্দুরা চিত্র, প্রতিমা, মনোময়ী মূর্ত্তি প্রভৃতি নানা আলম্বন গ্রহণ করেন, তাহার মূলেও অধিকারভেদ। ঐ সব মূর্ত্তিতে ঈশ্বরের এক একটী বিশেষ ভাব দেখান হয়। সমষ্টিতে ব্রহ্ম, ব্যষ্টিতে এক একটী ভাব বা মূর্ত্তি। অখণ্ডভাবে 'একমেবাদ্বিতীয়ম' পৃথগ্‌ভাবে বহু দেবতা। বহুদেব অর্থ বহু ঈশ্বর নহে। মূর্ত্তি অবলম্বনে ঈশ্বরেরই উপাসনা করা হয়। মূর্ত্তিপূজা জড়োপসনা নহে। তৈলচিত্র আলোকচিত্র প্রভৃতি যেমন আলম্বন, প্রতিমাও সেই শ্রেণীর।

হিন্দুধর্ম্ম সকলের জন্য একরূপ বা ১টী আলম্বন দিতে বলে না। এক পদার্থ মূর্খ বিদ্বান্ জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলের উপাস্য হইতে পারে না। বস্তুতঃ সকলের উপাস্য এক হইলেও উপাসকের ভাব অনুসারে উপাস্যের ভাব ভিন্ন হয়। একই পদার্থ ভিন্ন ২ উপাসকের নিকট ভিন্ন২ ভাবে প্রতিভাত হয়। সকলের লক্ষ্য এক, কিন্তু উপায়, পথ বা অবলম্বন ভিন্ন এবং নিজ নিজ ভাবের অনুকূল। ক্রমে সসীমকে অসীমের দিকে, অল্পকে ভূমার দিকে, খণ্ড হইতে অখণ্ডের দিকে

[লইয়া যায়। শিশুর ও বয়স্কের শিক্ষা এক হয় না। রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল-নানাপথজুষাং নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণবইব—আবার সকল শিশুরও শিক্ষা একরূপ হইতে পারে না। রুচির বৈচিত্র্য বশতঃ ঋজু কুটিল নানা পথে লোক তোমার দিকে অগ্রসর হইতেছে, তুমিই সকলের গন্তব্য স্থান, যেমন নানা পথে নানা নদী একই সাগরের উদ্দেশে ধাবিত হয় তদ্রূপ।

ব্যক্তিগত উপাসনা চাই, কিন্তু তদতিরিক্ত সমবেত উপাসনার ব্যবস্থা করাও আবশ্যক। ব্যক্তিগত উপাসনায় ব্যক্তির মন ঈশ্বরের দিকে সমধিক আকৃষ্ট হয়, আর সমবেত উপাসনার ফলে সকলের মধ্যে একপ্রাণতার উদয় হয়। যাবৎ জ্ঞানের উৎকর্ষ না হয়, তাবৎ অসীমের উপাসনা অসম্ভব, কিন্তু উহাই চরম বস্তু মনে করা কর্ত্তব্য। উচ্চ জ্ঞানের পরিপাক না হওয়া পর্য্যন্ত অধিকারের অনুরূপ ভাবে উপাসনা করা উচিত। কিন্তু, সমবেত-উপাসনা সকলের পক্ষে একরূপ হওয়া আবশ্যক। খ্রীষ্টানেরা যেমন রবিবারে এবং মুসলমানেরা যেমন শুক্রবারে সমবেত উপাসনা করেন, আমাদের মধ্যে যেমন হরি-সংকীর্ত্তনাদি সমবেতভাবে হয়, তদ্রূপ সাধারণের সমবেত উপাসনা করা চাই। সমবেত উপাসনার মন্ত্র এইরূপ—

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়,
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়। ১

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যম্
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃ প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্। ২

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকম্
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকানাম্। ৩

পরেশপ্রভো সর্ব্বরূপপ্রকাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য
অচিন্ত্যাক্ষরব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব

জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ। ৪

তদেকং স্মরামস্তদেকং জপামঃ

তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।

সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং

ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ। ৫

সকল লোকের আশ্রয় সৎস্বরূপকে নমস্কার করি। বিশ্বরূপাত্মক জ্ঞান-স্বরূপকে নমস্কার করি। মুক্তিদায়ক অদ্বৈততত্ত্বকে নমস্কার করি। ব্যাপক নির্গুণ ব্রহ্মকে নমস্কার করি। ১

তুমিই একমাত্র শরণ্য, তুমিই একমাত্র বরেণ্য বা শ্রেষ্ঠ, তুমিই একমাত্র জগৎকারণ ও বিশ্বরূপ। তুমিই জগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা ও সংহার-কর্ত্তা। তুমিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ নিশ্চল ও নির্ব্বিকল্প। ২

তুমি ভয়ের ভয় এবং ভীষণগণেরও ভীষণ, তুমি প্রাণিগণের গতি, তুমি পাবনগণেরও পাবন। উচ্চপদাধিগণেরও তুমি নিয়ন্তা, তুমি শ্রেষ্ঠগণেরও শ্রেষ্ঠ, তুমি রক্ষকগণেরও রক্ষক। ৩

তুমি পরেশ, প্রভু, সর্ব্বলোকপ্রকাশক, তুমি অনির্দ্দেশ্য, সকল ইন্দ্রিয়ের অগম্য ও সত্যস্বরূপ, তুমি অচিন্ত্য, অক্ষর, ব্যাপক ও অব্যক্ততত্ত্ব; জগদ্-ভাসক ও অধীশ্বর, অনিষ্ট হইতে (আমাদিগকে) রক্ষা কর। ৪

একমাত্র তোমাকে স্মরণ করি, একমাত্র তোমাকেই জপ করি, জগৎ-সাক্ষিস্বরূপ তোমাকেই নমস্কার করি, একমাত্র সৎ জগতের কারণ, আলম্বন-রহিত ঈশ্বর—ভবসাগরের পোতস্বরূপ শরণ্য তোমারই নিকটই শরণ গ্রহণ করিলাম। ৫

উপাসনার প্রকৃত মর্ম্ম সকলকে অর্থাৎ উচ্চ নিম্ন সকল অধিকারীদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। উপাসনা অর্থ নিকটে উপস্থিত হওয়া। যাহার সম্মুখে যেরূপ আদর্শ থাকে, সে তাহারই নিকটে উপস্থিত হইতে পারে। উপাসনা ও প্রার্থনা দুইটী স্বতন্ত্র জিনিষ। উপাসনায় কোনও প্রার্থনা নাই। উপাসনায় আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হওয়া। সাবিত্রীর আরাধনা উপাসনা। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ—অর্থাৎ যিনি বিশ্বের কারণস্বরূপ, যাহার উপর বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—এবং যাঁহাতেই বিশ্ব তাঁহার ইচ্ছানুসারে লীন হয়, যাঁহার সত্তা দ্বারা পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও স্বর্লোক পরিব্যাপ্ত, সেই আদি কারণের

পরমদেবতার পূজনীয় তেজঃপুঞ্জ ধ্যান করি। তিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করিয়াছেন। পশ্বাদির প্রার্থনাও নাই, উপাসনাও নাই। মানুষের প্রার্থনাও আছে, উপাসনাও আছে। মানুষের কোনও অভাব হইলে সে অভাব-মোচনের জন্য কাহারও না কাহারও নিকট প্রার্থনা করে। দরিদ্র ধনীর নিকট ধন প্রার্থনা করে—অজ্ঞানী জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান প্রার্থনা করে ইত্যাদি। আবার মানুষ সর্ব্বমঙ্গলাধারের নিকটে গিয়া তাহার অভাবমোচনার্থ তাঁহার নিকট ধন জন বিদ্যা বুদ্ধি স্বাস্থ্য সুখ প্রভৃতি প্রার্থনা করে। প্রার্থনা করিলেই যে পাওয়া যায় তাহা নহে। দাতা প্রার্থী পাওয়ার যোগ্য কিনা—তাহা না দেখিয়া দান করেন না। অযোগ্য প্রার্থনা সফল হয় না। কিন্তু, কোনও আদর্শ দাতার নিকট উপস্থিত হইতে হইলেই প্রার্থীর স্বীয় উপযোগিতা লাভ করিতে হয়, এবং তাহার দ্বারাই তাহার আত্মোৎকর্ষ সাধন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। প্রত্যেকের ঈশ্বর তাহার আদর্শস্বরূপ। সেই আদর্শের নিকট প্রার্থনা করিতে হইলেই তাহার সন্নিধি প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় প্রার্থনা সকাম হইলেও, নির্ম্মল আদর্শের নিকট প্রার্থনা করিতে হইলে স্বীয় নির্ম্মলতা সাধন করা আবশ্যক।

গায়ত্রীর উপাসনা সম্পূর্ণ নিষ্কাম, ইহাতে ভগবানের ধ্যান ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। সাধক ভগবান্‌কে আদর্শরূপে রাখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেছেন মাত্র। এরূপ উচ্চ আদর্শের উপাসনা পৃথিবীর অন্য ধর্ম্মে নাই। এজন্য নিম্নাধিকারীদিগকেও ইহার আস্বাদন দেওয়া আবশ্যক। সমবেত উপাসনায় এই গায়ত্রীমন্ত্র সর্ব্বশ্রেণীর সনাতনধর্ম্মাবলম্বিদিগের দ্বারা সমস্বরে তাললয়-সহকারে গীত হইলে, উপাসকমণ্ডলীর হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইবে, এবং তাহারা সেই অন্তর্যামিপুরুষের সত্তা কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

অস্মদ্দেশে দ্বিজাতি ভিন্ন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ভিন্ন অন্য কাহাকেও গায়ত্রীমন্ত্র পাঠ করিতে দেওয়া হয় না, কিন্তু উহা যে পৃথিবীর সর্ব্ব নরনারীর জন্য তাহা বেদে সুস্পষ্ট রহিয়াছে—যথা যথেমাংবাচং কল্যাণীং বদানি ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় স্বায় চারণায় ইত্যাদি।

অতিনিম্নাধিকারীদিগকেও কখনও ২ উচ্চাধিকারের আস্বাদ লইতে দেওয়া উচিত, এবং সেই জন্য সমবেত উপাসনায় গায়ত্রীমন্ত্রের সমবেত-সঙ্গীতপ্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক।

ঘৃণ্যো ধর্ম্মবিরোধশ্চ বিরোধঃ সাম্প্রদায়িকঃ
তৌ নিমিত্তমনর্থানাং সদাজ্ঞানবিজৃম্ভিতৌ।
জ্ঞানালোকসহায়েন দূরীকৃত্যাজ্ঞতাতমঃ
জনঃ কৃতার্থতাং যাতু সমাজশুভচিন্তকঃ।
পরার্থং স্বার্থং মন্যেত, স্বার্থং প্রাহুরনর্থকম্,
জ্ঞানী স্বার্থাবিরোধেন পরার্থামুপসেবতে।
পরার্থ-স্বার্থয়োর্লোকে বিরোধো নাস্তি কশ্চন,
দ্বয়োঃ সমন্বয়ং কৃত্বা কৃতার্থং মাং সমর্থয়ে। ৯

ধর্ম্মবিরোধ এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধ ঘৃণার্হ; উহা অজ্ঞানবিজৃম্ভিত এবং অনর্থের হেতু। সমাজহিতকামী মানব জ্ঞানলোক-সাহায্যে অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া কৃতার্থতা লাভ করুন।

পরার্থকে স্বার্থ মনে করিতে হইবে; পণ্ডিতেরা স্বার্থকে অনর্থকর বলিয়াছেন। জ্ঞানী স্বার্থ ও পরার্থের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করিবেন। পৃথিবীতে পরার্থে ও স্বার্থে কোন প্রভেদ নাই। এতদুভয়ের সমন্বয় করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করি। (৯)

(৯) সংসারের সমস্ত বিরোধের মূল স্বার্থ-সংগ্রাম। স্বার্থ রক্ষা না হইলে কেহই সন্তুষ্ট হয় না। সাধারণ লোক মাত্র স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত, অথচ প্রকৃত স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করে না। প্রকৃতপক্ষে পরার্থই পরমস্বার্থ। ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকিলে, পরম বা চরম স্বার্থে বঞ্চিত হইতে হয়। আমি যদি দেশের সমস্ত অর্থ নিজে ভোগ করিতে চাই, তবে আমার সে ভোগস্পৃহা চরিতার্থ হইবে না। জনসাধারণ আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। ধনের ভোগ ত দূরের কথা, প্রাণ-রক্ষার উপায়ও থাকিবে না। সুতরাং যাহাতে অপরের স্বার্থে আঘাত না লাগে, সেই ভাবে সাবধানে স্বার্থ-সাধনই প্রকৃত কর্ত্তব্য। ঐভাবে কার্য্য করিতে গেলে, প্রথমে পরের স্বার্থের প্রতি মনোযোগী হইয়া পরে অন্যের স্বার্থের অবিরোধে নিজের মহৎ স্বার্থের চিন্তা করিতে হয়। অপরের স্বার্থের অবিরোধী স্বার্থ একভাবে পরার্থের নামান্তর। স্বার্থ ও পরার্থের সমন্বয় না ঘটিলে সংসারের স্বার্থসংগ্রামের নিবৃত্তি হইবে না। অধিকাংশ মানব ক্ষুদ্রস্বার্থদ্বন্দ্বে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য। স্বার্থের ও পরার্থের সামঞ্জস্য স্থাপিত হইলে শান্তির প্রতিষ্ঠা হইবে।

সর্ব্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ,
সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মাস্তু কশ্চন দুঃখভাক্।
শুভং মিত্রস্য ভূয়াম্নঃ শত্রোরস্তু শিবং সদা
দুষ্টস্যাপ্যশুভং মাভূৎ শিষ্টঃ প্রাপ্নোতু মঙ্গলম্।
মানবাঃ সর্ব্বদেশীয়াঃ সর্ব্বধর্ম্মপরাঃ খলু
সম্প্রদায়েষু সর্ব্বেষু বসন্তো হিতমিচ্ছবঃ
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলতত্ত্বং নিশম্য তৎ
জ্ঞাত্বাবলম্ব্য তিষ্ঠন্তু ধর্ম্মমার্গে নিরন্তরম্।
কৃতার্থোঽহং ভবিষ্যামি সর্ব্বান প্রজ্ঞপ্য মানবান্
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলতত্ত্বং সুনিশ্চিতম্।
ভগবৎপাদয়োর্যাচে যদুনাথোঽহমানতঃ।
পূর্ণামাশামিমামীশঃ করোতু করুণাময়ঃ। ১০

সকলের মঙ্গল হউক, সকলে নিরাময় হউক; সকলে মঙ্গল দর্শন করুক, কেহই যেন দুঃখী না থাকে। আমাদের মিত্রগণের মঙ্গল হউক, আমাদের শত্রুরও সর্ব্বদা মঙ্গল হউক। দুষ্ট লোকেরও যেন অশুভ না হয়; শিষ্ট লোক মঙ্গল লাভ করুন। সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী এবং সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোকে সনাতনধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি শুনিয়া, বুঝিয়া ও অবলম্বন করিয়া নিরন্তর ধর্ম্মপথে অবস্থিতি করুক। সকল মানবের মধ্যে সনাতনধর্ম্মের অপরিবর্ত্তনীয় মূলতত্ত্বগুলি সম্যগ্‌রূপে প্রচার করিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিব। ভগবচ্চরণে বিনত যদুনাথ ইহাই প্রার্থনা করিতেছে, করুণাময় ঈশ্বর তাহার এই আশা পূর্ণ করুন। (১০)

(১০) বর্ত্তমানে সনাতনধর্ম্মের প্রচারবিধি লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীনকালে সনাতনধর্ম্ম সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। তখন সকলেই সনাতনধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিত। সেই প্রথার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই কার্য্য করিতে হইলে জ্ঞানী ধার্ম্মিক নিঃস্বার্থ পরোপকারী ধর্ম্ম-প্রচারকের আবশ্যক এবং তজ্জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। যেরূপ খ্রীষ্টানেরা তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বিভিন্ন দেশে প্রচারক প্রেরণ করেন, সনাতনধর্ম্মাবলম্বিদিগেরও সেইরূপ বিভিন্নদেশে প্রচারক প্রেরণ করা আবশ্যক। ঐ সকল ধর্ম্মপ্রচারকগণের জীবিকার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ধর্ম্মপ্রচারকেরা যে দেশে প্রচার করিবেন, তাঁহাদের অগ্রে সেই দেশের ভাষা ও

তত্রত্য অধিবাসিগণের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা আবশ্যক। এজন্য পৃথিবীর সকলস্থানের ভাষা শিক্ষা করার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

ওঁ শান্তিঃ।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

লেখক—শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র এম, বি-এ, এ।

অস্পৃশ্যের মুক্তি……মহাত্মা গান্ধী লিখিত ও সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-প্রণেতা শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন সঙ্কলিত। অভয় আশ্রম, ই ৭৬, কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পুস্তকের মলাটের উপর মুল্য লেখা নাই, দেখিলে মনে হয়—পুস্তকখানি যেন বিনামুল্যে বিতরণের জন্য, কিন্তু পরবর্ত্তী টাইটেল্-পেজে "মুল্য ৸৹ বার আনা মাত্র" লেখা আছে। এখানি প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ। গ্রন্থের আকার ও গুণের তুলনায় মুল্য সামান্যই বলিতে হইবে। মলাটে অভয় আশ্রমের নীচে কলিকাতার ঠিকানা আছে, ভিতরে টাইটেল-পেজের অপর পৃষ্ঠায় লেখা আছে—প্রকাশক শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন, অভয় আশ্রম, কুমিল্লা। সুতরাং, ক্রেতাগণ কুমিল্লা ও কলিকাতায় যে কোন স্থানেই পুস্তক খানি পাইবেন।

গ্রন্থ খানির উৎসর্গপত্রে লেখা আছে—"ভগবানের চক্ষে সকল মানুষ সমান হইলেও হিন্দু-সমাজে যাহারা অস্পৃশ্য বলিয়া নানাভাবে নিপীড়িত সেই কোটী কোটী নির্য্যাতিত ভাইদের নামে "অস্পৃশ্যের মুক্তি" উৎসর্গ করিলাম।" এ উৎসর্গ গ্রন্থের নামের উপযুক্তই হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী সময়ে সময়ে 'ইয়ংইণ্ডিয়া' ও হিন্দী-'নবজীবন' পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে যে সকল বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা হইতে অস্পৃশ্যতা-নিবারণ-সম্পর্কীয় উপাদান সঙ্কলন করিয়া, গ্রন্থকার বাঙ্গলাভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থ মধ্যে শ্রীযুক্ত সি, এফ্ এণ্ড্রুজ ও মহাদেব দেশাই লিখিত কয়েকটী প্রবন্ধও আছে। বলাবাহুল্য, সমস্ত প্রবন্ধই অস্পৃশ্যদের মুক্তির-উদ্দেশ্যে লিখিত। অস্পৃশ্যতা দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে যেরূপ সংক্রামিত ও

গুরুতর অবস্থায় পরিণত, সুখের বিষয়, বাঙ্গলাদেশে সেরূপ নহে। গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধই তজ্জন্য পারিয়া. ঢেড়, ভাঙ্গী, পঞ্চম প্রভৃতিদের কথাতে পূর্ণ। বাঙ্গলার নমঃশূদ্র, কৈবর্ত্ত এবং মেথরদের কথাও স্থানে স্থানে আছে।

অস্পৃশ্যতা যে 'হিন্দুধর্ম্মের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা নহে, ইহা বরং পাপ, ইহা সংযমের চিহ্ন নহে, বরং শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান এবং জাতীয় উন্নতির ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী"—ইহাই প্রমাণ করা এবং অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন করিতে সকলকে উপদেশ ও শিক্ষা দেওয়াই গ্রন্থ খানির মূল উদ্দেশ্য। ইহার ভাষা সরল ও সহজবোধ্য এবং সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর সুখপাঠ্য।

গ্রন্থে লিখিত সকল বিষয়ের সহিত আমরা একমত না হইলেও উহার মহৎ উদ্দেশ্য ও সৎসংকল্প সম্বন্ধে মতভেদ নাই। হিন্দুসমাজে যাহারা অস্পৃশ্যতা-দোষ বা 'শুচি বাই'-গ্রস্ত, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য। গ্রন্থ-পাঠান্তে তাঁহাদের অস্পৃশ্যতা-দোষ ও শুচিব্যাধি বিদূরিত না হইলেও অনেক শিক্ষা হইবে। হয়ত তাঁহারা ভবিষ্যতে সংযমে অভ্যস্ত হইয়া ক্রমে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিবেন—এরূপ আশা করা যাইতে পারে। গ্রন্থের যে যে স্থান আমাদের ভাল লাগিয়াছে, অথবা আমাদের মতে সমীচীন বলিয়া মনে হয়, তাহা উদ্ধৃত হইল। বিরুদ্ধ মতের উল্লেখ না করাই ভাল, কেন না, মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি।

৩-৫ পৃষ্ঠা—জাতিভেদ ও অন্তর্বিবাহ.........বিবাহ-বন্ধন ও পংক্তিভোজন ব্যতীতও প্রীতিস্থাপন ও অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন করা যাইতে পারে। অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন মানে পংক্তি-ভোজন ও বিবাহবন্ধন নহে। ব্যক্তিগত শুদ্ধাচারের জন্য একান্তে নির্জ্জনে ভোজন আমরা সমর্থন করি।

১৭ পৃষ্ঠা—জাতিভেদ......"জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দায়ী নহে। লোভ এবং নীতিধর্ম্মের প্রতি অবহেলাই আমাদিগকে পরাধীন করিয়াছে।"

১৮ পৃষ্ঠা—জাতিভেদ......"বৈষম্যের উপর জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ছোট বড়র কোন কথা নাই। * * * * কোন মুসলমান্ অথবা খৃষ্টান্‌কে সহোদরকে ভাইএর মত ভাই মনে করা আমি শক্ত মনে করি না। যে হিন্দু-ধর্ম্ম জাতিভেদ প্রথার সমর্থন করে, সেই হিন্দু-ধর্ম্ম কেবল মানুষের নহে—সকল প্রাণীর ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করে।" আমরা বলি, কেবল ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করিয়াই হিন্দুধর্ম্ম ক্ষান্ত হয় নাই, পূজারও ব্যবস্থা শাস্ত্রকারগণ দিয়াছেন, যথা—

প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূমাবশ্বচাণ্ডালগোখরং।

প্রবিষ্টো জীবরূপণ তত্রৈব ভগবানিতি ॥

২০ পৃষ্ঠা—জাতিভেদ······ * * "অস্পৃশ্যতাকে মহাপাপ মনে করি, ইহা সংযমের চিহ্ন নহে, কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান। এই অস্পৃশ্যতা কোন উপকার করে নাই, কিন্তু ইহা অনেককেই দাবাইয়া রাখিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এমন কিছু নাই, যাহাতে মানুষকে এত ছোট করিয়াছে।"

২৭ পৃষ্ঠা—শ্রীযুক্ত গান্ধী ও নিপীড়িত শ্রেণী······"বর্ত্তমানে যাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলা হয়, সেইরূপ এক ব্যক্তির নৌকায় শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গা পার হইয়াছিলেন—একথা যে রামায়ণে আছে, সেই রামায়ণ কতকগুলি লোককে কিরূপে কলুষিত' ও 'অস্পৃশ্য' বলিবে!"

২৮ পৃষ্ঠা—জাতিভেদ······"অস্পৃশ্যতা সমর্থন করিয়া হিন্দুরা পাপ করিয়াছে। ইহা আমাদিগকে হীন করিয়াছে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে।"

৪৯ পৃষ্ঠা—অস্পৃশ্যতা ও স্বরাজ······"যে প্রথার জন্য হিন্দুজাতির এক বিরাট্ অংশ পশু অপেক্ষা অধম হইয়াছে, সে প্রথার প্রতি আমি আন্তরিক ঘৃণা পোষণ করি।"

৫৪ পৃষ্ঠা—পথের বাধা······"বর্ণাশ্রমকে ভুল করিয়া জাতিভেদ বলা হয়। এ আন্দোলন বর্ণাশ্রমকে লোপ করিতে বলে না। এ আন্দোলন স্পষ্ট ভাবে অস্পৃশ্যতাকে বর্জ্জন ও অশাস্ত্রীয় পঞ্চম জাতি লোপ করিতে বলে।"

৬৭ পৃষ্ঠা—উচিত প্রশ্ন······" * * * * আজকাল বর্ণের বিপর্য্যয়, আশ্রমের চিহ্ন লোপ এবং ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, এই সব গুলির সংস্কার প্রয়োজন। ধর্ম্মজগতের আধুনিকতম আবিষ্কৃত সত্যের সহিত তাহাদিগকে মিলাইয়া লইতে হইবে।" আমরা বলি, তাহা হইলে প্রাচীনতম সত্যের সহিতও মিলিয়া যাইবে, কেননা—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

৮২ পৃষ্ঠা—হিন্দুধর্ম্মের তিন সূত্র······"মা সন্তানের যে সেবা করে অস্পৃশ্যরা সমাজের সেই সেবা করে। উহাদিগকে অস্পৃশ্য মনে করা, উহাদিগকে তিরস্কার করার অর্থ নিজেদের মনুষ্যত্ব নষ্ট করা। হিন্দুস্থান এখন দুনিয়ার সব যায়গায় অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য। ইহার কারণ, ভারত কোটি কোটি লোককে অস্পৃশ্য মনে করে। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, আমাদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে মুসলমান্ দুনিয়ায় অস্পৃশ্য হইয়াছে।

৮৯ পৃষ্ঠা—এম ডি-এনের প্রতি……"অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। অস্পৃশ্যতার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। যুক্তি দ্বারা ইহা সমর্থন করা যায় না। ইহা মানুষকে সেবার অধিকার হইতে ও বিপন্ন অস্পৃশ্যকে সেবার দাবী হইতে বঞ্চিত করে। জাতিভেদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। ইহা যুক্তিহীন নহে। * * * * জাতিভেদের মধ্যে 'ছোট বড়র' কথা নাই।

১০৬ পৃষ্ঠা—কন্যাকুমারী-দর্শন……"মূর্ত্তি পূজার প্রবর্ত্তন করিয়া হিন্দুরা এক ঈশ্বরকে বহু বলিয়া স্বীকার করে নাই; তাহারা জগৎকে দেখাইয়াছে যে, লোকে নানারূপে ভগবানের পূজা করিতে পারে ও করিবে।"

১১২ পৃষ্ঠা—সহভোজ……"আমি মানি না যে অন্তর্ভোজ সদ্ভাব বৃদ্ধি করে। আমি নিজে এই সব বাধা-নিষেধ মানি না, এবং নিষিদ্ধ খাদ্য না হইলে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে দিলে, যে কোন ব্যক্তির হাতে খাই, কিন্তু যে ব্যক্তি এই বন্ধন মানে, তাহার মনোভাবকে আমি সম্মান করি এবং কখনও নিজের মতকে উদার এবং তাহার মতকে অনুদার বলি না। বাহ্যিক উদার আচরণ সত্ত্বে আমি স্বার্থপর ও অনুদার হইতে পারি, এবং বাহিরের অনুদার আচরণ সত্ত্বে অপর এক ব্যক্তি উদার ও নিঃস্বার্থপর হইতে পারেন। উদ্দেশ্যের উপর দোষ গুণ নির্ভর করে। ভালবাসা বৃদ্ধি করিতে হইলে, অন্তর্ভোজের দরকার—এরূপ প্রচারের ফলে সদ্ভাব বৃদ্ধি হইবে না, কারণ ইহা লোকের মনে মিথ্যা সন্দেহ ও মিথ্যার আদর সঞ্চার করিবে।"

১৩২ পৃষ্ঠা—অস্পৃশ্যতা……"হিন্দুধর্ম্ম দয়াপ্রধান ধর্ম্ম। অস্পশ্যতা ঘৃণা-বিদ্বেষ-পূর্ণ।"

বর্ষা-প্রীতি।

(লেখক—শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র দেওয়ান।)

কি উল্লাস নাহি জানি গগনে অঙ্গনে,
ঝড়ের মৃদঙ্গ মন্দ্রে বাজে ক্ষণে ক্ষণে।
বিকম্পিত স্বরঞ্জিত দামিনী-কেতন

কেবা আসে ঘর্ঘরিয়া, মেঘের স্যন্দন।
ছুটিতেছে দিগন্তরে, উঠিয়াছে তান,
মধুর পবন কণ্ঠে, অফুরাণ গান।
কম কল হংস-স্বরে দিলা হুলুধ্বনি,
দিগঙ্গনা ; অকস্মাৎ সাজিলা অবনী
শ্যামল সজ্জায়, একি চারু সুধাময়!
বিচিত্র দর্দ্দুর-কণ্ঠে কিবা গীতি গায় ?
মেলিয়া পেখম চারু নাচে শিখী কেন,
নাহি জানি নাহি জানি কি উল্লাস হেন ?
কেতকী-কামিনী কেন আমোদিলা দিশি,
কুমুদ-কহ্লার হাসে কি আনন্দে মিশি ?
কদম্ব শিহরি উঠে আনন্দ অধীর,
পুলক-রোমাঞ্চ তার সমগ্র শরীর !
তরঙ্গিনী রঙ্গরসে তুলিছে সঙ্গীত
সুমধুর। কারে আজি করিছে ইঙ্গিত ?
ভাবাবেশে তরুলতা কিশলয় করে,
তরঙ্গ-বিভঙ্গ-রঙ্গে আনন্দ অন্তরে।
নাচিতেছে অম্বুনিধি কম্বুনাদে গাহি !
উঠেছে সঙ্গীত কিবা আজ বিশ্বব্যাপী।
ঝঙ্কারিয়া মুক্ত সুরে মধুর মল্লারে ;
মর্ম্মবীণা পাইয়াছে সাড়া, আপনারে
চাহে সাধিবারে। কেবা দোলে হিন্দোলায় ?
চকিতে লেগেছে দোল বিহ্বল হিয়ায়।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩৩শ বর্ষ, ৩৩শ খণ্ড
২য় সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ।

১৩৩৩ সাল
১৮৪৮ শকাব্দাঃ

দেবী-স্তোত্র।

লেখক—সম্পাদক

বিষ্ণু মায়ারূপে তুমি আজ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে,
নমস্কার পুনঃ পুনঃ।
চৈতন্য রূপেতে তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে
নমস্কার পুনঃ পুনঃ।
বুদ্ধিরূপে, দেবি। তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে,
নমস্কার পুনঃ পুনঃ॥

নিদ্রারূপে, দেবি! তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে,
নমস্কার পুনঃ পুনঃ ॥
ক্ষুধারূপে, দেবি! তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে,
নমস্কার পুনঃ পুনঃ ॥
তৃষ্ণারূপে, দেবি! তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে,
নমস্কার পুনঃ পুনঃ ॥
বিদ্যারূপে, দেবি! তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে,
নমস্কার পুনঃ পুনঃ ॥
অবিদ্যারূপেতে তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে
নমস্কার পুনঃ পুনঃ ॥
শক্তিরূপে, দেবি! তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে
নমস্কার পুনঃ পুনঃ ॥
ক্ষান্তিরূপে, দেবি! তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে,
নমস্কার পুনঃ পুনঃ ॥
জাতিরূপে, দেবি! তুমি আছ সর্ব্বভূতে,
নমস্কার তব পদে,
নমস্কার পুনঃ পুনঃ ॥
লজ্জারূপে, দেবি! তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে,
নমস্কার পুনঃ পুনঃ ॥
শান্তিরূপে, দেবি! তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে,
নমস্কার পুনঃ পুনঃ ॥

শ্রদ্ধারূপে, দেবি! তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে,
নমস্কার পুনঃ পুনঃ ॥
কান্তিরূপে, দেবি! তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে,
নমস্কার পুনঃ পুনঃ ॥
লক্ষীরূপে, দেবি! তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে,
নমস্কার পুনঃ পুনঃ ॥
বৃত্তিরূপে, দেবি! তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে,
নমস্কার পুনঃ পুনঃ ॥
স্মৃতিরূপে, দেবি! তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে,
নমস্কার পুনঃ পুনঃ ॥
দয়ারূপে, দেবি! তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে,
নমস্কার পুনঃ পুনঃ ॥
তুষ্টিরূপে, দেবি! তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে,
নমস্কার পুনঃ পুনঃ ॥
মাতৃরূপে, দেবি! তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে,
নমস্কার পুনঃ পুনঃ ॥
ভ্রান্তিরূপে, দেবি! তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে,
নমস্কার পুনঃ পুনঃ ॥
ব্যাপ্তিরূপে, দেবি! তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে,
নমস্কার পুনঃ পুনঃ ॥

চিতিরূপে, দেবি! তুমি আছ সর্ব্বভূতে
নমস্কার তব পদে,
নমস্কার পুনঃ পুনঃ ॥
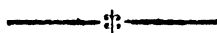
আকাশ মঙ্গল।

লেখক—শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র দেওয়ান কাব্যতীর্থ।

হে অসীম, হে বিচিত্র, হে বিপুল অনন্ত আকাশ!
বিরাট আভাস!
দাও তুমি চিত্তে মোর নিঃসহায় অনন্ত আশ্বাস
পূর্ণ অহরহঃ;
দেহে তব লক্ষ কোটী ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে সদা সহ
সূর্য্য চন্দ্রগ্রহ।
তোমাতেই লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের বিচিত্র বিকাশ
ঝটিকা উচ্ছাস!
তোমাতেই মেঘোদয় ইন্দ্র চাপে সুরম্য বিহাস
চঞ্চলা বিলাস!
তোমাতেই বিচ্ছুরিত আদিত্যের নির্ম্মল আলোক
ঝলকি ভূলোক!
তোমারই বক্ষদেশে জ্যোৎস্নাদেবী সাজায় দ্যুলোক
মুগ্ধ নর লোক!
ঘুর্ণ বেগে চূর্ণ হয়ে তোমাতেই বিশ্ব লভে লয়
কক্ষান্তে আশ্রয়।
নিখিলের প্রতি অনু ওতঃ প্রোত রয়েছ নিশ্চয়
নাহি তব ক্ষয়,
নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত তুমি নির্ব্বিকার অটল অচল
শাশ্বত নির্ম্মল!

হে সুন্দর অমলিন সর্ব্বাধার, সত্য অবিকল
নিখিল মঙ্গল !
চিত্ত মল লুপ্ত হয় বসে যবে করি তব ধ্যান
পূর্ণ হয় প্রাণ ।
পূর্ণ তুমি শূন্য নহ হে অসীম শান্তির নিদান
অক্ষয় কল্যাণ !

শারদ লক্ষ্মী ।

লেখক—শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ান ।

অতুল তুষার শুভ্র অম্বুদ বিমানে
সঞ্চারি মন্থরে,
নামিছে স্নিগধ হাস্যে বিশ্ব বিনোদিয়া
উজ্জ্বলি অম্বরে ;
প্রমত্ত প্রপাতে পৃথ্বী নামে রূপ ছটা
নির্ম্মল উচ্ছল !
লুটিছে প্রান্তর বক্ষে চঞ্চল সমীরে
শ্যামল অঞ্চল ।
বিপুল বিস্ময়ে বিশ্ব মন্ত্র মুগ্ধ যথা
নিরখে থমকি' ।
—অপরূপ রূপে আসে কেবা এ সুন্দরী
দিগন্ত ঝলকি' ।
শ্রাবণের রনাঙ্গনে শুভ্র মেঘ কেতু
রটে কি ইঙ্গিত ।
ধরণীর মর্ম্ম রন্ধ্রে উঠিল কি আজ
শান্তির সঙ্গীত ।

থেমে গেল এক ভীম ঘন ঘন ঘটা
মত্ত প্রভঞ্জন !
বজ্রের নির্ঘোষ আর দামিনী ভ্রূকুটী
ঝরকা বর্ষন।
আনন্দে বন্দিছে লক্ষ বিহঙ্গ সঙ্গীতে
পুষ্পিত কাননে।
কমল কেতকী নাচে কি জানি কি ভাবে
স্পন্দিত পবনে।
প্রান্তরের কান্তারের কান্ত বক্ষ কেন
কম্পিত নন্দিত ?
দিগঙ্গনার অঙ্গনে কে অনুরাগ রসে
করিল রঞ্জিত ?
তরঙ্গিনী কলহংস সহ কি বা জানি
তুলিল সঙ্গীত ?
এ আনন্দে মত্ত হতে আমার অন্তরে
কে করে ইঙ্গিত ?

বিশ্বাস।

লেখক—শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ান তত্ত্বনিধি, কাব্যতীর্থ স্বরস্বতী।

আছ কি না নাই, কেন ভাবি ছাই, কিবা লাভ তাহে মোর,
চাই তোমা চাই, এই বেশ, তাই ঝরে মোর আঁখি লোর।
তোমার বিরহ যে ব্যথা প্রদানে পুলক-বেদনা তাত যে !
পরাণের ধন বাহিরিয়া ধরা নাহি দিলে ধরা মাঝে।
কিবা তায় আসে যায়।
আছ কি না নাই কেন ভাবি ছাই কিবা মোর লাভ তায় !
আছ কি না নাই এই কথা নিয়ে কত যে বুদ্ধি আটি

কেহ বলে আছে কেহ বলে নাই কেন বলে শুন খাঁটি—
জ্ঞানের বালাই কত যে বড়াই হাসিয়ে উড়াই তোমা'
বৃথা এ প্রয়াস ওগো লীলাময়! করিও বিমূঢ়ে ক্ষমা।
মোরা আখি-হীন দীন।

নাহি দেখি কিছু নাহি বুঝি কিছু কত ভাবি রাত্তি দিন
ও হাসি নেহারি সারাসর্বরী হাসে শশী তারা রাশি!
উজ্জ্বল তায় অম্বর গায় উঠে ভাস্কর হাসি!
সঙ্গীতে চারু মাতে বিহঙ্গ বিনোদ কুঞ্জ বনে
মুঞ্জরে লতা পুষ্প বিকশে বিহ্বল মত্ত প্রাণে!
সে হাসির স্রোতে ভাসি।

কিবা অনুপমা রাত্তি মুখে চুমা নিতু-দেয় দিবা হাসি!
যুগ যুগ ধরি কিবা মাতোয়ারা ছয় ঋতু বারো মাস
হেসে কুটি কুটি করে লুটাপুটি এ উহার ধরে পাশ;
এই কথা রটি করে ছুটাছুটি চারি দিশি সমীরণ
জলধি তা' বুঝে বুঝি কারে খুজে উচ্ছল অনুক্ষণ!
আরো জানি আরো জানি।

যুগ যুগ ধরি এই ধরা পরে কত ধনী কত মানী
তোমারই ভাবে তোমারই লাগি সকলই তেয়াগিয়া
বন্ধন টুটি চারিদিকে ছুটি পড়িয়াছে বাহিরিয়া
'তুমি নাই' তারা বলে নিক কভু পরিণামে পরিতাপে!
কেন কেন তবে কিবা লাভ বরি' হেন সন্দেহ পাপে!
পড়ুক আখির লোর।

আছ কিনা নাই কেন ভাবি ছাই কিবা তাহে আসে মোর
কত যে প্রেমিক তোমার প্রেমেতে হয়েছে পাগল পারা
কত যে কবি তোমারি মহিমা গাহিয়া হয়েছে সারা
কত যে যতীশ নিবিড় গুহায় ধ্যানেতে আপনাহারা
কত যে ভক্ত কত দিন ধরে ফেলিছে আখির ধারা!
আমি কেন ভাবি আর।

বিপুল বিরহ জাগুক পরাণে ঝরুক নয়নাসার।

নিলাম্বরের কথা।

বহুরূপ তারা।

(লেখক—শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র এম, বি, এ, এ,)

বক রাশির SS তারাটী ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সাত বার স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হইয়াছিল। বিভিন্ন দেশের এগার জন তারা পর্য্যবেক্ষক সারা বৎসরে ১০৬০ বার উহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাঁহাদের নাম ও পর্য্য-বেক্ষণের সংখ্যা প্রদত্ত হইল—

পর্য্যবেক্ষক।	সংখ্যা।	পর্য্যবেক্ষক।	সংখ্যা।
মিঃ এফ বাটারওয়ার্থ	১৭৭	মিঃ জি পি হ্যালোজ	৭২
,, আর জি চন্দ্র	১৫৭	,, এফ সারজেণ্ট	৫২
প্রঃ এ এ নিজল্যাণ্ড	১৪৩	,, ডব্লিউ ষ্ট্র্যাচান	৩৮
মিঃ ওয়াটার ফিল্ড	১৩২	,, এফ ডি রয়	৩০
,, ডব্লিউ এম লিন্ডলে	১৩১	,, জে বোগন	৯
,, এ এন ব্রাউন	১১৯		

ইহাদের পর্য্যবেক্ষণের ফলে আমরা জানিতে পারি যে ঐ বৎসর তারাটী দ্বাদশ শ্রেণীর তারার উজ্জ্বলতা হইতে অধিক ক্ষীণ জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয় নাই। মধ্য জানুয়ারী হইতে ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্য্যন্ত প্রায় দ্বাদশ শ্রেণীর তারার ন্যায় এবং মার্চ্চ মাসের শেষ হইতে আগষ্ট মাসের মাঝা মাঝি পর্য্যন্ত প্রায় একাদশ শ্রেণীর তারার ন্যায় উজ্জ্বল ছিল। ষষ্ঠ বার স্থূলতম জ্যোতি লাভের পর উহা আবার উহা দ্বাদশ শ্রেণীর তারায় পরিণত হয়। নিম্নে তারাটীর হ্রাস বৃদ্ধির বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

১৯২৫ খৃঃ অঃ হ্রাস বৃদ্ধির বিবরণ।			স্থূলত্ব।
জানুয়ারী	১	জ্যোতি বৃদ্ধি আরম্ভ	১১'৬৮
,,	৯	স্থূলতম জ্যোতি প্রাপ্তি	৮'৭০
,,	১০	জ্যোতি হ্রাস আরম্ভ	৮'৮০
,,	১৯	ক্ষীণতম জ্যোতি প্রাপ্তি	১১'৮০
জানুয়ারী ২০ হইতে ফেব্রুয়ারী ২৭ পর্য্যন্ত		ক্ষীণ জ্যোতিতে স্থিতি	১১'৮০ হইতে ১২'০০ পর্য্যন্ত

ফেব্রুয়ারী	২৮	জ্যোতি বৃদ্ধি আরম্ভ	১১'৮
মার্চ্চ	৭	স্থূলতম জ্যোতি প্রাপ্তি	৮'৩০
"	১৫	জ্যোতি হ্রাস আরম্ভ	৮'৪০
"	২৬	ক্ষীণতম জ্যোতি প্রাপ্তি	১১'৪০
মার্চ্চ ২৭ হইতে এপ্রিল ১৭ পর্যন্ত		ক্ষীণতম জ্যোতিতে স্থিতি	১১'৪০ হইতে ১১'৫৪ পর্য্যন্ত
এপ্রিল	১৮	জ্যোতি বৃদ্ধি আরম্ভ	১১'৩২
"	২৭	স্থূলতম জ্যোতি প্রাপ্তি	৮'৮০
"	২৮	জ্যোতি হ্রাস আরম্ভ	৮'৮৫
মে	৫	ক্ষীণতম জ্যোতি প্রাপ্তি	১১'৩৫
মে ৬ হইতে মে ২৩ পর্য্যন্ত		ক্ষীণতম জ্যোতিতে স্থিতি	১১'৩৫ হইতে ১১'৫০ পর্য্যন্ত
মে	২৪	জ্যোতি বৃদ্ধি আরম্ভ	১১'৪৫
জুন	২	স্থূলতম জ্যোতি প্রাপ্তি	৮'৫০
জুন	৩	জ্যোতি হ্রাস আরম্ভ	৮'৫৫
জুন	১৫	ক্ষীণতম জ্যোতি প্রাপ্তি	১১'৩৫
জুন ১৬ হইতে জুলাই ৪ পর্য্যন্ত		ক্ষীণতম জ্যোতিতে স্থিতি	১১'৩৫ হইতে ১১'৪০ পর্য্যন্ত
জুলাই	৫	জ্যোতি বৃদ্ধি আরম্ভ	১১'৩৫
জুলাই	১৩	স্থূলতম জ্যোতি প্রাপ্তি	৮'৫০
জুলাই	১৪	জ্যোতি হ্রাস আরম্ভ	৮'৫৫
জুলাই	২৩	ক্ষীণতম জ্যোতি	১১'২৫
জুলাই ২৪ হইতে আগষ্ট ২০ পর্য্যন্ত		ক্ষীণতম জ্যোতিতে স্থিতি	১১'২৫ হইতে ১১'৪৫ পর্য্যন্ত
আগষ্ট	২১	জ্যোতি বৃদ্ধি আরম্ভ	১১'২৫
আগষ্ট	২৯	স্থূলতম জ্যোতি প্রাপ্তি	৮'৫০
সেপ্টেম্বর	৫	জ্যোতি হ্রাস আরম্ভ	৮'৫৫
"	১৪	ক্ষীণতম জ্যোতি প্রাপ্তি	১১'৭৫

সেপ্টেম্বর ১৫ হইতে নভেম্বর ১২ পর্য্যন্ত	ক্ষীণতম জ্যোতিতে স্থিতি	১২'১০
নভেম্বর ১৩	জ্যোতি বৃদ্ধি আরম্ভ	১১'৭৫
" ১৫	স্থূলতম জ্যোতি প্রাপ্তি	৮'৫০
" ২৬	জ্যোতি হ্রাস আরম্ভ	৮'৫৫
" ২৬	ক্ষীণতম জ্যোতি প্রাপ্তি	১১'৭৫
নভেম্বর ২৭ হইতে ডিসেম্বর ৩১ পর্য্যন্ত	ক্ষীণতম জ্যোতিতে স্থিতি	১১'৭৫ হইতে ১২'০০ পর্য্যন্ত

উপরোক্ত বিবরণ হইতে জানা যাইবে যে দ্বিতীয় এব ষষ্ঠ স্থূলতম জ্যোতি কাল এবং সপ্তম বা শেষ স্থূলতম জ্যোতি অল্প কাল স্থায়ী হইয়াছিল অপর গুলি সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে তেমনই। সপ্তম বারে তারাটী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষীণতম জ্যোতি হইতে স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হয় অন্যান্য বার ক্রমশঃ ধীরে ধীরে জ্যোতি বৃদ্ধি পাইয়া স্থূলতম জ্যোতিতে উপনীত হইয়াছিল।

ভারতে আমেরিকার দূরবীন।

হিন্দু পত্রিকার পাঠকগণ অবগত আছেন যে আমাদের তিন ইঞ্চির দূরবীনে ১২'৫ স্থূলত্ব হইতে ক্ষীণ জ্যোতির তারা দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া আমেরিকার জগদ্বিখ্যাত হারভার্ড কলেজ মান মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ অনেক দিন হইতে আমাদের নিকট একটী অপেক্ষাকৃত বড় দূরবীন পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, অবশেষে তাঁহারা নিউইয়র্ক নিবাসী জ্যোতিস্ক তত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত সি ডব্লিউ এলমারের বদান্যতায় আমাদের নিকট একটী ৬½ ইঞ্চির দূরবীন পাঠাইয়া দিয়াছেন, গত ১৫ জুলাই আমরা উহা পাইয়াছি। দূরবীনটী বেশ বড় এবং ভারী, উহার ষ্ট্যাণ্ড না থাকায় হুগলির ধর ব্রাদার্স এণ্ড কোং নিকট ষ্ট্যাণ্ড প্রস্তুত জন্য পাঠান হইয়াছে। ষ্ট্যাণ্ড প্রস্তুত হইয়া আসিলে আমরা উহাকে ব্যবহার করিতে পারিব। এই দূরবীন প্রাপ্তির জন্য হারভার্ড মান মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

ভক্তি-কথা।

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সবাই নিজের ইষ্টই চায়, কিন্তু ইষ্টলাভের পথ জানে না। সাধারণে যাহা ইষ্ট মনে করে, তাহা সংসার বন্ধনের হেতু। স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন, বিভব, মানবকেই এতই মুগ্ধ করিয়া ফেলে যে "এতদেব পরং নাস্তৎ" এই সংসারই শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নহে এবং ইহার পর আর কিছুই নাই, এইরূপ মনে হয়। সুতরাং বাহ্য জগৎ ছাড়া তাহারা অন্তর্জগতের খোঁজ একেবারেই লয় না। বিষয়ই ধ্যান, জ্ঞান, সর্ব্বস্ব, স্বর্গাপবর্গ। এমত শুনা যায় যে, বিনষ্ট অর্থের শোকে বিষয়ী প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এমত স্থলে বুঝিতে হইবে, অর্থই তাহার জীবনতুল্য ছিল। জীবনান্ত সময়েও বিষয় চিন্তা করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করে এবং বাসনাকৃষ্ট হইয়া পুনরায় সংসারে আইসে। প্রয়াণকালে জীবাত্মা মনকে লইয়া দেহান্তর আশ্রয় করে, মনে সব বাসনা সংস্কাররূপে থাকে। সেই বাসনানুরূপ দেহ ধারণ করিয়া প্রাক্তন কর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করিতে থাকে। জাতি, আয়ু, দেহ, চেষ্টা পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মলব্ধ। ইহা স্বীকার না করিলে পিতাপুত্রের সংস্কার, কার্য্য একরূপ হইত এবং অকারণ কার্য্যোৎপত্তি দোষ হইতে পারে। সুতরাং জন্মান্তর অবশ্য স্বীকার্য্য। তরঙ্গশীর্ষোত্থিত কীটবৎ কর্ম্মফলে এই সংসারে যাতায়াত করিতে থাকে। কোন জন্মে যদি সাধুসঙ্গ মিলে তবেই জীবনের স্রোত ফিরিয়া যায়। তখন সে, নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা করে। যে যম ভয়ে জীবমাত্রেই ভীত, যাহার নিষ্ঠুর কর প্রহারে সমৃদ্ধিশালী জনপদ মহাশ্মশানে পরিণত হইতেছে, যাহার দয়া মমতা নাই, কালাকাল বিচার নাই, সে দুরন্তকৃতান্ত ভয় নিবারণের উপায় কে এ পর্য্যন্ত উদ্ভাবন করিয়াছে? সংযোগ জাতবস্তু একদিন বিশ্লিষ্ট হইবেই, তাহা কেহই নিবারণ করিতে পারে না। তবে ভয় নিবারণের উপায় কি? আমরা বিচার করিলে বুঝিতে পারি যে, ভয়, লজ্জা, সঙ্কোচ, এসব মনের অজ্ঞানতা-নিবন্ধন মলিনতা। অজ্ঞান কি? আমি মরিব—এখন বুঝা উচিত, আমি কে? আমি কি এই দেহ না মন, না ইন্দ্রিয়? যখন আমি কে চিনিতে পারা যাইবে, তখন বুঝা যাইবে, সেই আমির মৃত্যু আছে কিনা। যদি জানা যায় আমি যে, তাহার

মৃত্যু, অগ্নি, জল, বায়ু, বজ্রাগ্নি কিছুতেই নাই। তাহা হইলে মৃত্যুর জন্য আর ভয় কি? •ভৌতিক সংযোগ জনিত দেহ অবশ্যই ধ্বংস হইবে। যদি বল, দেহ ধ্বংস হইলে, আমার সে জ্ঞান, সেরূপ স্বজনবান্ধব, কিছুই থাকিবে না। এমত ভীষণ পরিবর্ত্তন যে মৃত্যুতে ঘটে, তাহার জন্য আমি ভীত হইব না কেন? সে ভয় বৃথা, জন্য বস্তুমাত্রেই বিনাশশীল, তাহা দুর্নিবার, উহা স্বভাবের নিয়ম, রোধ করিবে কে? জ্ঞান, বিজ্ঞান, শক্তি, মুক্তি, যত্ন সব সেখানে পরাস্ত হইয়াছে। এই জন্যই ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"তস্মাৎ অপরিহার্য্যার্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি" অতএব, অর্জ্জুন! যাহা অপরিহার্য্য, নিবারণ করা যায় না, তজ্জন্য তুমি শোক করিও না। জাতস্যহি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ, জন্মিলে মরিতে হইবে, মরিলে জনম হবে, ইহাই নিশ্চিত। সুতরাং বুঝা গেল, মৃত্যু ভয় অজ্ঞান হতে জন্মে। আত্মা, অন্নময়, প্রাণময়, জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময় এই পঞ্চ কোষ অর্থাৎ আবরণে আবৃত বিধায়, এই দেহই আত্মা বলিয়া প্রতীতি হয়। এই দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মার এতই ঘনিষ্ঠতা, যে, প্রাণ, মন, বাদ দিয়া আত্মার উপলব্ধি হয় না।

দীর্ঘকাল উপবাসাদি জন্য ইন্দ্রিয় শক্তি বিলোপ হয়, মনের কার্য্য করিবার শক্তি থাকে না, জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। সুতরাং সাধারণে দেহকেই আত্মা বলিয়া জানে। বস্তুতঃ দেহ ব্যতীত আত্মার বিশ্ব ব্যাপিত্ব থাকিলেও অন্যত্র উপলব্ধি হয় না। সুতরাং আত্মার উপলব্ধি করা খুব কঠিন। যাক্, যখন বুঝা যাইবে, বিনশ্বর ও অবিনশ্বর দুটী বস্তু আছে, আমি সেই অবিনশ্বরের অংশ। তখন ভয় একবারে তিরোহিত হইবে। একবারে তখন অভী, ইহাই প্রকৃত ধারণা। পরে, বিচার করিতে হইবে আমার জীবনে এত দুঃখ কষ্ট কোথা হতে আসিতেছে। বিচার করিলে বুঝিবে সমস্ত দুঃখই জড় হইতে আসিতেছে। পরে বুঝিবে, আমি তো জড় নয়, তবে আমার দুঃখ কিসে? এইরূপ জ্ঞানের উদয়েই সুখ, অজ্ঞান তাই দুঃখ। কিন্তু, আসল কথা, মনকে বশীভূত করা। মন যদি বিষয় বিষহ্রদে নিমগ্ন থাকে, তবে কোন দিনই সত্য আবিষ্কৃত হইবে না। এই মনকে বস করিবার জন্য, প্রাণায়াম, আসন, ধ্যান, প্রত্যাহার, সমাধি, নির্জ্জনবাস, এই সব বিধান নির্দ্দিষ্ট আছে। মন, অন্তর্মুখীন হইলে আর ভাবনা নাই। আমরাই নিজেই আমাদের সুখ দুঃখের কারণ, তজ্জন্য ঈশ্বর দায়ী নহেন। সুতরাং ঈশ্বরে পক্ষপাত দোষ দেওয়া ভুল। আমরা নিজেই নিজ ভাগ্য গঠন করিয়াছি। আবার কর্ম্মবলে ভাগ্যফল খণ্ডন করিতেও

পারি। আত্মাই আত্মার উদ্ধার কর্ত্তা এবং অধঃপতনের কারণ। ইহা আমরা জানিয়াও বুঝি না, সুতরাং ঈশ্বরের দোষারোপ করা বৃথা।

যদি আমাদের কোন ক্ষমতাই না থাকে, তবে, ভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণে আত্ম সমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ। ইহাই ভক্তি পথ, ভক্তের সমস্ত ভারই ভগবান বহন করেন। সুতরাং এ পথ শান্তিময়, নির্ভয়, বিঘ্নশূন্য। তাঁহার নিকট প্রতিদান না চাহিয়া তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি স্থাপন করাই সমীচীন। ভক্তের যাহা দরকার তাহা তিনিই ব্যবস্থা করিবেন। তিনি তাহা না করিয়া পারেন না। তিনি জানেন ভক্ত, তদ্‌গত প্রাণ সে নিজে কিছুই করিবে না। ভক্ত নিজ দেহ, মন, প্রাণ, ভাব, সব তাঁহার চরণমূলে স্থাপন করিবে আর কিছুই আবশ্যক নাই। বাহ্য বস্তুর কিছুই আবশ্যক নাই। যাঁহারা কোনরূপ বন্ধনে বদ্ধ নহে, নিস্পৃহ এমত আত্মারাম ঋষিগণও তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি করেন। প্রেমপীযূষ, পানের জন্য দেবগণও সদালোলুপ। ব্রজগোপীরা দয়া না করিলে, সে প্রেমাস্বাদ হওয়া কঠিন। যাঁহারা ব্রজগোপীদিগকে কুলটা বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহারা বুঝুন, তাহাদের পদ ধূলি দেবগণও বাঞ্ছা করিয়াছেন। সুতরাং সে সাধারণ নায়িকার প্রেম নহে। আমরা যদি ভগবানকে জীবনের সর্ব্বস্ব বলিয়া ভাবিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চিতই তিনি আমাদিগকে কোলে টানিয়া লন। তিনি কখনও আমাদের প্রতি বিমুখ নহেন, আমরাই তাঁহার প্রতি বিমুখ। যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া তিনি পতিতোদ্ধারের জন্য ব্রতী আছেন। আমরা তাঁহার বাক্য না শুনিয়া দুঃখ সাগরে ভাসিতেছি। আমাদের কুমতি কখনও সুমতি হলনা, বিষয় বাসনা গেল না, ভগবানের প্রতি মন গেল না, হায়! এদুর্দ্দিন ঘুচিবে কিসে?

কেহ কেহ মনে করেন, ভগবানের যদি দেখা পাই, তবে কাহার কৃপায় সব কামনা পুর্ণ করিয়া লই। তাহা হয় না, কারণ নারদ ভক্তি সূত্রে বলিয়াছেন—"যানকাময়মানা নিরোধরূপাৎ।" সেই ভক্তি কাময় মানা প্রার্থনীয় নহে। অর্থাৎ ভক্তি দ্বারা কোন কামনা পুর্ণ হয় না। যেহেতু উহা কামনা রোধ করে। যিনি, ধন, মান, যশের জন্য সেবার্চ্চনাদি করেন, তিনি ব্যবসায়ী বণিকতুল্য। তাহাতে ভক্তি লেশ মাত্রও নাই। ভক্তকে মুক্তি পর্য্যন্ত দিতে চাহিলেও সে লইতে চাহে না।

অহৈতুক্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।
সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।

দীয় মান ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎ সেবনং বিনা।

স এব ভক্তি যোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ। ভা, ৩,২৯,১৩,

ভগবান কপিল বলিলেন মাতঃ! আমার প্রতি যাহাদের অনিমিত্ত, এবং অব্যবহিত ভক্তি জন্মে, আমার সেবা বিনা তাহাদের অন্য কামনা দূরে থাক, সালোক্যাদি মুক্তি প্রদান করিলেও তাহা তাহারা গ্রহণ করে না। ভক্তিকে নিরোধ স্বরূপ বলা হইল কেন? ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি একবারে অন্তর্ম্মুখী হইয়া যায়, সুতরাং বাহ্যিক, লৌকিক, বৈদিক কোন কার্য্যে তাহাদের মনোযোগ থাকে না। ভগবৎ পরায়ণ ব্যক্তি কখনও বিষয় পরায়ণ হইতে পারে না, সুতরাং ভক্তি অন্য বিষয়ে উদাসীনতা আনয়ন করে। মানব যখন অহংকারকে একবারে বিসর্জ্জন দিতে পারে, তখন অন্যান্য ভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারে। আমিত্ব গেলেই বিপদ গেল। তখন একমাত্র তিনিই বিরাজ করেন। আমি মলেই বিপদ ঘুচে, সাধক রামপ্রসাদ এই কথা বলিয়াছেন।

অহংকার বশতই আমরা কার্য্য কর্ম্মে লিপ্ত হই। যতদিন ভগবানে দৃঢ় প্রত্যয়না জন্মায় ততদিন শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয়। ভগবানে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিলে আর শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। তখন কর্ম্ম আপনা হতেই সরিয়া যায়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে শাশুড়ী বৌ'এর সব কার্য্য বন্ধ করিয়া দেন। যাহা কিছু কর্ম্ম, ভগবৎ প্রাপ্তি জন্য, তাহা ঘটিলে, আর কর্ম্ম থাকে না। চারাগাছ ঘিরিয়া রাখিতে হয়, বড় হইলে তাহাতে হাতী বাঁধা যায়। এক ভগবৎ প্রাপ্তি জন্য, জপ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান, যোগ, তপস্যা, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি। তাঁহার দর্শন লাভ হইলেই সব প্রয়োজন নিবৃত্তি হয়। এই জন্যই নারদ, ভক্তিকে নিরোধ স্বরূপ বলিয়াছেন। ভক্তির উদয়ে লৌকিক সমস্ত কার্য্যই পরিত্যক্ত হয়, কেবল ভোজনাদি ব্যাপার জীবন ধারণ পর্য্যন্ত থাকে। উহা বন্ধ নিমিত্তক কার্য্য নহে। ফল কথা ভগবানে ভক্তির উদয় হওয়াই চাই। এই ভক্তি বা অনুরাগ, নানা মুনি নানারূপ বলেন। পরাশর সুত বেদব্যাস বলেন ভগবানের পূজার্চ্চনা দিতে যে, অনুরাগ তাহাই ভক্তি। গার্গ্য মুনি বলেন, তাঁহার কথাতে যে অনুরাগ সেই ভক্তির লক্ষণ। ভক্তগণ গুনানুবাদ শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভাগবত ১ম স্কন্দ"—

ইদং হি পুংসস্তপয়ঃ শ্রুতস্যবা স্বেষ্টস্যসূক্তস্যচ বুদ্ধ দত্তয়োঃ।

অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভি র্নিরূপিতো। যদুত্তম শ্লোক-গুণানুকীর্ত্তনং।

নারদ বলিলেন হে পরাশরনন্দন! কবিগণ দ্বারা ইহ নির্নীত হইয়াছে যে, ভগবানের গুণানুবাদ কীর্ত্তন, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্র, জ্ঞান ও দানের ফলস্বরূপ। অর্থাৎ ঐ সব কর্ম্ম করিলে যে ফল হয়, একমাত্র ভগবানের গুণানুবাদ কীর্ত্তনে সেই ফল হয়। সুতরাং নাম কীর্ত্তনই শক্তিহীন ব্যক্তিদিগের সহজ সাধ্য। এবং ফলাংশে তপস্যাদির তুল্য। অতএব শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া নাম কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। মহর্ষি নারদ, ভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতেতি। এইটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ।

ভগবানে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ, এবং তাঁহার বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতা। পুণ্য, পাপ, সমস্তই ভগবানে সমর্পণ করা একটু মাখামাখি ভাব দেখা শুনা না হইলে ঘটে না। তাঁহার বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতা কি রূপ? যেমন কোন ব্যক্তিকে জলে বলপুর্ব্বক ডুবাইয়া রাখিলে সে যেমন হাঁপাইয়া উঠে। ভগবানের বিস্মরণে প্রাণের তাদৃশ ব্যাকুলতা। এমত ভাব প্রেমোদয় না হইলে ঘটে না। ব্রজগোপী দিগের ঘটিয়াছিল। সেইহেতু তাহারা কুল, মান, লজ্জা, ভয়, সব বিসর্জ্জন দিয়া গৃহ, পতি সব ত্যাগ করিয়া হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া বনে বনে কৃষ্ণান্বেষণে ভ্রমণ করিয়াছিল। সে প্রেমের দৃষ্টান্ত অপর নাই, তাহার মহিমা অনুভব করিতেও সবাই পারে না। শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র তাহারা কতবার দেখিয়াছে, তবু ত ক্ষণেক অদর্শনে তাহাদের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে গোপীদিগের এত প্রেম, ইহা জার বুদ্ধি জনিত নহে। তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াই জানিত। জারের প্রতি প্রেম হয় না, বা তাহার সুখে সুখী এভাব থাকে না। সে স্থলে মাত্র স্বীয় স্বার্থসাধন প্রবৃত্তি থাকে। আপনার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ইচ্ছাকাম। আর কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ইচ্ছা প্রেম। ভগবৎ বিষয়ক ও আত্ম বিষয় সুখ সাধনেচ্ছার এই প্রভেদই। বস্তুত যদি গোপীপ্রেম ব্যভিচার মূলক হইত, তাহা হইলে, জীবন্মুক্ত মহর্ষি শুকদেব কখনই মুমুক্ষু পরীক্ষিৎ রাজাকে শুনাইতেন না। বিশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের রাসলীলার ভাব বুঝিতে পারে না। ভগবল্লীলার অনুকরণও মনুষ্যের অধঃপতনের কারণ। প্রকৃতার্থ না বুঝিতে পারিলেই, মনে সাধারণ নায়ক নায়িকার ভাব আসিয়া পড়ে। যিনি জিতমন্মথ, তাঁহাকে কি মার অভিভূত করিতে পারে? ভগবল্লীলায় কুৎসিত ভাব কল্পনা করাই পাপ। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং একথা যাঁহারা না মানেন, তাঁহারা আপন মনের ভাব লইয়া থাকুন। আজকাল

অনেকে কৃষ্ণকে বাদ দিয়া মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গকে ভজনা করিতে বলেন। কিন্তু তিনি কখনও নিজেকে দাস ভিন্ন প্রভু স্বীকার করেন নাই। তবে অনেক ভক্ত বলেন শ্রীকৃষ্ণই রাধার ভাব কান্তি লইয়া নবদ্বীপধামে শচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ ও শচীনন্দন একই তত্ত্ব হইলেন। সুতরাং বাদ কাহাকেও দেওয়া চলে না। কৃষ্ণবর্ণংত্বিষা কৃষ্ণং ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণই শচীনন্দন, ইহা ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ভজন, সাধন কখনও বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। অবতারতত্ত্ব ভক্ততত্ত্ব পৃথক ভাবে বুঝিতে হইবে। কর্ম্মযোগাদি ক্রিয়াস্বরূপ, আর ভক্তি ফল স্বরূপ। ভগবৎ কৃপা ব্যতীত ভক্তি লাভ হয় না। সুতরাং ভক্তিই ফল স্বরূপ এবং পরম পুরুষার্থ। অনেকে বলেন জ্ঞান হতে ভক্তি হয়, শাণ্ডিল্য ঋষি তাহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে ভগবদ্দেবী ব্যক্তিরও ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার ভক্তি নাই। বিশ্ব কর্ত্তা বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস আছে, কিন্তু ভক্তি কয়জনের হয় ? বিষয় চিন্তায় মানুষকে রজ ও তমোগুণে অভিভূত করে, সত্ত্বগুণের উদয় ব্যতীত ভক্তি জন্মে না। ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে সত্ত্ব গুণের উদয় হয়। নামের এতাদৃশ মহিমা যে রজও তমোগুণকে প্রশমিত করে। শুধু তাহাই নহে চিত্ত নির্ম্মল করে এবং পাপ নাশ করে নামই স্বয়ং ব্রহ্ম, এই কলিযুগে নাম যজ্ঞই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং কলি কলুষ নাশের একমাত্র উপায়। অন্যের নিকট হরির নাম শ্রবণ কীর্ত্তনও ভক্তির লক্ষণ ; ভাগবতকার তাহাই দেখাইতেছেন, ১ম, ৭, ৭,

যস্যাবৈশ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম পুরুষে, ভক্তি রুৎপদ্যতে পুংসঃ লোকমোহ-ভয়াপহা। হে মুনিগণ! যাহারা একবার সেই মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তন করেন সেই পুরুষগণের তৎক্ষণাৎ শোক, মোহ' ভয় বিলাসিনী ভক্তির উদয় হয়। আদি পুরাণেও কথিত আছে, "গীত্বাচ মমনামানি বিচরেন্মম সন্নিধৌ, ইতি ব্রবীমিতে সত্যং ক্রীতোহং তস্য চর্জ্জুন!" হে অর্জ্জুন! আমি তোমায় সত্য বলিতেছি, যে আমার নাম গান করিয়া আমার নিকটে বিচরণ করে, আমি তাহার চিরক্রীত হইয়া থাকি। কিন্তু ভক্তি লাভের উপায়, মহাজনের কৃপা বা ভগবানের কৃপাবিন্দু। ভগবানের কৃপাকণা লাভ হইলে, মানুষ ভক্তিমান হইয়া যায়। সাধু সঙ্গের যে কত মহিমা দুই একজন ভুক্তভোগী ব্যতীত সাধারণে তাহা বুঝিতে পারে না।

এমন কি মানুষের কৃপায় মানুষ ভক্তিমান হয় একথা তাঁহারা বিশ্বাসই

করেন না। এ স্থলে আমরা এই মাত্র বলিতে চাই, যে সাধুর কৃপা হ'লে, ভক্তি লাভ হয়, একথা সমুদায় হিন্দু-শাস্ত্র বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এবং চারি যুগ ধরিয়া ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখা হইয়াছে, ইহা অভ্রান্ত সত্য।

গীতায়াঃ শ্লোক পাঠেন গোবিন্দ স্মরণ কীর্ত্তনাৎ। বৈষ্ণবঃ সঙ্গ মাত্রেণ তীর্থ কোটি ফলং লভেৎ। গীতা পাঠ করিলে, ভগবানকে স্মরণ ও কীর্ত্তন করিলে ফল লাভ হয়, কিন্তু সাধু দর্শন মাত্রেই কোটি তীর্থের ফল তৎক্ষণাৎ লাভ হয়। গঙ্গাপাপং শশীতাপং দৈন্যং কল্পতরুর্হরেৎ। পাপং তাপং তথা দৈনং সর্ব্বং সাধু সমাগমঃ। গঙ্গা পাপ হরণ করেন, শশী তাপ হরণ করেন, এবং কল্পতরু দারিদ্র্য হরণ করেন, কিন্তু সাধু সমাগমে পাপ, তাপ, দৈন্য এ সমস্তই বিনষ্ট হয়। মহৎ সঙ্গ দুর্লভ ও অগম্য কিন্তু অমোঘ। অনেক পুণ্য না থাকিলে সাধু চেনা যায় না। নিকটে হয় ত একজন মহাপুরুষ বাস করিতেছেন, কত দেশের লোক এসে তাঁহার সেবা করিতেছে। আর আমি নিকটে থাকিয়াও তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। এক বন্ধুর মুখে তার নিন্দা শুনিয়া সেই নিন্দার ভাবই বাড়িয়া গেল। এইরূপে কত লোক বঞ্চিত হইয়া যায়। কিন্তু সাধু সঙ্গ অমোঘ, সাধু সঙ্গ করিলে, তাহা নিষ্ফল হয় না, নিশ্চিত।

(ক্রমশঃ)

দেবতার বাহনতত্ত্ব।

শঙ্করদাস শঙ্কর সেবক বিরচিত।

লেখক—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সগুণ সত্তায় "ব্রহ্ম", বা ব্রহ্ম-শক্তিরই বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া-শক্তি যাহাকে আমরা দৈবত অর্থাৎ দৈবশক্তি কল্পনায় বহুদেবত্ব, "ব্রহ্মের" বহুদৈবত্যের অধিষ্ঠান কল্পনা করি, তাঁহারা ব্রহ্মের গুণ ও ক্রিয়া সত্তায় ব্রহ্মপ্রকৃতি। ইংরাজীতে কি প্রতিশব্দ দিব, যথাযোগ্য প্রতিশব্দ জানি না, Divine Manifestation অথবা Power Almighty Manifested কি বলিব?

পুরুষ-দেবতারা ব্রহ্মের গুণময়ী পুরুষ-প্রকৃতি; স্ত্রী দেবতারা ব্রহ্মের গুণময়ী মায়া-প্রকৃতি; মায়া প্রকৃতি ব্রহ্মেরই সগুণ মায়ার মায়াত্মিকাপ্রকৃতির বিকাশ; যাহা হইতে এই "ভূমা ব্রহ্মাণ্ড, দৃশ্য মায়া প্রপঞ্চ" সৃষ্টি হইয়াছে। "ভূমানন্দ", ভূতানন্দে ভূতেশরূপে ভূতমায়া প্রপঞ্চ সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মের পরমামায়ার অর্থাৎ মহামায়ার মহাপ্রকৃতিতে কলা ও অংশময়ী প্রকৃতিতে নানাচ্ছন্দে, নানা কলায়, মায়া-প্রপঞ্চে মায়াময়ী এই দৃশ্য প্রপঞ্চ "জগৎ" মায়া চিত্রের ন্যায় দৃশ্য প্রকটন করিয়াছেন। পরমামায়ারই মায়ায় দৃশ্য জগৎ প্রকটিত হইয়া অনন্তের অনন্তত্বে অনন্ত দৃশ্য প্রপঞ্চে পরিণত হইয়া "লীলাময়ী" বহুত্বে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল অভিনব সৃজন করিতেছেন। জগৎপ্রসূতি "অম্বা" জগদম্বিকারই মায়া-প্রকটিত মায়া-চিত্রে "জীব" বিমোহিত হইয়া মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া আছে। মহাকুহকিনী ডাকিনী যোগমাতা যোগমায়ারই মায়া-কুহকে সংসার বিমোহিত। পরম-কারণ পরম ব্রহ্মও এই মায়ালোকে জীব-ভ্রমণে আসিয়া "স্বয়ং"ও মায়াবিমোহিত মায়া-মূঢ়ও হইতে হয়। অন্য পরে কা কথা? স্থূল সূক্ষ্ম কারণ প্রপঞ্চে মায়া স্থূলসূক্ষ্মকারণরূপিণী হইয়া স্বয়ং প্রপঞ্চরূপিণী মায়াপ্রকৃতি হইয়াও পরমা প্রপঞ্চাতীত মায়া, "ব্রহ্মযোনি"। ব্রহ্মপ্রকৃতিতে যুক্ত হইয়া "মিথুনভাবে" পুং স্ত্রী কল্পিত। নচেৎ "এক ও অদ্বিতীয়"। তন্ত্রাদি শাস্ত্রে পুং স্ত্রী (ক্লীবও) কল্পিত হইলেও চরমে "একমেবাদ্বিতীয়ং" বলিয়া প্রকটন করিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র তৃতীয়োল্লাসে ব্রহ্ম স্তুতি দ্রষ্টব্য. "ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়, নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্বকায়। নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥" ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য। "সতে" সৎ সত্তায় সর্ব্বলোকাশ্রয়, চিত্তে বিশ্বরূপাত্মক। চিৎ বা চিত্ত হইতেই এই বিশ্বের রূপ দৃশ্য প্রপঞ্চ সৃষ্ট; নির্গুণ হইয়াও তিনি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত, অদ্বৈত, অদ্বৈত-তত্ত্বে মুক্তি প্রদ। ইহাই উঁহার ভাবে প্রকাশ হইতেছে।

ব্রহ্মপ্রণাম-মন্ত্র "ওঁ নমস্তে পরম ব্রহ্মন্ নমস্তে পরমাত্মনে। নির্গুণায় নমস্তভ্যং সদ্রূপায় নমো নমঃ ॥" "সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" স্থিরীকৃত হইয়া মায়া ব্রহ্মের মূর্ত্তিভেদ কল্পিত হইয়া আদ্যাতত্ত্ব মহাশক্তির পূজা প্রকটিত করিয়া সঙ্গোপাঙ্গ (associated) বহু দৈবী মায়া প্রকৃতির পূজা পূজাক্রম-পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। আবার মানবের নিত্য জীবনের সাংসারিকতার প্রতি কার্য্য ব্যবহারে "তদস্তু তব পূজনম্" অর্থাৎ জীবনটাই জীবনের যাবদীয় কার্য্য, চেষ্টা, অনুষ্ঠান ব্রহ্ম পুরঃসর ও ব্যবহারিক জীবনের আচরণীয় কর্ত্তব্য-ধর্ম্ম উপদেশ বিচারিত হইয়াছে। রাজনীতি,

সমাজনীতি, কোনও নীতিই বাদ যায় নাই। অন্যান্য অনেক তন্ত্র কর্ম্মকাণ্ডাত্মক জ্ঞান কাণ্ড। সাধনা ও প্রক্রিয়া-বাহুল্যতা-যুক্ত।

মহামায়াময়ী মহাপ্রকৃতির প্রধানা অপ্রাধানা কলা ও অংশ-প্রকৃতি সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির গুণময়ী, মায়াময়ী প্রপঞ্চময়ী, প্রপঞ্চাতীত, সকল প্রকার সাধনপ্রকৃতি নানা তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়া আছে। শক্তি ও মায়ার প্রতিচ্ছন্দ (phases) অনুসরণ করিয়া অসংখ্য সাধন-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শুধু পারত্রিক নয়, আধ্যাত্মিক নয় "ইহ" বাদ দিয়া "পর", "পর" বাদ দিয়া "ইহ" নাই। উভয় উভয়ের counter part, ইহপরলোকের সাধনসম্প্রাপ্তির জন্য সাধন-প্রক্রিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে।

ত্রিবর্গ সাধন ফললাভ হয়। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ, "ভূ ভূর্ব স্ব" ত্রি-দিব্য-সাধনার ফল লভ্য হইয়া চরমে পরম মুক্তি "মহানির্ব্বাণ"। চতুর্ব্বর্গ ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষাভিসন্ধির মোক্ষ সাধনাও হয়।

মন্ত্রাদি ও উপাসনা-পদ্ধতি মন্ত্র-সিদ্ধি-যোগ মাত্রেই তন্ত্রোপদিষ্ট পঞ্চোপাসক-মাত্রেরই, যিনি যে মন্ত্রে যে কোন ভূত সিদ্ধি বা ভূত দৈবত প্রকৃতি অথবা মহা সিদ্ধির জন্যই চেষ্টিত হউন। সৌর গাণপত্যাদি সকল পন্থায়, মন্ত্রমাতৃকা তান্ত্রিক "মন্ত্রে"ই দীক্ষা ও সিদ্ধি হয়। সৌর শাক্ত বৈষ্ণবাদি পন্থা "মায়া", সকলই -মায়াময়ীর মায়া-আবরণে পার্থক্য-রূপে স্থূলতঃ প্রতিভাত। মহামায়া মহাশক্তি ব্রহ্মেরই মায়া ও শক্তি চিৎ প্রকৃতি (সদসৎ ও মায়া) ব্রহ্মই শুদ্ধাতি-শুদ্ধতম "সৎ" "চিৎ" "আনন্দ" একত্র সুতরাং "একং" বা "অদ্বৈতং"। ব্রহ্মই ত্রিমূর্ত্তি। খৃষ্টানের ত্রিনীতি trinity "ত্রয়ী" ত্রি-বিদ্যা, স্থূলসূক্ষ্মকারণাত্মিকা মহাবিদ্যা বিদ্যাতীতা "পরমা"। বাহ্য অভ্যন্তর, অন্তর অন্তরতম, নিগূঢ়, গুহ্য, গুহ্যাতীত।

ব্রহ্ম—মায়া কল্পনায় ব্রহ্মকে ধারণা করিবার জন্য মূর্ত্তি-ভেদ ও মূর্ত্তি-প্রকাশ। কল্পনায় ধ্যানে ধ্যানমূর্ত্ত, ভাবে ভাবমাতৃকা ভাবমূর্ত্ত, বাহ্যে বাহ্য মূর্ত্তি চিত্র বা প্রতিমায়।

বেদ জননী "ত্রিমাতৃকার। ত্রি-মূর্ত্তির ধ্যানের প্রতিমা বা চিত্র প্রকটন করিতে হইলে, ছবি বা প্রতিমায় ব্রহ্মের বা ব্রহ্মশক্তিবেদমাতৃকার আসন বা "বাহন" কল্পনা "হংস"মূর্ত্তভাবে প্রকটন করিতে হইলে "হাঁসের ছবি না দিয়া কি দিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের ও বীজের ও বীজ "হঃ সঃ"-রূপী "ব্রহ্মাসন" "ব্রহ্মবাহন" চিত্র প্রকটন করিবে? সৃষ্টিটাও "হঃ সাত্মক" মহা প্রণবের মহা মৈথুনের উপর

অনুক্ষণ অধিষ্ঠিত। হঃ সঃ প্রবাহ নিমেষের তরে বন্ধ হইলে সৃষ্টির সেই খানেই সূর্য্যে চন্দ্রে "হঃ সঃ" মৈথুন হচ্ছে, ব্যোমে, বায়ুতে, অনলে, সলিলে, ক্ষিতিতে সর্ব্বত্রই হঃ সঃ প্রপূরিত।

সামান্য এঞ্জিনটাও 'হঃ সঃ' করিতে করিতে এক টানা গাড়ী লইয়া দৌড়াইয়াছে, "হঃ সঃ" বন্ধ হইলে সেও স্থির। এই "হঃ সঃ" হইতেই শব্দ তরঙ্গের নানা ভঙ্গ-ভঙ্গীতে, ছন্দে যাবতীয় শব্দ শব্দমাতৃকা বর্ণলিপি স্বর, রাগিণী তাল ইত্যাদি যা কিছু সাহিত্য।

এই "হঃ সঃ"কে কোন্ চিত্রকর বা ভাস্কর প্রতিমা গড়িয়া প্রকাশ করিতে পারে? যে মহাবৃষভরূপী সংযত রৌদ্রী প্রকৃতিতে এই মহা ব্রহ্মাণ্ড সংস্থিত, অনন্ত সৃষ্টির বিধাতা, শিবশক্তিরূপিণী যোনিলিঙ্গাত্মিকা ব্রহ্মলিঙ্গ-যোনিতে ব্রহ্মাণ্ড প্রকটিত, ঐ আকাশময়ীলিঙ্গের প্রতিচ্ছায়ায় প্রভাব-প্রতিভায় এই আধাররূপিণী ধরিত্রী বিকসিত। আকাশধরিত্রী ইত্যাদি সকল ভুবনকে যে বাহন-প্রকৃতি ধারণ করিয়া মহাশিব মহাশক্তি মহাকাল মহাকালী মহাকাশ প্রকৃতিকে ধারণা করিয়া আছে, সেই বিশ্ববিদ্যাময়ী ব্রহ্মধীময়ী প্রকৃতি ব্রহ্মযোনিকে ধারণ করিয়া আছেন। সেই মহাবৃষভকে কে চিত্রে প্রকটন করিবেন?

সেই মহাতার্ক্ষ্য যার অনন্ত শক্তিতে অনন্ত ভুবন ব্যাপ্ত—প্রতিপালিত, যে ব্রহ্মময়ীর পালিকা শক্তিকে বহন করিয়া আসন হইয়াছে, সেই মহাগরুড়কে কে প্রকাশ করিবে চিত্রে? দীপ্ততেজঃস্ফুরিত মহানাদযুক্ত মহাগরুড়কে প্রকটন করা মানবের চিত্র পুত্তলিকার সাধ্য?

মানব-চিত্রশিল্পী হাঁস, ষাঁড় পক্ষযুক্ত পক্ষীচঞ্চু মানবমূর্ত্তিতে বাহন প্রকটন করিয়াছেন। বাহ্য পূজন-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাধকের জন্য উহাই যথেষ্ট। মানবেরও "হঃ সঃ" সাধনার জন্য হংস বাহনের "হাঁস" স্পষ্ট মূর্ত্তজ প্রাণীটিই যথেষ্ট। "হাঁসের প্রাণায়ামের (বিস্তার ও ব্যায়াম বা কি শব্দ দিয়া প্রকাশ করিব?) শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি একটু গলা টিপিয়া pulsation feel করিলে শ্বাস-প্রশ্বাসের টান ও ছন্দ অনুভব করিবে।

ইত্যাকারে প্রকৃতির "ইতর" অবস্থার প্রকৃতি-পর্য্যালোচনায় বাহন কল্পিত হইয়াছে। ঈড়াপিঙ্গলায় 'হংসাত্মক' প্রবহন হইতেছে। সুষুম্নায় উক্ত দুই নাড়ীর প্রবহণ যোগ করিয়া চালনা করিলে "স্থূল" হইয়া তমগুণাত্মিকা ব্রহ্ম গ্রন্থি পর্য্যন্ত উঠিয়া রজআত্মিকা বিষ্ণুগ্রন্থিতে বিদ্যুৎপুঞ্জ—সৃষ্টি-তেজোময়ী অগ্নিরূপিণী শক্তি প্রবাহিণী স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতরাদি ক্রমে সোম-স্থানে আজ্ঞাচক্রে

বিদ্যুদ্দামময়ী প্রণবাত্মিকা সোমশুদ্ধ শুভ্র স্নিগ্ধ তেজঃ শিখারূপিণী বৃষভারূঢ়া ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী স্বরস্বতী ব্রহ্মতত্ত্বের দ্বারে ব্রহ্মজ্ঞারূপিণী। উহারও উপরে উপরে ব্রহ্মকলা পরমাত্মজ্ঞানরূপিণী পরমেশ্বরী। বাহন-সঙ্কেতে ব্রহ্মের অনুসরণ করিয়া "জীব—দেহরূপ আত্ম ব্রহ্মাণ্ডে" পরম ব্রহ্মের অনুসন্ধান-তৎপর হইবার উপায় পাইতেছেন নয় কি?

"প্রকৃতি" মায়া প্রকটনে মায়ালীলায় ত্রিগুণেই উনিই ঐ ত্রিবিদ্যারূপিণী মহ-ব্রহ্মবিদ্যা প্রকৃতি বেদময়ী জননী, যোগিণী যোগমায়ারূপিণী অন্টশক্তি-মূর্ত্তিতে মায়া যোগ করিতেছেন। জ্ঞানাত্মিকা প্রকৃতি ক্রিয়াত্মিকা বা ইচ্ছাত্মিকা প্রকৃতিতে ত্রিগুণেই প্রধানারূপে অষ্টশক্তিতে, অষ্টের গুণিত সংখ্যায় অশেষরূপিণী অনন্ত মায়া প্রকটন করিতেছেন। "প্রেতসংস্থা তু চামুণ্ডা বারাহী মহিষাসনা ঐন্দ্রীগজসমারূঢ়া ইত্যাদি" সকলেই প্রকৃতির বাহনে সংস্থিতা ইতরজীবের মূর্ত্তিতে বাহনকল্পিতা। ইতর জীবে প্রকৃতির তমোময়ী তির্যক্‌গতিসঞ্চারী লীলার সমাবেশে, নানা পশু প্রাণী বাহনে প্রকৃতিই প্রাণীজ স্বভাব প্রকৃতি লীলায় বাহনরূপে আসন করিয়া তাহারই উপরে স্বীয়া গুণবিশিষ্টতায় রূপ প্রকটন করিয়া "দৈবী লীলায়—" ধ্যানী সাধকের ভাব বা কল্পনায় ধ্যান মূর্ত্তিতে প্রকট। সাধক আত্মধী-যোগ্যতায় আত্ম গুণ ও কর্ম্ম প্রকৃতিতে ত্রিগুণে যাঁর যেমন সাধ্য শক্তি বা প্রাপ্তি তিনি তেমনই গোচর করিবেন। গূঢ় চারিণী প্রকৃতিকে গুহ্য-তত্ত্বে গুহ্য ও গূঢ় মন্ত্রে যোগ্য কেন্দ্রে গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্ত্রীকে গুহ্যাতিগুহ্য-কেন্দ্রে গোচর করিবেন। "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং", সে তত্ত্ব-পুস্তক বিদ্যায় তন্ত্রকোষে, পুরাণে, বেদে, ব্যাকরণ, স্মৃতি উপনিষদে বা হিমালয়ের গুহ্য গহ্বরে বা তিব্বতের লামাদিগের পুস্তকালয়ে নাই। জ্যোতির্মণ্ডলে, জ্যোতিষ্কে নক্ষত্রে, মহাঅনিল অনল ব্যোম সলিল ক্ষিতি ইত্যাদি চতুর্বিবংশতি তত্ত্বে তত্ত্বশক্তিতে আছে। তীর্থে, নদীতে, সাগরে লুক্কায়িত নাই, ক্ষুদ্র মানব-জ্যোতির্মণ্ডলে নক্ষত্রে মহাভূত মহাপ্রেতপঞ্চকে রেলে বা খ-পোতে যাইবারও উপায় নাই। "খগোলমণ্ডলস্থিত সবিতা হৃন্মণ্ডলে আছেন, সেইখানে ধ্যান করিলে সূর্য্যাসনস্থিত স্বপ্রকাশ স্বতেজ ব্রহ্ম চক্ষু ব্রহ্ম ধী সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব গোচর করিবেন। সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডের অংশে এ দেহ "পুরী" নির্ম্মিত। এ দেহ ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবভাষ লইয়া সৃজিত। এ দেহ ব্রহ্মাণ্ড পুরীতেও অনন্তজগম্মূর্ত্তি শয়ান আছেন। আত্মচৈতন্যে 'স্ব চৈতন্য" উপলব্ধি করিলেই অজ্ঞাত তত্ত্ব জ্ঞাততত্ত্ব হইবে।

সাধনা যস্য সিদ্ধিভবতি তদ্দৃশী। যাঁরা বৈজ্ঞানিক কলাশিল্পে রচনা

করিতেছেন চন্দ্রতন্দ্রাদি যাবতীয় বস্তুবিজ্ঞান মায়া-প্রকৃতির বস্তু-পরিচয়ে-জড়ীয় বস্তুতত্ব বস্তুশক্তি স্থূল সূক্ষ্মাদি ভূত মহাভূত হইতে আন্দাজে ২ কল্পনা করিয়া রচনা করিতেছেন। ইঁহারাও ধ্যানী সাধক কল্পনারায়ণ কল্পশ্রিত (Ideal) কল্প Idea হইতে স্থূলে বাস্তব-রচনা করিতেছেন। ফিজিকস্ হইতে মেটেরিয়াল সায়ান্স সৃষ্টি হইতেছে। কবি-কল্পনা যোগি-কল্পনা শিল্পী ও শ্রমিকের হাতে বাস্তব চিত্রে মায়া-প্রকৃতি-যন্ত্রারূঢ় হইয়া "মায়া-যন্ত্রে" যান্ত্রিক-মায়ার" সৃষ্ট হইতেছে। তত্ত্বদ্ বিশিষ্ট"ধী" মানবেরই গূঢ়-গোচর অন্তর-ধীতেই নিহিত ধীর সূক্ষ্মাবরণ কোষ হইতে নিঃসৃত। আসুরী-মায়া প্রাণের ক্ষুধা তৃষ্ণা আশা বাসনা দৈহিক সুখের চরম সুখ অশান্তি দুরাশা দুষ্টাশা প্রমত্ত অহমিকা প্রপঞ্চে "মায়া" ভূত প্রপঞ্চ হইতে তত্ত্ব ও উপাদান ভূত সাধনায় আত্ম ভূতোন্মেষ-বুদ্ধিতে হইতেছে। জ্ঞান বা অজ্ঞানসারে হউক্ সাধন ক্রিয়া ব্যতীত সাধনা নাই এবং "মন্ত্র-সূত্র" ব্যতীত Problem ব্যতীত Project, Project ব্যতীত Problem Solve হয় না। "সূত্র" থাকিবেই। **Inventory** "ধী" বা বুদ্ধি প্রয়োজনের প্রদাহ এবং চিন্তার তীব্রতা হইতে এবং সত্ব-সংযম অর্থাৎ ঐকান্তিক চেষ্টা ও সংযমন ব্যতীত হয় কি? বৈজ্ঞানিক-ধী সাধকদের চেহারা চাহনীতেও ঐকান্তিক ধ্যান ধারণার অভিব্যক্তি হয় না? কায়-প্রাণ-মন এ তিন একত্র না হ'য়ে সাধনা হয় না।

যাউক্, বাহন তত্ব বলিতেছিলাম; আর্য্যেরা মায়া বিদ্যার আধ্যাত্মিক দিকটা লইয়াছিলেন। প্রপঞ্চ-সাধকেরা প্রপঞ্চ-বিদ্যা লইয়াছিলেন। ভূত-সাধকেরা ঐ প্রপঞ্চেরই স্থূল ভূত শক্তি নিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। ভূত-প্রপঞ্চ-(সূক্ষ্ম, স্থূল) সাধনা লুপ্ত-গুপ্ত হইয়াছে, ভারত হইতে নির্ব্বাসন প্রায়।

পাশ্চাত্য ভূমিতেও মায়াসাধনা প্রপঞ্চসাধনা প্রাচীনকালে ছিল, যান্ত্রিক-সাধনা অতি পুরাকালে ছিল। আসুরী-মায়ার প্রতিক্রিয়ায় মায়াসম্বরণ হইয়াছিল; পুনরুদ্ভব হইয়াছে। মহাকালী মহাকালের কাল সাগরে ডুবাইতেছেন তুলিতেছেন। জড়ীয় বিজ্ঞান এইরূপেই অজ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়া ডুবিতেছে। অনর্থকরী জগৎ-ত্রণগণ জগতের ভার স্বরূপ প্রপীড়ন মূর্ত্তিতে উঠিলেই মায়েশ্বরীর মায়ায় আত্ম-নাশ করিয়া বিদ্যালোপ হইতেছে। আবার সমুদ্রের এক তরঙ্গ উঠিতেছে এক তরঙ্গে নাচিতেছে এক তরঙ্গে ডুবিতেছে। কোথাও বুদ্বুদাকারে কল্পনা সঞ্চরিত হইতেছে। বহু বহু যুগতপস্যায় "জীব" বা "জাতির-জীবনে" একবার মহাকাশরূপে প্রতিভা বিকাশ হয়। জগজ্জন ইতরবাদ আচ্ছন্ন হয়।

বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় সাধনাত্মিকা। অবিদ্যাসাধনারও স্থূল সূক্ষ্মাদিভেদ আছে। Practical, material side আছে, আবার Spiritualism ও ভূত বিদ্যা Elemenal পাঞ্চভৌতিক স্থূল বস্তু প্রপঞ্চের মায়া প্রপঞ্চে যান্ত্রিক মায়া প্রপঞ্চ—এও মায়া-বিদ্যাহি, ফিসিকস্ কেমেষ্ট্রীতে মায়াবিদ্যা—মায়াহি; আবার বিদ্যাভাবে চারু কারু স্থূল সূক্ষ্ম ললিত মনোহর মনোরম বিশ্ব কর্ম্মার বা কলাদেবী, সরস্বতী, বাগীশ্বরী, রাগিনী. কলাদেবতা বা কলাদেবীরূপে বিদ্যার ও অধিদেবতা, অধিষ্ঠান, প্রভৃতি আধার, কোষ ইত্যাদি আছে।

Intellect ধীর অন্তর্গত, Inteligenceও ধী'শ্রেণী, মননবৃত্তিকেন্দ্রে, Instinct স্থূল সংস্কারকেন্দ্রে মনও ইন্দ্রিয়গোচর সংস্কারবৃত্তি ভাব (Thought, বা Thinking চিন্তন ও মনন এক জিনিষ নয় যদিও মনের বৃত্তি) Idea কল্প বা কল্পনা উর্দ্ধে চিন্তন মনন কল্পনা ইত্যাদি মন চিত্ত বুদ্ধি গ্রাহ্য মনঃ-ক্ষেত্রের কার্য্য। কিন্তু ভূতস্থানের উর্দ্ধানিম্নগ-ক্রমে উহার অবস্থান্তরতা হয়। "মন" সকল কেন্দ্রগা ক্রিয়া স্থানে ভাবনা করে, মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলা যায়।

'বিদ্যা,' জন্মান্তর লাভ পূর্ব্ব সংস্কার (Instinct Intellect ইত্যাদি ক্রমে লব্ধ হয়; জোসেফ ইত্যাদি Inventorদের (আবিষ্কারকদিগের নাম মনে নাই) পূর্ব্ব সংস্কার. পূর্ব্বজন্মের অনুশীলন, পূর্ব্ব জন্মের ধ্যান বা ধী (Ginius জিনিয়শ) না থাকিলে, এ জন্মের সাধনায় হইয়াছিল বলিতে পারি না। "খেয়াল" না থাকিলে "খেয়াল" হ'বে কেন? আঠারবছর বয়সের ছেলে শিশু কৌতুহ'লের মধ্যেই কেটলীতে গরম জলের বাষ্পে ঢাকনী নড়িতে দেখিল আর বাষ্পীয় "শক্তি'র খেয়াল মাথায় চড়িয়া বাষ্পীয় শক্তিতত্ত্ব ও যান্ত্রিক উদ্ভাবনা কৌশলের দিকে ঝোঁক চাপিল? ছেলে কেন? কত বৃদ্ধেরও সম্মুখে শক্তির লীলানর্ত্তন কত উপেক্ষিত অবহেলিত হইয়া যাইতেছে, কে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া উদ্ভাবনীশক্তির আশ্রয় নেয়? বড় জোর কেহ কেহ প্রকৃতির খেয়াল বলিয়া প্রকৃতির "রূপজ" মোহে বিমূঢ় হইয়া ভাব বা ভক্তি-গদ্‌গদ বা নির্ব্বাক্ "মূঢ়"-ভক্তিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। উন্মেষশক্তি নাই বলিয়া প্রকৃতির আবরণ উন্মুক্ত করিবার মত ধী-বৃত্তি ক্রিয়াকেন্দ্রে নিয়োগ করে না।

উন্মেষ নিয়োগ ব্যতীত হয় না। deepness না থাকিলে ডুবরী না হ'লে ডুব দিবে ভাবসাগরে dive করিবে কি করিয়া? In-vent তত্ত্ব তল্লাস করিতে হইবে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে। পূর্ব্বানুশীলন পূর্ব্বজন্মাভাষ বা আবৃত্তি বা

বৃত্তি-উন্মেষ হইয়াছিল; প্রকৃতি সাধককে প্রকৃতির বরপুত্রকে প্রকৃতি সামান্য বিষয় দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া attention মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন, প্রকৃতির নীরব ঈশারা সঙ্গেত দ্বারা।

একজন্মের অনুশীলনে একজন্মেই যে শিক্ষা সম্পূর্ণতা বা সম্পত্তি লাভ করিবে এমন কোনও কথা নাই। "অনুরাগ"ই হয় না, অনুরাগ না হইলে আনুরক্তি ত দূরের কথা? admire, admiration না থাকিলে desire হবে কেন? "খেয়াল" সকলের সর্ববিষয়ে থাকে না, সুতরাং সহজে যেতে চায় না, গেলেও প্রাণটা বাধ-বাধ ছাড়-ছাড় ঠেকে।

এই জন্য "বৃত্তির" ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র আধারস্থান আছে। ব্রাহ্মী সরস্বতী বেদমাতা আর বাগীশ্বরী, স্বরাত্মিকা, লিপি-মাতৃকা সর্ব্বাঙ্গে অক্ষরাত্মিকা মূর্ত্তিতে আছেন। শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া এ লিপি দেখা যায় না। অব্যক্ত লিপি। গ্রামোফোনের Recordএ কোনও ভাষা স্পষ্টতঃ লিপিবদ্ধ আছে কি? অথচ কলচালাইয়া দিলে Disc, Roll করিতে আরম্ভ করিলে বায়ু-তরঙ্গ হইতে উদ্ভূত শব্দ ধ্বনিরূপে স্বর বা সঙ্গীত, গ্রাম মূর্চ্ছনা কলাপ (কলা) সহ আবির্ভূত হয়।

স্থূল যান্ত্রিক তত্ত্বের জড়-তত্ত্বসম্বন্ধীয় যে বিজ্ঞান ব্রহ্ম, সৃষ্ট মানব মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মানব আত্মকল্পনায় যে তত্ত্ব ও উপায় লাভ করিয়াছে, ভগবানের সৃষ্ট দেহরূপ গ্রামোফোন যন্ত্রে "মাতৃকা-মূর্ত্তিতে" এইরূপে লিপি-কৌশল, ধ্বনি ও শব্দ তরঙ্গ-কৌশল চক্রে ২ স্ফুরিত হইতেছে। মনোরূপী needle প্রকাশ করিবার জন্য স্পর্শঘাত করিলেই স্বরস্তরে উচ্চারণ হয়। "হরণ" (Horn) এর ন্যায় মুখ ও জিহ্বা-সাহায্যে কণ্ঠ-স্বরস্বতীর কৌশলে (Sound-box) বৈখরী-ধ্বনি উচ্চারিত হয়। লিপি-মাতৃকা, অর্ন্ত-মাতৃকা, নীলসরস্বতী, মহানীলসরস্বতী ইত্যাদি রূপে সরস্বতীরও স্তরভেদ ক্রিয়াভেদ আছে।—"রূপ" বর্ণ গুণ সমাবেশ আছে।

জিহ্বা, কণ্ঠে, বলে, নাভিতে মূর্দ্ধায় ললাটে নানা স্থানে নানা ভাবে আছেন, চিত্তের আবর্ত্তনে চিত্তবৃত্তি, বুদ্ধির আবর্ত্তনে বুদ্ধিবৃত্তি, মনের আবর্ত্তনে মনোবৃত্তি "চক্র" (Reel) রূপে বৃত্তি-চক্র হইয়া স্থানে ২ এবং বিষয়-ব্যাপারে, একে, দুয়ে, তিনে, বহুতে বহু পর্য্যায়ে, সঙ্কর-ভাবে, শুদ্ধ-ভাবে, নানা ভাব, অবস্থা, রূপ, গুণ ক্রিয়া ভাবে আছেন।

কল্পারম্ভণ, বোধন, উদ্বোধন প্রভৃতি Invocation করিবারও প্রয়োজন।

উহাই পূজারম্ভ। প্রকৃতির পূজায় প্রকৃতিকেও কল্পে বোধন করিতে—উদ্বোধন করিতে—চেতন করিতে হয়। জ্ঞানে হউক্ অজ্ঞানে হউক্, পূজা পদ্ধতি ক্রমে হউক্, বিহ্বলে হউক্ সকলেই তাহা করিতেছে। মন্ত্রোপচার, দ্রব্যোপচার নৈবেদ্য সাজাইয়া সকলকেই বসিতে হয়। বৈজ্ঞানিকেরও পূর্ব্বসূত্র মন্ত্র আমন্ত্রণ এবং বিশেষ ২ উদ্দেশ্যগত বিশেষ ২ পূজায় বিশেষ ২ ক্রিয়া দ্রব্য সম্বাহন করিতে হয় ত? তদীয় উপাদানে তদীয় পূজায় আপনার অভীষ্ট সাধনা সকলেই করিতেছে। অথচ "পূজা" যে করিতেছে সে তাহা জানে না, কার পূজা হইতেছে তাও জানে না। সরস্বতী হংসারূঢ়া, পদ্মারূঢ়াও. মনন স্থানের স্থানে স্থানে পদ্ম চন্দ্র কর্ণিকা ইত্যাদি আছে। রূপ-জ্যোতি আছে, স্বরূপ আছে, স্বভাব আছে স্বপ্রকৃতি আছে স্বগুণ আছে স্ব-ক্রিয়া আছে। তমাদি আবরণভেদ ও গুণ-ও আছে। জগৎবাসিগণ এইরূপে পূজা করিয়া বিদ্যালাভ করিতেছে। বৈদিক-তান্ত্রিক-শাস্ত্রোক্ত প্রণালী সকলেই অনুধাবন ও অনুবর্ত্তন করিবে তার মানে নাই।

হিন্দু উপাসকদিগের প্রতিমার পূজাতত্ত্বের বাহন প্রকৃতির সম্যক্ ও সবিশেষ বর্ণনা আমার সাধ্যাতীত, তথাপি দু'চারিটা দৃষ্টান্ত উল্লেখে উপরি উপরি ভাসা ভাসা ভাবে কিছু বলিবার ব্যর্থ-চেষ্টা করিতেছি।

লক্ষ্মী পদ্মাসনা—কমলবাসিনী গুণময়ী প্রকৃতি। মন বা চিত্তের সত্বগুণ স্বভাব, মনে "মতি"। মতির "শ্রী", শ্রীরূপা শুদ্ধ কমলাসীনা ললাটে, রক্তাম্বুজ হৃদয়ে, মতির স্থানে "শ্রী" রক্তে কৃষ্ণ বা নীলযুতা শুভ্রতায় শুদ্ধ যে বর্ণ, হৃদাকাশে ক্ষীরাম্বুধি জলে শয়ান নারায়ণের বক্ষঃস্থিতা শ্রীরূপিণী উচ্চভাবের বৃত্তিসমূহ কোমল কমনীয়ত্বে "কমলা" মনোরম রমনীয়ত্বে "রমা", শ্রী সৃষ্টির ঈশ্বরীভূতি ইত্যাদি এসব মনেরই "শ্রী ও ছাঁদ, ছন্দঃ নহে। আসন "পদ্ম" "পেচক"।

'পেচক' প্রকৃতির গম্ভীরা 'মুখশ্রী'। অনেক সময় উহা সাধারণতঃ গৃহলক্ষ্মী ঘরণী গৃহস্ত্রীতেও দেখা যায় না? মান বা অভিমানের ব্যঞ্জনা মুখভার করিয়া পেঁচামুখী হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চক্ষুগোলক উদ্ভাসিত "মুখশ্রী" পেঁচার শ্রীরূপ ছাঁদ নয়। পেচকের অন্তর্প্রকৃতি আবার তুলনায় নারী প্রকৃতিতে কোথাও হয় ত দেখিয়াছেন। গজলক্ষ্মী-দিগ্‌গজসমূহ বারিধারা বর্ষণ করিয়া সুজলা সুফলা করিতেছেন। অহঙ্কার-মদ-তম-প্রকৃতি শুদ্ধ হইয়া সুবিমল চন্দ্রিমা বিভ্রম কান্তি সুধাধারা শীর্ষদেশ হইতে ঢালিয়া লক্ষ্মী প্রকৃতিকে স্নিগ্ধা মনোহরা শারদ শশীর ন্যায় প্রভান্বিতা—রূপগুণ-বর্ণ-শালিনী লক্ষ্মী প্রকৃতি মহানারীও

হয় ত দেখিয়াছেন। বুদ্ধিশ্রী, জ্ঞান শ্রীতে, নারী শ্রীকে "মহানারী" সৃজন করিয়াছেন। ধরা-দেবী দিগ্‌গজ সমূহের দ্বারা শুদ্ধ সুস্থিতা হইয়া কমলবাসিনী মহালক্ষ্মীরূপিণী শোভা ধারণ করেন। কান্তা কাঞ্চনসন্নিভা বরণীয় সৌরশ্রী ধরিত্রীও যেমন ধারণ করে, ধরিত্রীর প্রতীত মাতৃমূর্ত্তি নারীতেও গুণ রূপ বর্ণ শোভায় সাত্বিকতাপূর্ণ প্রভা দেখা যায়। কিন্তু পেঁচকের পেঁচকবৃত্তি গম্ভীর মুখ প্রকৃতি নয়। অস্ত্রপ্রকৃতি, গুণপ্রকৃতি, রীতিপ্রকৃতি, খাদ্য প্রকৃতি স্বভাব, এরূপে প্রকৃতি ও বহুস্তর ও বহু পর্য্যায়ে বিন্যস্ত। অসৎ প্রকৃতি বাহন বা আসন, তাঁহার উপরে সৎপ্রকৃতি সমাসীন ইহাই তাৎপর্য্য। সাধক আত্ম-প্রকৃতিতে 'অসৎ' হইলেও শান্ত সুসংযতভাবে আপনাকে "বাহন" বা "আসন"রূপে আত্মদান করিয়া আরাধ্য প্রকৃতিকে আত্মপ্রকৃতিতে সমাসীন করিয়া আত্ম-সম্প্রদান করিয়া আত্মোন্নতি করিয়া অভীষ্ট ফল সফল করিবে।

"অগ্নির" বাহন "ছাগ" কামপ্রকৃতি কামপ্রকৃতির ইতর সামান্য তির্য্যক অবস্থা। "অগ্নি" বহুবিধ, প্রাকৃতিক অগ্নি নানাবিধ, সৌরাগ্নি, দিব্যাগ্নি, পাচকাগ্নি, ক্রব্যাদাগ্নি ইত্যাদি অগ্নির কামপ্রকৃতি আছে, যুক্ত-প্রকৃতিও আছে। সাধারণতঃ জীব-দেহে কামাগ্নি-ছাগ প্রকৃতিতে ইতর অবস্থায় থাকে। এই ছাগ প্রাকৃত স্বভাবের "কাম"কে বাহনরূপে আসন কল্পনা করিয়া, ছাগ প্রকৃতির কাম জয় করিয়া, ভৌতাগ্নি জয় করত "পঞ্চ প্রাণকেইন্দ্রীয় অগ্নি জয় করিয়া বিজিত শুদ্ধাগ্নি (যোগাগ্নি দ্বারা জয় ও শুদ্ধতা হয়) ব্রহ্মাগ্নি ব্রহ্মতেজ প্রাপকতা লাভ করে। বাক্‌-সিদ্ধি লাভ করিতে "সত্যাগ্নি" সংযতবাক্‌ ও দৃঢ় নিষ্ঠা সত্যে আত্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।

ছাগ মেষ কামরূপী, মহিষও কাম-ক্রোধরূপী যমের বাহন, কাম ক্রোধ অর্থাৎ সংযমের দ্বারা বিজিত ও বিশুদ্ধ হইলে "যম-দ্বার মহাঘোর নরকভয় নিবারণ হয়। যম জয়ী হয় যমের প্রসাদে। পরোপকার জীবহিতৈষিণী "শিবাগ্নি" স্বয়ং শিবময় মঙ্গলস্বরূপ শুভদ শিবানন্দ পরায়ণ হইয়া শৈবী গতি লাভ করে। তেজও ওজবান্‌ শান্ত-মধুর-সৌম্যপ্রকৃতি ব্যোমাতীত শিরশ্চক্রে "অহং" আত্মা স্থাপিত হইবে। অগ্নি জয় করিয়া "অগ্নি" লভ্য হয়। অবিশুদ্ধ মলিনা অবিদ্যা ক্ষেত্রস্থ অগ্নি জয় করিয়া "বিদ্যাগ্নি" "দিব্যাগ্নি" লাভ করেন এ সবই অগ্নি জয়, কামাগ্নি জয় না হইলে কিছু হয় না? অগ্নির বাহন ইতর প্রকৃতিতেছাগ মেষ কল্পিত।

শীতলার বাহন খর" গর্দ্দভ। "খরত্ব" প্রকৃতি উষ্মাগত প্রখর এক গুণময়

Obstinacy গর্দ্দভের স্বভাব ; Passive resistanceএর চরম, যতই মার পেট নড়িবে না। মন-প্রকৃতির অতি স্থূলভাবে Obtinacy। "বরাহ" গণ্ডার প্রভৃতি এক রোখা বটে With violence Stamped obstinacy নয়। উহার দুগ্ধ প্রকৃতি বসন্তরোগের পথ্য ও ঔষধ।

সাধনার প্রাথমিক স্তর আসন সিদ্ধি, আসন জয়, "কসরৎ নয়", অর্থাৎ কুক্কুটাসন ময়ূরাসন প্রভৃতি সমুদয় যোগাসন "কসরৎ" করিয়া practicod হওয়াই চরম নয়, ও সকল "উপায়" প্রকৃতি জয়ই হচ্চে, আসল আসন জয়। "Evils" জয় করা, আত্মপ্রকৃতিতে "অসৎ" প্রকৃতি বা "অভ্যাসের" উপর পরাক্রমপূর্ব্বক প্রকৃতি জয় করা, আপনি জিতাসন হইলে ধ্যেয় লাভ হয়।

মহিষ-মর্দ্দিনী মহাশক্তি তেজ-বিক্রম-পরাক্রমকেশরী পশুরাজ সিংহাসনে অধিষ্টিতা সর্ব্ব-প্রহরণ-ধারিণী বরাভয়প্রদা "দুর্গা" মহিষঘ্নি মহাশক্তি। ব্যাঘ্রের স্বভাব "হিংসা" ব্যাঘ্র সিংহ পশুরাজ বনের 'শার্দ্দূল'। সকল পশুই সিংহ পরাক্রমের নিকট সন্ত্রস্ত। শক্তি-সাধক আত্মপ্রকৃতিতে হিংসা স্বভাব পরাক্রান্ত করিয়া সিংহ জয় করিয়া সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া কাম ক্রোধাদি রিপু ও রিপু-স্বভাবজনিত অশেষবিধ অশুভ প্রকৃতি (মন্দ স্বভাব) দুষ্টতা ইত্যাদি বন্য ইতর প্রকৃতিকে আত্ম-বিক্রমে পর্য্যুদস্ত করিয়া আপনার দানবত্ব, দানবীয় স্বভাব "অসুরত্ব" পরাক্রান্ত করিয়া মহা-অসুরত্বকে, মহা-সুরত্বে Un Godlyকে "Godly" Un Manlyকে Manly, unholyকে Holy, Demon স্বভাবকে "Devine"এ পরিণত করা। আত্ম-বিজয় করাই আত্ম জিৎ মহা-বিজয় "বিজয়া" প্রকৃত বিজয়। দুর্গমে দুঃখ দুষ্কৃতিহরা দুর্গা লাভ করা দুর্গতি "সুগতি" করা আত্ম-দুর্গের জয় আত্ম-দুর্গে প্রবিষ্ট পরাক্রান্ত শত্রু জয়।

আমরা "দুর্গোৎসব" দুর্গাপূজা করি, কিন্তু সম্বৎসরের সাধনায় যদি বৎসরে একটী একটী করে ক্ষুদ্র ২ স্বভাব বা অভ্যাস প্রকৃতিকে ও কি জয় করি বা করিবার চেষ্টা করি ? বিজয়ার কোলাকুলি, আলিঙ্গন, আশীর্ব্বাদ প্রকৃত ভাবে করি কি ? বৎসরান্তে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে adjustment forgive & forget বলিয়া শুদ্ধ স্নাত বা গ্লানি মুক্ত হই ? কদাচ নয়, আমার শত্রু ও আমায় ত্যাগ করে না আমিও ত্যাগ করি না। রীত্যানুযায়ী "বিজয়া"র নমস্কার আলিঙ্গন করিয়া একাদশীর দিনই যথা নিয়মে পূর্ব্বানুবৃত্তি করি।

গণেশের বাহন "ইন্দুর"। গণেশ "ঘটেশ"। আমরা কলসী (ভাণ্ডে)

গণেশ ঘট স্থাপনা করিয়া পল্লবাদি দিয়া সিন্দুর মাখাইয়া "সিদ্ধি-ঘট" গণেশ-ঘট স্থাপন করি মঙ্গলাভিলাষে। মাটীর ঘটে আমাদের স্থাপিত "গণেশ-ঘটেশ" কত মঙ্গলপ্রদ হইবেন? আমরাও ত ঘট? পঞ্চ-পল্লবিত প্রাণের ক্রিয়া মনের বাসনা কত শাখা প্রশাখায় ধাবিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়াদিতে আসক্ত হইয়া কত সংস্কার আহরণ করিতেছি? আমরাইত "গণ" গণ-নায়করূপে কত সংস্কারগুচ্ছ আহরণ করিতেছি? জন্মজন্মান্তরের বহু বহু সংস্কার এজন্মের কতবিধ কত বহু বহু সংস্কার জ্ঞান-অজ্ঞান-গোচরতা লাভ করিয়াছি। আমরা সংস্কার গুচ্ছ দিয়া "গণ" "গণত্ব" গণেশত্ব পাইয়াছি না কি? গণ-পতি দেবেন্দ্র (মৌলি-মন্দার মকরন্দকণা রুণা) মকরন্দকণা লাভ করিয়া অরুণোদয়ে সূর্য্যের ন্যায় নবভাব-রমণীয় ঊষা-জ্যোতিতে দেবেন্দ্রত্ব-শুধু দেবত্ব নয়— দেবেন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছি কি? গন্ধ-তত্ত্ব smells, scents বলিলে ঠিক বুঝায় না। সেন্স "Senses" Science শব্দও এই Senses এরই "তত্ত্বে" "বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক—আবিক্রিয়া (Sceintific realisation যাহাকে সাধারণতঃ In-vention, ইন্‌ভেন্‌সন বা Dis-Cover-y ডিসকভারী বলি) ক্রিয়াত্মক-ভাবে বুদ্ধিতত্ত্বে Sense বা ইন্দ্রিয় "তত্ত্ব" গ্রহণ, আস্বাদন ও সঞ্চরণ, সংহার উৎপত্তি করে। "সৎ" ও "অসৎ" সবই "গন্ধ-তত্ত্ব" সবই Sense বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যাপার। কর্ম্ম জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন লইয়া একাদশ ইন্দ্রিয়, তথা অধি-দেবতা "ইন্দ্র" "রুদ্র" ইত্যাদি শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু কর্ম্মও জ্ঞানেন্দ্রিয় দশক বাদেও অসংখ্য তত্ত্বেন্দ্রিয় লোমকূপাদি যোনি-রূপে আমাদের দেহে অন্তঃসঞ্চরণ করিতেছে। আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রবৎ, উহা তত্ত্বালোক গোলযোগে আদান-প্রদান করিতেছে। বৈদ্যুতিক তারের ন্যায় লোম Sensa-tional ক্রিয়া করিতেছে। রোমাঞ্চ লোমঞ্চাদি রোমের (লোমের) হর্ষ দ্বেষ ভয়াদি ব্যক্ত করিতেই প্রযুক্ত হয় না। পশুদিগের দেহে যদিও তাহা দৃষ্ট হয়। "ইন্দ্র"কে "ভগচক্ষু" বলা হইয়াছে, আমরাও বাস্তবিক "ইন্দ্র"। "ঘ্রাণ" (ঘ্রাণ) বা গন্ধ-সম্বাহন তত্ত্ব সম্বাহন কার্য্যতা বশতঃ "Sense" বোধ অনুভূতি ইন্দ্রিয় "গন্ধ"। চন্দন কর্পূর কস্তুরী ইত্যাদি। ধূলা প্রভৃতি গন্ধ-তত্ত্ব পার্থিব স্থূল, বায়বীয় যাহা বায়ুযোগে ধূমাত্মিকা গন্ধ সম্বাহন করে, পুষ্পাত্মিকা (আকাশাত্মিকা গন্ধ) এ সকল ও গন্ধ-তত্ত্ব। সাত্বিক রাজসিক তামস "গন্ধ"র ভেদ আছে। দ্রব্যোপচারে "গন্ধ" তত্ত্বের দ্বারা পূজায় সাত্বিক রাজসিক তামসিক ভেদ Organic ক্রিয়া স্থান তত্ত্বগুণ বা জ্ঞান শক্তি উন্মেষ করে।

সত্ত্ব-শুদ্ধির Envigorating Regenrating ক্রিয়ার সাহায্য করে। বিশুদ্ধ গব্যঘৃতের হোম ধূম সৌগন্ধে দেহ অন্তর্বাহ্য পূত সত্ত্বান্বিত হইবার সাহায্য করে। স্বাস্থ্যই সম্পাদন করা প্রাথমিক ফল, দেহ-প্রাণ মন সুস্থ স্ব-স্থ হইলে তবে আধ্যাত্মিকতা গম্য বা লভ্য হয়, ইহাই আমি বুঝি। গন্ধ-তত্ত্বে গণেশগণ গণপতি উপেন্দ্র স্থূল পার্থিবতত্ত্ব হইতে সূক্ষ্মাদি উচ্চতমতত্ত্বে নীত হয়।

এই দেহ-ঘটের আমরা "ঘটেশ" হইয়াও "ঘটেশত্ব গণপতিত্ব লাভ করি নাই, দেবেন্দ্রত্ব ত নয়ই। "ঘেঁটুত্ব" লাভ করিয়াছি। শিব-তনু হইতে জাত শিবাণী প্রকৃতি জাত "গণেশ"। আমরাও ত শিব তনুজ ? হঃ সঃ রূপী শিব-শক্তি শিব-শিবাণী হইতে জন্মিয়াছি। মহাকাশ লিঙ্গ-যোণি শিব যোণি হইতে জাত আকাশ লিঙ্গ, ধরিত্রী যোনিপীঠিকা।

মাতা ধরিত্রী জননী দয়া-ব্রহ্মদয়া-সতী ইত্যাদি "জননীর স্ব-রূপ, জননীই হ'চ্চেন ধাত্রী ধরিত্রী জনবিধায়িত্রী প্রকৃতি, মহাভূত পঞ্চকের স্থূলত্ব ক্ষিতিমূর্ত্তি ধরা দেবীর মানবী প্রকৃতি, সাক্ষাৎ জন্মভূমি হ'চ্চেন জননী, জন্মভূমির 'প্রতীক'। দেশ প্রকৃতি দেশজ জাতি প্রকৃতি স্বভাব ভাষা-ভূষা কলা-শিল্প সৌন্দর্য্য যা কিছু সবই ত জননী হইতে প্রাপ্ত হই ? আমরা শিব-পুত্র নই ? লিঙ্গ মূর্ত্তি জনক শিব প্রতীক।

আমরা দেহঘটে শিবতনু "ঘটেশ"। স্থূল বিশ্বপ্রপঞ্চাত্মক বিশ্ব মূর্ত্তিতে গণেশ জীবপতি জীবেশ। "যতোঽনন্তশক্তেরনন্তাশ্চ জীবা, যতোনির্গুণাদপ্রমেয়া গুণাস্তে যতোভাতি সর্ব্বং ত্রিধা-ভেদ-ভিন্নং সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥ ইত্যাদি গণেশাষ্টক ত্বং গণেশ! আমিই গণেশ! ঘটেশ! বিশ্বরূপ হইতে গণেশেও আপনাতে বিশ্বপ্রপঞ্চে কোনও ভেদ নাই। কিন্তু আমরা হইয়াছি, ঘেঁটু" "ঘেঁটু" পূজার গণেশ ঘট। ঘট মঙ্গল ভাঙ্গিয়াই-ঘট-অমঙ্গল নিবারণের পূজা হয়। ঘণ্টাকর্ণ গণেশ দেবতাকে আরব্ধ Invocation করিয়া 'ঘেঁটু, ঘট ভাঙ্গিলেই কুশল হয়। "ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্ব্বব্যাধি বিনাশন। বিস্ফোটক ভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল॥" সমাজ দেশ জগতের ব্যাধি স্বরূপ, সর্ব্ব ব্যাধি জনক, বিষবিস্ফোটকস্বরূপ মানবঘট ভগবানের ইচ্ছায় আত্ম কলহে আত্ম-ক্ষয় জাতিক্ষয় ধর্ম্মক্ষয় দেশক্ষয় প্রতিষ্ঠাক্ষয় ও দেখিতেছেনই। আমরা একদা কার্ত্তিকেয় মহাবীর দেবসেনাপতির হাতে ক্রীড়নক ভাঁটাও অন্ততঃ ছিলাম। দেব মঙ্গলের জন্যও ব্যবহারে লাগিতাম। শেষে "ঘেঁটু" হইয়া এখন যা দশা

তার পরিচয়ে কাজ কি? ঘরে পরে এখন "ঘেঁটু" ভাঙ্গা হইতেছি। আত্ম কলহে ত ভাঙ্গিয়াছি। সে দিন পাশ্চাত্য "ঘেঁটু"দিগের 'ঘেঁটু' পূজায় ও আমাদের অসংখ্য 'ঘেঁটু' মেস্‌পটেমিয়া ফ্রান্স প্রভৃতির রণ-ক্ষেত্রে ঘেঁটু ভাঙ্গা হইয়া পরের 'ঘেঁটু' পূজায় ব্যবহৃত হইয়াছি।

যতোবহ্নিভানু ভবো ভূর্জ্জলঞ্চ যতঃ সাগবাশ্চন্দ্রমা ব্যোম বায়ুঃ। যতঃ স্থাবরা জঙ্গমা বৃক্ষ সংঘা, যতো দানবা কিন্নরা যক্ষ সংঘা, যতশ্চারণা বারণাঃ শ্বাপদাশ্চ, যত পক্ষিকীটা যতো বীরুধশ্চ, সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥২ শ্লোকো দ্রষ্টব্য—

যতশ্চাবিরাসী সর্বমেতৎ তথাব্জাসনো বিশ্ব নো বিশ্বগোপ্তা। তথেন্দ্রাদয়ো-দেবসংঘা মনুষ্যাঃ সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥২

আমরা বিরাগী জগতের শক্তি ও সংস্কার পূজাত প্রকৃতিতে জন্মলাভ করি নাই? বহ্নিভানু ইত্যাদি ব্যোমাদি সকল তত্ত্ব মূলে সংস্কার লাভ জন্ম নয়? স্থাবর জঙ্গমবৃক্ষ দানবাদি প্রকৃতি শ্বাপদাদি প্রকৃতি সকলের সহিত সংস্কারতঃ associated যোগ নাই কি? এবং নিত্য সম্বন্ধে প্রত্যহ অনুক্ষণ আমাদের অন্নপানীয়রূপেও যাহা উপাদান গ্রহণ করি তাহাও ত ঐ সকলের সংস্কার জাত ভঙ্গুর? এ দেহ প্রাপ্ত ও পুষ্ট হ'চ্চে, পুষ্টি বর্দ্ধন হ'চ্চে, কি না? এখন সৎ বা অসৎ শুভ বা অশুভ কিসের পুষ্টি বর্দ্ধন হ'চ্চে বা হচ্চে তাহা আত্ম-বিচার্য্য। আমরা পুষ্টি বর্দ্ধন গণেশ। গজস্কন্ধ! আমরা 'গজস্কন্ধ' নই কি? 'অহংমদমত্ত বারণ' আমাদের অজ্ঞানমোহ-মদ নয় কি? মোহ মদিরাগন্ধী 'অহং' মদমত্তা হস্তমূর্খ অহংবারণাবতার। পশু প্রকৃতিতে তির্য্যক্‌যোনিগত বারণ প্রাকৃত-বারণ, আমরা জীবাহঙ্কারে প্রমত্ত বারণাবতার মানব। বারণাবতার, বানরাবতার (উৎপেতে Mischievous জীব বানর স্বভাব মানুষ ইত্যাদি এই ত সাধারণতঃ আর কিছু নাই?)

সত্ত্বগুণে অহং মত্ত স্থূল প্রপঞ্চগত জীবাহঙ্কার গজস্কন্ধ গণেশমুণ্ড রাজস-দেহের উপরি মুণ্ডশোভিত। গণেশ বুদ্ধিদাতা জ্ঞান সংস্কারে স্থূল জ্ঞানদাতা সিদ্ধিদাতা বিঘ্নেশ (বিঘ্নদাতাও বিঘ্নত্রাতা) স্থূল সংস্কার Experiences. Instinct, Intellect, Intelegence, ইত্যাদি আমাদের স্থূল জ্ঞান গুণ ও সংস্কার 'গণেশ' হচ্চেন devine Overlord, দেবেন্দ্র।

সুরপতি-সুরেশ-দেবেশ দেবরাজ ইন্দ্র গজস্কন্ধারূঢ় "ঐরাবত বাহন"। ঐরাবতগণ (down) আসন বাহন। উভয়েই ইন্দ্রিয়াধিপতি 'ইন্দ্র'। ইন্দ্রিয়জ্ঞ

সংস্কার স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে ও অধিকার অধিকৃত ভেদে সুরেন্দ্র উপেন্দ্র। দ্বৈত ও অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধী। "উপ" অনাশক্ত উপভোগ সংস্কারণ বোধ-শক্তি Experience বুদ্ধি শক্তিতে বিনিয়োগ করিয়া, হিত অহিত, সৎ অসৎ, শুভ-অশুভ বোধে স্থূলত্বের বোধে স্থূল ভেদ করিয়া গণেশত্ব লাভ করিয়া ইন্দ্রত্বপদে "সূক্ষ্ম"-সঞ্চরণ করিয়া সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় বোধন জ্ঞান) Super consciencionsness লাভ "ইন্দ্রত্ব" পদ প্রাপ্তি।

বিবেচনা-বিচারণা, বিচার-বিচরণা, বুদ্ধি বিচারণা, 'ধী' ধৃতি, ধারণা, ইত্যাদি ক্রমে স্থূলাৎ সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মতর সে গতিতে জ্ঞান অজ্ঞান শুদ্ধ জ্ঞান ইত্যাদি ক্রমে, বিশুদ্ধ অহংতত্ত্বে 'অহংব্রহ্মাস্মি' ব্রহ্ম-বুদ্ধির ভূমিলাভ হয়। আরও উপরে ব্রহ্ম-ধী গায়ত্রী-সাবিত্রী-সরস্বতী· ব্রহ্ম-বিদ্যারূপিণী ব্রহ্মপ্রকৃতি মহাজ্ঞানযুক্তা মহা-ধীঃ। বুদ্ধিরঈশ্বরী দুর্গার পঞ্চ প্রকৃতি। গঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী তুলসী মনসা শীতলা অংশ বা কলা কলাংশ প্রকৃতি (Phases) পুণ্য, পূতঃ, পবিত্রতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি ইত্যাদি সবই প্রকৃতির সমাবেশ ও সকলেরই অধিষ্ঠাত্রী প্রকৃতি।

গণেশের বাহন মূষিক। বাহন-জন্তুরা কাটুর্ কাটুর্ স্বভাব অহেতুক ধ্বংস নষ্ট তণ্ডুল করাই স্বভাব। গণেশ 'একদন্ত'। ইন্দুরের দন্ত ইন্দ্রিয় প্রধান দন্ত কণ্ডুতির জন্য অসীম প্রশংসনীয় অধ্যবসায়ে নিরন্তর কাটুর্ কাটুর্ করিতেছে অধ্যাস বা অধ্যবসায়ে অনিষ্টকর জন্তু বৃত্তিতে অসাধারণ, অতি সামান্য পশু প্রকৃতির পক্ষে অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু বৃথা অধ্যবসায়ে অধ্যাস কেবল অনিষ্ঠ-কারীত্বে দ্রোহাচরণে পর্য্যবসিত। ব্রহ্ম পদারবিন্দের অরুণ মকরন্দকণা আস্বাদনের জন্য একদণ্ড এক এক দন্তে বোধাদি স্থূল ভেদ করিতে করিতে সর্ব্বরসাস্বাদ করিয়া 'একরস আনন্দ ব্রহ্মকে আস্বাদন করিতেছেন। গণেশ জননী পরমা প্রকৃতির ক্রোড় হইতে পরমপিতা পরমেশ্বরের 'শিব'-ক্রোড়ে যাইতেছেন। কলাবতী বিদ্যা শ্রীরূপিণী পরমা কলা তাঁর আশ্রয়-ভাগিনী। কলা বধূ কলা বধূনায়ক 'বিনায়ক', একরুচি একদন্ত লম্বোদর খর্ব্ব স্থূলতনু গজেন্দ্রবদন মূষিকাসন।

আমার সামান্য বুদ্ধিমতে 'বাহনতত্ত্ব' আলোচনা করিয়া কৌতূহল চরিতার্থে নিবেদন করিলাম। অনির্ব্বচনীয় দেবতত্ত্ব ত দূরে থাকুক। বাহনতত্ত্ব প্রকৃত জীবাদি তত্ত্বের প্রকৃতির গুণ পর্য্যায়ে স্ব-রূপতত্ত্ব প্রকৃতির স্ব-রূপতা গুণ পর্য্যায় ভেদ বিভেদ ইত্যাদি আলোচনা নির্ণয় করিতে করিতে বাহ্য জ্ঞান বিচারে স্থূল পরিচয় পর্য্যালোচনায় কত অসংখ্য নশ্বর জীবন অতিবাহিত করিলেও

সম্যক্ ও বিশেষ পরিচয়জ্ঞানে বলা যায় না। বাহ্যতত্ত্বে বাহ্যপ্রকৃতি (অন্তঃপ্রকৃতি ত আরও গুহ্যতত্ত্ব) পর্য্যালোচনা করিতে করিতে প্রয়াস ও অধ্যাস বলে পরমজ্ঞানে যাওয়া যায়। এজন্য বাহনাদিরও পূজা-বিহিত আছে। কেউ অপূজ্য বা তুচ্ছ নয় জ্ঞান-বিকাশের জন্য। অনন্ত-অপ্রমেয় গণেশীবিদ্যা। সনাতন পরমব্রহ্ম ত অপ্রমেয় গণেশই—তাঁরই স্থূল পঞ্চভূতাত্মক প্রকৃতির মহা ভূতাংশ দেবতা 'ভূতেশ' পরমেশ্বরের তনুজ প্রকৃতি। পরমেশ্বর বিশ্বেশ্বরের তনু-মূর্ত্তি এই 'বিশ্ব' মায়াপ্রপঞ্চ। ঈশ্বর তনুবীর Embodiment না হইলে বিশ্ব Embedded কাহাতে? কে বলে তিনি সাকার নন? প্রকৃতি সাকারা নহেন। প্রকৃতিই ত সাকারা অবয়বভূতা নিরাকারা। গণেশাদি তাঁদেরই অভিব্যক্তি ব্যঞ্জনা।

এত বড় একটা শুষ্ক নীরস প্রবন্ধে পাঠকদিগের কাণ ঝালা পালা করিয়া বিরক্ত করিয়া ক্ষান্ত হওয়া অবিধেয়, তজ্জন্য সম্পাদক মহাশয়ের অনুগ্রহ ও অনুমতি প্রার্থনা করিয়া একটু সামান্য রস-সম্মোহন করিয়া বিদায় লইব।

আধুনিক অনেক পরমহংসকে লোক সমাজের বেরসিক লোকে 'পরমবক্' বলিয়া থাকেন। আমি মনে করি উহা বলা পরমভুল। উহারা 'পরমবক' নহেন 'পরম হংসই' যেহেতু ব্রহ্মার বাহন হংসের সহিত সাদৃশ্য আছে। সুতরাং 'বাহনাবতার পরমহংস,' মনুষ্য কলেবরে উঁহারা 'হংস-ধর্ম্মী' এইজন্য পরমহংস বাহনাবতারের 'হংস' বলিলাম। হাঁস প্রকৃতি প্যাঁক প্যাঁক বলিয়া পঙ্কিল ভূপ্রকৃতিকে 'পাঁক' বলিয়া নিরন্তর শব্দ প্রকৃতিতে ঘোষণা করিতেছে। পাঁকে উপরে অগাধ জল, অগাধবাসে ভাসমানসঞ্চরণ করিতে করিতে "ডুব" কাটিয়া মীন সংগ্রহ ও ব্যাপাদন করিতেছে। পাঁকে চঞ্চু প্রহরণ করিয়া শামুক গেঁড়ী গুগ্‌লী ধরিয়া খাইতেছে। পঙ্ক খুঁটিয়া ঘাঁটিয়া পাঁক হাতড়াইয়া নিরন্তর আহারান্বেষণে ব্যস্ত। শুষ্কপঙ্কতটে বসিয়া নিদ্রারসারম্ভন নিদ্রা ও আলস্য এবং রম্ভন তিনক্রিয়া করিতেছে। তথাপি 'ঘৃণা' অভিব্যঞ্জনা ধ্বনি 'প্যাঁক প্যাঁক' হংস-প্রকৃতি স্বভাবধর্ম্মের 'শব্দ-ব্রহ্ম' সর্ব্বদাই নাম 'যপ' করিতেছে।

'পরম-হংসাখ্য' হংসাবতার ও ভাসমান সঞ্চরণ করিতেছেন সংসার সমুদ্রে সংসারী লোকেরা "হাভাত যো ভাত করিয়া কায়ক্লেশে ভাত কাপড়ের সংস্থান করিতেছে; তাঁহারা ত্রি-তাপ পাপময় সংসার অনিত্য বোধে, অনিত্য আহার সংগ্রহের জন্য 'হা ভাত' 'যো ভাত' করিয়া ভাত কাপড়ের সংস্থানের ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া অনায়াস ভাসমান পরিব্রাজন পর্য্যটন বা কুটি—'চক' দালান

নির্ম্মাণ করিয়া অনায়াস লব্ধ কামিনীকাঞ্চন সংস্থান সংগ্রহ বা যদিচ্ছাগত 'তদিচ্ছাক্রমে' আগত বোধে, মায়াময়ী মায়া-প্রকৃতির মায়ালীলা মায়াপ্রপঞ্চ অবধারণ করিয়া মায়ামোহ বিমূঢ় ভাবে মায়াবর্ত্তে পাতিত্য স্বীকার না করিয়া অর্থাৎ 'শিশু' সন্তানাদি পালনের যে দুর্ভাবনা না ভাবিয়া 'মায়িক' উপভোগে দেহ-মাত্র 'আশ্রয়' দিয়া আছেন। দেহের সহিত আত্মার কোনও সম্বন্ধ নাই সুতরাং, 'আত্মজ' প্রতিপালনের ও দায় নাই। হংস ও হংসীর প্রতি 'অণ্ড' প্রতিপালনের ভার দিয়া যথেচ্ছা মুক্ত বিহার করেন।

মায়া সুখে নিদ্রা আলস্য বিশ্রম্ভণ করিতেছেন। ভক্ত, অনুগত, অনুরক্ত, শিষ্য, সজ্জন আসিলেই নিদ্রা আলস্য জড়িত, তন্দ্রোপহত অর্থাৎ তন্দ্রা হইতে ঈষৎ জাগ্রত ভাবে সংসার, অনিত্য, মিথ্যা, মায়া, প্রপঞ্চ, দুঃখ শোকময় পঙ্কিল ইত্যাদি 'তত্ত্বব্রহ্ম' 'শব্দব্রহ্ম' দ্বারা বিঘোষিত করিয়া জগজ্জনকে সদুপদেশ এবং গেঁড়ী গুগ্‌লী মীনাদি মানবের আত্মোদ্ধারের উপায় তথা পরম হংস-বাবাজীর আত্মোপলাভের উপায় সৃজন করিতেছেন! এইরূপে হংস-তত্ত্বে ভাসমান হইয়া 'পরমে ব্রহ্মণিলগ্নাঃ' ব্রহ্ম সমাধিতে জড় পিণ্ডদেহ ক্ষিতি প্রপঞ্চের মায়াগহ্বরে সমাহিত হইতেছেন। ভূতপ্রপঞ্চ দেহ ভূ-গর্ভে প্রোথিত এবং ভূত-মুক্ত বিদেহ মায়া-কুটি চকের মায়া ছাড়িয়া, সিন্দুকের মায়া ছাড়িয়াও চক ও সিন্দুকের আশে পাশে বৈকুণ্ঠ ভ্রমণ করিতেছেন। কোনও কুণ্ঠা নাই গদীর অধিকার লইয়া শিষ্যেরা দ্বন্দ্ব কলহ প্রিভি কাউন্সিল (Privy ?) করুক মায়ামুক্ত মোহান্ত তার জন্য ভূত-প্রপঞ্চে বায়ু ভূতাত্মক শরীরে দেখা দিতে বা ভোগ করিতে বাসনা রাখেন না। অশরীরী আত্মা 'শিষ্য' কল্যানেই নিযুক্ত। ধারণা দিয়াও এ ভূতাত্মক মায়া ছাড়াইয়া লইবার যো নাই। মায়াবাদী সংসারীর মায়া ছাড়িতে গিয়া 'মায়াভিভূত' এমনি পরম মায়া পরম হংস প্রকৃতিতে পরম যুক্ত পরম হংস প্রকৃতি। এঁদের 'পরম-বক' বলিলে 'রস-চ্যুতি' হয় না কি? লোকে মাথা কুটেও এক পয়সা উপার্জ্জন কত্তে হার মেনে যায়, এঁদের প্রতি হঃ সঃ শ্বাসে প্রশ্বাসে টাকা বোঝাই। কামিনী কাঞ্চন বিরহিত কামোপভোগী কামিনী কাঞ্চনের বোঝা নহি, বোঝাই আছে।

উপাসনা

ও

প্রার্থনা।

লেখক—সম্পাদক।

ঈশ্বরের উপাসনা ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা—এই দুইটি সাধারণের পক্ষে স্বতন্ত্র বস্তু। যথার্থ ভক্তের পক্ষে নহে। ঈশ্বরের উপাসনার অর্থ ঈশ্বরের নিকটে যাওয়া। ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনার অর্থ তাঁহার নিকট কিছু প্রার্থনা করা বা যাচ্ঞা করা।

ঈশ্বর ত সর্ব্বত্রই আছেন, তিনি ত সর্ব্বব্যাপী, সমস্ত বিশ্বই ত তাঁহার দ্বারা ব্যাপ্ত, তাঁহার নিকট যাওয়ার অর্থ কি ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে—ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা সকল মানবের একরূপ নহে। মনুষ্যেতর প্রাণীর ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে বলিয়া বোধ হয় না।

সর্ব্ব মানবেরই ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনরূপ না কোনরূপ ধারণা আছে। সেই ধারণা, দেশ-ভেদে, কাল-ভেদে শিক্ষা-ভেদে, জ্ঞান-ভেদে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে।

শিশুর ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই। বয়োবৃদ্ধির সহিত, জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত, বাহিরের উপদেশ-প্রাপ্তির সহিত এবং স্বীয় ২ চিন্তার সাহায্যে ক্রমে মানবের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা হয়। কখনও যুক্তি, কখনও বিশ্বাস, কখনও শাস্ত্র-বাক্য তাহার ধারণা পক্ষে সাহায্য করে।

পৃথিবীতে আমরা রাজা বা সম্রাট্ দেখি। তিনি প্রজাদিগকে অপরাধ করিলে দণ্ড দেন, সাধু কার্য্য করিলে পুরস্কার করেন। দুর্ব্বলকে সবলের অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন। তিনি কোন রাজধানীতে বাস করেন, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী আছে, অনেক কর্ম্মচারী আছে। প্রজার শাসনকার্য্য তাহাদের হস্তে ন্যস্ত করেন, প্রয়োজন স্থলে তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন।

কোন রাজা, সম্রাট্ বা বাদসা যেরূপ ভূমণ্ডলের কোন না কোন স্থানে রাজত্ব করেন, তদ্রূপ এই সমস্ত বিশ্বের একজন অধীশ্বর আছেন যাঁহার শাসনে সমগ্র বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে—মানুষের ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ ধারণা অনেক স্থলে আছে। সেই ধারণার পুষ্টি স্বরূপ তাঁহার অধীনে বহু ছোট বড় দেবতা,

দেবদূত ইত্যাদি কল্পিত হয়। কাহাকে বা সৃষ্টির ভার দেওয়া, কাহাকে পালনের ভার দেওয়া, কাহাকে বা ধ্বংসের ভার দেওয়া হয়। কেহ বা জলের কর্ত্তা, কেহ বা ঝড়ের কর্ত্তা, কেহ বা শস্যের কর্ত্তা, কেহ বা রোগের কর্ত্তা. কেহ বা স্বাস্থ্যের কর্ত্তা ইত্যাদি বহু কর্ত্তার ধারণা হয়।

তাঁহার বাসস্থান নির্নীত হয়, তাহার নাম হয় স্বর্গ। সেখানে কল্পনায় যত উৎকৃষ্ট দ্রব্য হইতে পারে, তাহা স্থাপিত হয়। পার্থিব ভূপতিরা যেরূপ দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে কারাগারে প্রেরণ করেন, বিশ্বাধিপতিও সেইরূপ পাপী-দিগকে নরকে প্রেরণ করেন। কারাগার যেরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর হয়, নরকও তদ্রূপ বিভিন্ন শ্রেণীর। রাজার রাজধানীতে যেরূপ মন্ত্রীদিগের, নাগরিকদিগের পদমর্য্যাদা অনুসারে বাসস্থান বিভিন্ন প্রকারের হয়, স্বর্গেও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কল্পনা হয়। এইরূপ ঈশ্বরকে, কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ প্রভু, কেহ বন্ধু. কেহ গুরু বা আচার্য্য-ভাবে চিন্তা করেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহার যেরূপ ধারণা অর্থাৎ ঈশ্বরে যিনি যেরূপ গুণ আছে মনে করেন, যতদুর পারা যায়, সেই গুণ নিজে অধিকার করিবার চেষ্টাই ঈশ্বরের সন্নিধানে যাওয়া বা তাঁহার উপাসনা।

কেহ যদি মনে করেন যে ঈশ্বর সত্য স্বরূপ, তাহা হইলে কায় মন বাক্যে সত্যের সেবাই তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরের উপাসনা।

ভগবদ্গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ঃ—

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্ব শ্রদ্ধা ভবতি ভারত। শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।

সত্ত্ব বলিতে বিশিষ্ট সংস্কার বিশিষ্ট অন্তঃকরণ অর্থাৎ স্বভাব বুঝায়। সকলেরই শ্রদ্ধা তাহাদের স্বভাবের অনুরূপ হয়। পুরুষ মাত্রেই শ্রদ্ধাময়, অর্থাৎ কোন না কোন পদার্থে তাহার শ্রদ্ধা থাকে, যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা সে সেইরূপ হয়।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই কোন না কোন বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক একটি আকর্ষণ থাকে। কাহারও বা শাস্ত্রে, কাহারও বা ধনে, কাহারও বা যশে, কাহারও ভাল দিকে, কাহারও বা মন্দ দিকে। শিক্ষা, দীক্ষা, অভ্যাসাদি দ্বারা এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু যখন অন্তঃকরণে যে সংস্কার বিশিষ্টভাবে থাকে, তাহার দিকেই তাহার গতি দৃষ্ট হয়।

যে মানুষের ধারণা ঈশ্বর দয়াময়, তিনি সর্ব্ব জীবকে অপত্যবৎ স্নেহ করেন, সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের দয়া গুণ অধিকার করিতে ব্যগ্র হন। যে অহিংসা

আচরণ করে, দয়ার প্রতি সে শ্রদ্ধান্বিত হয়। ক্রমে সেই শ্রদ্ধা হইতে সে দয়ালু হয়। এই হইল তাহার উপাসনা। যদি সে ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সে প্রার্থনাও ঐ দয়া অহিংসা-বৃত্তি-ভিক্ষা হইবে। "হে ভগবন, আমি যেন সর্ব্বভূতে তোমার ন্যায় দয়া প্রদর্শন করিতে পারি" এই হইবে তাহার প্রার্থনা বা ভিক্ষা। দয়া ধ্যান দয়া জ্ঞান, জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় দয়াই তাহার একমাত্র উপাস্য হইবে। দয়ার উপাসনা করিতে করিতে, সে ব্যক্তি দয়ালু হইবে। বহু ধ্যান, বহু তপস্যার পর, ভগবান বুদ্ধদেব অহিংসা ধর্ম্ম নিজস্ব করিতে পারিয়া পশ্বাদির প্রাণরক্ষার্থ স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

অন্য দিকে যদি আমার ধারণা হয়, যে পরমেশ্বর বড় মাংস প্রিয়, যদি মাংসপ্রিয় ঈশ্বরই আমার ধারণা অনুসারে আদর্শ ঈশ্বর হয়েন, তাহা হইলে জীবহিংসা আমার নিত্য কার্য্য হয়। যেমন গুরু, তেমন শিষ্য—এই সাধারণ কিম্বদন্তী। ঈশ্বর যদি মাংস আহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমার জীবহিংসা ও মাংসভক্ষণ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

কোন এক বর্ব্বর জাতির ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে তাহাদের আদর্শ ঈশ্বর সারমেয়ের মাংসভোজী, এবং তজ্জন্যই তাহারা সারমেয়ের বলিদান করে, এবং সারমেয়ের মাংস-ভোজনে পরম প্রীতি লাভ করে।

বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে যে, বলি অর্থাৎ ভগবানের উদ্দেশে যাহা উৎসর্গ করিতে হয়, প্রথমে মনুষ্যের দেহে প্রবেশ করিয়াছিল, তৎপরে মনুষ্য-দেহ পরিত্যাগ করিয়া অশ্বদেহে প্রবেশ করিয়াছিল, তৎপরে অশ্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া ছাগদেহে প্রবেশ করিয়াছিল, তৎপরে ছাগদেহ পরিত্যাগ করিয়া ফল-শস্যাদির দেহেতে প্রবেশ করিয়াছে। উক্ত আখ্যায়িকার দ্বারা মানবের উপাসনার ক্রমবিকাশ সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে।

অসভ্য মানব নরবলির দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করিত। ধারণা ছিল—নরমাংসে ভগবানের প্রীতি। নরবলি-যুগের পর ক্রমে অশ্বমেধ-যুগ, ছাগমেধ যুগ এবং পরে ফল-শস্য যুগ উপস্থিত হয়। গীতা গ্রন্থে দৃষ্ট হয়ঃ—যে ভগবান বলিতেছেন পত্র পুষ্প, ফল, জল, যে আমাকে শ্রদ্ধা করিয়া যাহা দেয়, আমি তাহা গ্রহণ করি। এস্থলে কোন মাংসের উল্লেখ নাই।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি,
তদ্ অহং ভক্ত্যুপহৃতম্ অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।

পত্র, পুষ্প, ফল, জল শুদ্ধচিত্ত হইয়া যে আমাকে যাহা অর্পণ করে, ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদিত সেই বস্তু আমি গ্রহণ করিয়া থাকি। ৯।২৬

উপাসনা করিতে গেলেই স্বীয় ২ ধারণা অনুসারের উপাস্যের ধ্যান দ্বারা তাহার গুণের অধিকারী হইতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনুষ্যের বিভিন্ন অবস্থানুসারে আদর্শের ইতর বিশেষ অনিবার্য্য। হিন্দুদিগের গায়ত্রী স্মরণ করুন। যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ মহ, জন, তপঃ ও সত্য লোক-ব্যাপী সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অধিকারী, সেই সবিতৃদেবের বরেণ্য তেজ বা মহিমা ধ্যান করি।

এস্থলে কোন প্রার্থনা নাই। আমাকে ধন দেও, পুত্র দেও, ইত্যাদি কোন প্রার্থনা নাই। কেবল ধ্যান। মানবের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে, এবং তৎপ্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাহার নিকট যাওয়া হইতেছে। পশ্বাদিকে ভগবন মানুষের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তি দেন নাই, তাহারা তাঁহার চিন্তা করিতে পারে না। ভগবান্‌কে চিন্তা করায় অধিকার কেবল মানবের। হে ভগবন, তুমি বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়া তোমার মহিমা অনুভব করার শক্তি দিয়াছ, সেই বুদ্ধি বলে আমি, তোমার মহিমা ধ্যান করিতেছি। তোমার শাসনে গ্রহ, তারা নক্ষত্রাদি স্বীয় ২ কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, তোমারই শাসনে সমস্ত বিশ্ব একই নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তোমার মহিমা অসীম, তুমি সর্ব্বব্যাপী, আমি আর কিছু চাই না, আমি তোমার মহিমাধ্যানে তোমার সন্নিধানে গমন করিব।

উপাসনার এই এক আদর্শ। আর এক আদর্শ দেখুন বাইবেলে।

Our father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come; thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts, as we forgive our debtors and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the Kingdom and the power and the glory for ever. Amen. হে স্বর্গবাসী পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র হউক্। তোমার রাজ্য উপস্থিত হইয়াছে। স্বর্গে যেরূপ মর্ত্ত্যেও তদ্রূপ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক্। আমাদিগকে আমাদিগের দৈনিক অন্ন দেও। অমরা যেরূপভাবে আমাদিগের অধমর্ণদিগকে তাহাদিগের ঋণ হইতে মুক্ত করি, তুমিও তদ্রূপ আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিও।

আমাদিগকে লোভের মধ্যে লইও না, পরন্তু অমঙ্গল হইতে পরিত্রাণ কর। কেননা চিরকালের জন্য এ রাজ্য তোমারই, এবং শক্তি ও মহিমা চির-কালই তোমারই। কোরাণের প্রথম সুরাতেও একটি আদর্শ পাওয়া যায়। খোদার প্রশংসা হউক্।

তিনি সমস্ত দুনিয়ার খোদাবন্দ, মেহেরবান্ ও রহীম। তিনি রোজ-কেয়ামতের মালেক। আমরা তোমারই এবাদত করি ও তোমারই সাহায্য চাই। আমাদিগকে সরল পথে চালাও। যাহাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ, তাহাদের পথে, কিন্তু যাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছে, ও যাহারা পথহারা—তাহাদের পথে নহে।

বাইবেলের আদর্শে আমরা পাই যে উপাসক ঈশ্বরকে পিতৃরূপে ভাবনা করিতেছেন। তাঁহাকে স্বর্গনামক স্থানে বসাইয়াছেন। পৃথিবীতে তাঁহার প্রভুত্ব নস্ট হইয়াছে, কিন্তু স্বর্গরাজ্যে এখনও তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য হয়, এই জন্য উপাসক পৃথিবীতেও ভগবানের ইচ্ছানুরূপ কার্য্যের প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহাকে অন্নের কর্ত্তা ধারণা করিয়া তাঁহার নিকট দৈনিক আহার প্রার্থনা করিতেছেন। য়িহুদি জাতির মধ্যে অধমর্ণকে পীড়ন করা অখ্যাতি ছিল। সেইজন্য উপাসক ভগবানের নিকট বলিতেছেন যে আমরা আমাদের অধমর্ণকে যেরূপ ভাবে দয়া করি, তুমিও আমাদের পাপ হইতে তদ্রূপভাবে মুক্ত করিও। আমার কর্ম্মানুসারে আমাকে পুরস্কার তিরস্কার করিও। আমাদিগকে লোভে লইও না। ঈশ্বর মানুষকে যেন লোভে লইয়া যান—সেইজন্য তাঁহার নিকট এই অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হইতেছে।

কোরাণেও একটি আদর্শ আছে। উপাসকের স্বীয় ভাবের উপরই তাহার উপাসনা হয়। ঈশ্বর তত্ত্বতঃ যাহাই হউন না কেন, যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং যাঁহারা তাঁহাকেই জীবনের আদর্শ করিয়া স্বীয় স্বীয় জীবন গঠিত করেন, তাঁহাদিগের পক্ষেই উপাসনা এবং প্রার্থনার কথা আসে। উপাসনা করিতে গেলেই ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি মানসিক ধারণার প্রয়োজন। আমার ধারণা যে প্রকারেরই হউক না কেন, তাঁহার সম্বন্ধে আমার একটি ধারণা চাই। সেই ধারণা মনের জিনিষ। মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি মূর্ত্তি বা ছবি আঁকি! এবং সেই ছবির নিকট আমার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করি। সেই ছবির মত হইবার চেষ্টা করি, আবার তাহারই নিকট আমার সুখদুঃখের কথা জানাই। তাঁহার সহিত একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লই, এবং যতদূর পারি তাঁহার গুণের অধিকারী হইয়া আপনাকে ধন্য করিতে চাই

এই ধারণা চিত্রপটে বা মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেই, উহা পৌত্তলিকতা বা পুতুলপূজায় নাম ধারণ করে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রত্যেক উপাসকই পৌত্তলিক। মনে কর, খৃষ্টান তাঁহার উপাস্যকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, যখনই তাঁহাকে স্বর্গের অধিপতি করিতেছেন, তখনই তিনি তাঁহার একটি চিত্র মনের মধ্যে অঙ্কন করিতেছেন।

মনের যে ভাব বা ধারণা—তাহার বহির্বিকাশ বিভিন্ন প্রকারে করা যায়। বাক্যের দ্বারা উহা প্রকাশ করা যায়। কবি যখন স্বভাবের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেন, তখন তাহার ভিতরের ছবি কথার ছবিতে পরিণত হয়। চিত্রকরও পটে ঐ সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে পারেন। মনের ধারণা শব্দের দ্বারা, চিত্রের দ্বারা বা মূর্ত্তির দ্বারা বর্ণিত হইতে পারে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহাও ঐরূপ বিভিন্নভাবে ব্যাপ্ত হয়। বস্তুত সকল উপাসকই কোন না কোন মূর্ত্তি পূজা করেন। প্রত্যেক উপাসকেরই ঈশ্বর সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা আছে। পুত্রের ঈশ্বর পিতার ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র। জ্ঞানীর ঈশ্বর অজ্ঞানীর ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র। জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে সভ্যতার ভিন্ন স্তর অনুসারে ঈশ্বর সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা হয়।

উপাসক যদি সরল হয়েন, ভগবৎ সান্নিধ্যই যদি তাঁহার অভীপ্সিত হয়, তাহা হইলে তিনি নিম্নস্তর হইতে ক্রমে উচ্চস্তরে উঠিতে পারেন।

মানুষ উপরে উঠিতেছে কি নিম্নে যাইতেছে. সে তাহা বেশ বুঝিতে পারে। সে সাত্ত্বিকতা, রাজসিকতা বা তামসিকতা লাভ করিতেছে, তাহাও বেশ বুঝিতে পারে।

উপাসনার আদর্শ প্রথমে যতই নিম্নে থাকুক না কেন, উহাকে ক্রমে উন্নীত করা যায়।

এই হইল অধিকার-ভেদে উপাসনা। এই হইল অধিকারভেদে শিক্ষা। আমরা বর্ণমালা শিক্ষা না করিয়া ব্যাকরণ পড়িতে পারি না! অধ্যয়ন সম্বন্ধে যেরূপ অধিকার অনুসারে পাঠ্য পুস্তকের তারতম্য হয়, উপাসনায় উপাসকের ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধে তারতম্য হয়।

সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ শিক্ষকের আবশ্যক, উপাসনা সম্বন্ধেও তদ্রূপ গুরুর আবশ্যক।। কাণে ফু দেওয়া কিম্বা কতিপয় মন্ত্র মুখস্থ করান গুরু নয়। যেমন একজন শাস্ত্রবিৎ শাস্ত্র পড়াইতে পারেন, সেইরূপ উপাসনাতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিই উপাসনা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারেন।

উপাসনায় আদর্শের যেরূপ উৎকৃষ্টতা অপকৃষ্টতা আছে, প্রার্থনায়ও তদ্রূপ তারতম্য আছে। রাজায় ২ যুদ্ধ বাধিল—জর্ম্মাণ ইংরাজে লড়াই বাধিল। জর্ম্মাণ-সম্রাট প্রার্থনা করিলেন—হে ঈশ্বর আমাকে যুদ্ধে জয়ী কর। ইংলণ্ডেশ্বর

প্রার্থনা করিলেন হে ঈশ্বর আমাকে জয়ী কর। ঈশ্বর কি করিবেন? কাহাকে জয়ী করিবেন। যার যত ডাক বেশী, বাদ্য বেশী, বলি বেশী, স্তোত্রে শব্দবিন্যাস বেশী, তিনি কি তাহাকে জয়ী করিবেন?

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে ভগবান্ প্রার্থনা মুঞ্জুর করেন—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই প্রার্থনা করা হয়। ডাকাইতেরা ডাকাইতি করার আগে কৃতকার্য্য হইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে।

উপাসনার ন্যায় প্রার্থনার ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। উহাও প্রার্থীর জ্ঞানাদির উপর নির্ভর করে। ক্রমে প্রার্থনা মার্জ্জিত হয়। মার্জ্জিত উপাসনা ও মার্জ্জিত প্রার্থনায় কোন ভেদ নাই। আমি যে বস্তু প্রাপ্ত হইতে চাই, তাহারই জন্য অপরের নিকট প্রার্থনা করি। সাধকের মানসিক উন্নতির সহিত তাহার প্রার্থনার তারতম্য হয়।

এই স্থলে ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদের প্রার্থনার কথা উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ভগবান প্রহ্লাদকে বর দিতে উদ্যত হইলে প্রহ্লাদ কি প্রার্থনা করিয়াছিলেন? তিনি ধন জন ইত্যাদি কিছুই প্রার্থনা করেন নাই। প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে—যে যোনিতেই আমার জন্ম হউক্ না কেন তোমাতে যেন আমার অচ্যুতা ভক্তি থাকে। আর অবিবেকী বিষয়ী লোকের অনিত্য বিষয়ে যেরূপ স্থিরাপ্রীতি তোমাতে আমার যেন সেইরূপ প্রীতি থাকে এবং তোমাকে যেন সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারি, এবং তোমার প্রতি সেই প্রীতি আমার হৃদয় হইতে যেন কখনও অপসৃত না হয়। মূল শ্লোকটী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"নাথ! যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

প্রহ্লাদ পুনর্ব্বার বর প্রার্থনা করিবার জন্য আদিষ্ট হইলে তিনি পিতার অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ভগবান সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া পুনরায় বর গ্রহণ করিতে বলিলে প্রহ্লাদ বলিলেন "তোমাতে যেন আমার অব্যভিচারিণী ভক্তি থাকে। যে ব্যক্তির তোমাতে স্থিরা ভক্তি থাকে, তাহার পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ কামের কি প্রয়োজন? মুক্তিত তাহার করতলগত।"

মূল শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হইল—

কৃতকৃত্যোঽস্মি ভগবন্! বরেণানেন যত্ ত্বয়ি।
ভবিত্রী ত্বৎ প্রসাদেন ভক্তিরব্যভিচারিণী॥
ধর্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্ত জগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥

এই হইল প্রার্থনার শেষ স্তর। এই হইল চরম আদর্শ প্রার্থনা

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩৩শ বর্ষ, ৩৩শ খণ্ড ৩য় সংখ্যা। | আষাঢ়। | ১৩৩৩ সাল। ১৮৪৮ শকাব্দাঃ

শারদা-সমাগমঃ।

(আগমনী)

লেখক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাংখ্যস্মৃতিতীর্থ।

(১)

প্রভাসিচন্দ্রিকাপ্রভাপ্রভাসিতাম্বরাশ্রিতা।
পয়োধরানতাংশকা সুনির্ম্মলত্রবাম্বরা।
ধরাধরপ্রভাধরা প্রফুল্লকাননাঽধুনা
শ্রিয়ং শ্রিতা শিবাগমে সমেত্যহো শরৎসতী॥

(২)

জড়াশয়োঽপি নীরধির্মহাশয়ঃ শিবাশয়া
প্রগাঢ়মাতৃভক্তিতো দ্রবন্নিবাম্বরং মুদা।

সুমন্ত্রনিস্বনচ্ছলাৎ সদাঽধুনা জনান্তরে
শিবাং শিবাসমাগমপ্রবৃত্তিমাদধাতি কিম্ ॥

(৩)

যদীক্ষণপ্রভাবতো জগৎপ্রপঞ্চকং ক্রমাৎ
সমুদ্ভবস্থিতিক্ষয়ং ভজেত মায়য়া সদা।
সমেত্য সাগুণাত্মিকা ত্রিতাপদগ্ধভারতে
শুভং করোতু শঙ্করী ত্রিতাপনাশিনী সতী ॥

(৪)

সদাগমস্তবপ্রিয়ে ! তবাগমে স্তবপ্রিয়ে !
নবীন জীবনোদ্যমো নবীনভাবভাবিতঃ।
নবীনশক্তিরক্তিতস্ত্বদর্চ্চনে সমুৎসুকো
নবত্বমেতি সম্প্রতি ক্ষণে ক্ষণে চ মানবঃ ॥

(৫)

নিদাঘভাস্করানলপ্রতাপিতস্ববিগ্রহা
নভস্যবর্ষণাশ্রুভির্নিমজ্জিতদ্রবাম্বরা।
স্বসাক্ষিভাস্বতান্বিতা সপুষ্পগুঞ্জনস্তবা
তপস্বিনীব শোভতে ধরা নু শারদাগমে ॥

(৬)

শিবাগমে শিবাশয়ঃ শিবাশ্রমং মহাশয়ঃ
সদাহরন্ সদাগতিঃ প্রবাতি রক্তমানসম্।
করং দদে চ সন্ততং জিগীষয়েব ভাস্করো
নহি ত্যজেৎ স্বকৃত্যতাং সুযোগমেত্য সত্তমঃ।

(৭)

সমেতি তর্তৃসঙ্গমং তবার্চ্চনাশয়া শিবে !
তরঙ্গিণী 'কুলু'ধ্বনিঃ সরোজিনী বিকাশিনী।
কুমুদ্বতী চ মুদ্বতী পরস্পরং কিমীর্ষ্যয়া
নহি স্বকৃত্যযোগ্যতাং ভজেদ্ বিনা পতিং সতী ॥

(৮)

উপেত্য ভীমবিগ্রহং নভঃস্বরূপবৈভবং
লসদ্বিভুপ্রভাকরপ্রভাকরৌ সুলোচনে।

প্রসার্য্য বীক্ষতে শিবাং শিবাহি ভারতাগতাং
তদানুগত্যমেতি হি প্রিয়ঃ প্রিয়াবিনোদনে ॥

(৯)

যদীক্ষণাদিব স্বতো গ্রহাউপগ্রহাঃ সমাঃ
সমীয়ুরম্ব ! তেঽর্চ্চনে, হুতাশনো নয়ন্ হুতম্ ।
ত্রিনেত্রনেত্রতাগতো মনোজনাশমাদধে
ভবে হি পূজ্যপূজনৈঃ স্বমিষ্টমাপ্নুয়াজ্জনঃ ॥

(১০)

জড়োঽপি তালপাদপঃ ফলৈর্নমন্নিব স্বতো
হিমাশ্রুধৌতবিগ্রহঃ পথিস্থিতো মুনিব্রতে ।
শিবাগমশ্রমং নুদন্ স্বপত্রকৈঃ সুবীজয়েৎ
স্বকৃত্যবন্দনাব্যতিক্রমো হি নো শুভপ্রদঃ ॥

(১১)

ন তজ্জলং বিরাজতে সরোজরাজিতং ন যৎ
ন যঃ স্বনেৎ কলং ততঃ স ষট্পদো ন বর্ত্ততে ।
ন গুঞ্জিতঞ্চ তাদৃশং ন যন্মনো হরেণ্নৃণাং
ন যো লসেন্নতাদৃশো নরোঽত্র পূজনোৎসবে ॥

(১২)

সমেহি সর্ব্বমঙ্গলে ! শ্রিয়া চ বিদ্যয়া যুতা
শ্রিতা চ বিঘ্নহা-গুহৌ হতামসম্পদা ভুবম্ ।
সমাহতামবিদ্যয়া রিপোর্দমে শমেঽরতাং
মদাসুরান্ বিনাশয় স্বয়ং মহাসুরার্দ্দিনী ॥

(১৩)

ভক্তরক্তচিত্তরাজিহংসরাজরূপিকে ।
কামগর্ব্বখর্ব্বকর্ত্রি ! ভুক্তিমুক্তিদায়িকে ॥
ধর্ম্মকর্ম্মশর্ম্মহীন-ভোগ-রোগ-তাপিতং
রক্ষ ধাত্রি ! দক্ষপুত্রি ! মাতরেহি ভারতম্ ॥

———0———

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী।

লেখক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিসাংখ্যতীর্থ।

(১)

পরমেশ! কি বর্ণিব তব লীলা
কতরূপে কত' ছলে
অবতীর্ণ মহীতলে
হও বিভো! কি বুঝিব সেই খেলা।
করি মায়া ধর কায়া
নাশ কর পাপছায়া
যুগে যুগে হ'য়ে পূর্ণকলা॥

(২)

কৃষ্ণরূপে যেন সাজিয়াছে ধরা
ধরি কৃষ্ণ ভূমীধর
আজি পূর্ণ পয়োধর
সার্দ্রকায়া বামা যেন অশ্রুধরা॥
কৃষ্ণ কানন বসন
কৃষ্ণ কুসুম ভূষণ
কৃষ্ণ পাখীস্বনে কৃষ্ণগানে ভরা॥

(৩)

যামিনী কামিনী আজ কৃষ্ণাম্বরা
কৃষ্ণরূপেতে বিভোরা
হ'য়ে কৃষ্ণপয়োধরা
কৃষ্ণাভিসারিণী যেন সঙ্গিছাড়া।
ভয়ে যেন তারাহার
ত্যজি চন্দ্রালোক আর
কৃষ্ণ ঘন ভাবে কৃষ্ণকলেবরা॥

(৪)

এ হেন তমসাবেশে
সংহারিতে পাপিকংসে
কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হরি।

ধরি পাপে ধরা সতী
সতত তাপিত অতি
তাহে উদ্ধারিতে ত্বরা করি ॥

(৫)

মত্ত যেন প্রভঞ্জন
বিনাশিতে কংসবন
বেগে ধায় কংসত্রাস করি।
সগর্ব্বে গরজে ঘন
যেন কংস-ধ্বংস স্বন,
ধারা বর্ষে যেন লয় করি ॥

(৬)

হেথা শিবা করি' ধ্বনি
যেন কংসধ্বংসবাণী
বেগে যায় যমুনার কূলে।
শিবা যেন শিবা-ছলে
গায় আজ কুতূহলে
ক'ত্তে পার বসুকে সে জলে।

(৭)

বিধির ঘটন যাহা
কা'র শক্তি রোধে তাহা
বিধি হয় অসাধ্যসাধন।
তাই আজ কারাগার
অপ্রতিম প্রভাধার
উজ্জ্বলিত নিশীথে তখন।

(৮)

কোথায় সে ঝড়-বৃষ্টি
রহিছে স্বভাবে সৃষ্টি
যেন শশী তারা সহ হাসে।
মৃদু বহে গন্ধবহ
দেবগণ দেবী সহ
পুষ্প বৃষ্টি ক'রে সেই দেশে ॥

(৯)

হেন কালে গুণধাম
জন্ম লয়েন ঘনশ্যাম
মুক্ত করি সে কারা-অর্গল।
বসু ও দৈবকী দোঁহে
সবিস্ময়ানন্দ দেহে
হেরেন মুক্ত পায়ের শৃঙ্খল॥

(১০)

মায়াবীর খেলা যাহা
মূঢ়ে কি বুঝিবে তাহা
পুত্র-স্নেহে দোঁহে মুগ্ধ হয়।
রক্ষা করেন যিনি জীবে
তাঁকে লয়ে আজি ভাবে
কি ভাবে রক্ষিব এ তনয়॥

(১১)

অন্তর্যামী তাহা জানি
করেন আকাশবাণী
পুলকিত করি দুই জনে।
যে ভাবে ভাবে আমারে
নিস্তারি সে ভাবে তারে
পিতঃ! চিন্তা করোনা এক্ষণে॥

(১২)

বহু তপস্যার ফলে
জন্মি তাই তব কুলে
পুত্ররূপে করিতে উদ্ধার
সদা সজ্জন পালন ।
করি দুর্জ্জন দমন
ধরি তাই যুগ-অবতার॥

(১৩)

নিয়ে চল মোরে তাত

এইক্ষণে ত্বরান্বিত
আকুলে সে নন্দের আলয়।
ভয় নাই দুরাচারে
কংস কিম্বা অনুচরে
সবে মায়ানিদ্রামগ্ন রয়॥

(১৪)

রাখি মোরে পাশে তাঁর
কন্যা জন্মিয়াছে যাঁর
হরি' কন্যা দিবে মাতৃ-করে।
শুনি সে আকাশবাণী
বিস্মিত হ'য়ে অমনি
চলে ত্বরা বসু পুত্র করে॥

(১৫)

ভবের কাণ্ডারী ক্রোড়ে
করিয়া কালিন্দী-তীরে
চিন্তে বসু পারের উপায়।
যমুনা তরঙ্গে ভরা
বায়ু বহে বর্ষে ধারা
আঁধারে ঘিরিল সমুদয়॥

(১৬)

চপলা চমকে যেই
নৌকা বা নাবিক নাই
হেরি বসু চিন্তিত অন্তরে।
মনে করি আছে পারে
নৌকা বা নাবিক দূরে
তাই বসু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥

(১৭)

না পায় কোনো উত্তর
তরী কিম্বা কর্ণধার
হয় ভীত প্রতিধ্বনি শুনে।

পুত্রজন্ম-বার্ত্তা পেয়ে
বুঝি কংস তত্র গিয়ে
না পেয়ে বা আসিছে এখানে ॥

(১৮)

ভাতিল চপলা-প্রভা
নদী পারে যায় শিবা
বসু তারে দেখিবারে পায়।
এ শিবা যে শিবা নয়
মায়ার বিভূতি হয়
না বুঝেও তার পিছু ধায় ॥

(১৯)

কিবা মহিমা অনন্তে
পশ্চাতে ধরে অনন্তে
ফণাছত্র হরি-শিরোপরি।
তা' বসু হেরিতে নারে
চলে দ্রুত পরপারে
শিবা পথ লক্ষ্যমাত্র করি।

(২০)

পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত বরে
দেখা দিতে যমুনারে
হস্তভ্রষ্ট হন কৃষ্ণ জলে।
গেলে হরি যমুনায়
বসু যেন ক্ষিপ্ত প্রায়
'হায়!' বলি হানে কর ভালে ॥

(২১)

ন্যস্ত ত্রস্ত বসু খোঁজে
হাত দিয়া জল মাঝে
পান কৃষ্ণ দৈবের কৃপায়।
প্রাপ্ত যবে কৃষ্ণধন
দেহে আসে যেন প্রাণ
করে নতি হরিকে তথায় ॥

(২২)

এ ভাবে উত্তরি' তীরে
শিবা নাই, বসু হেরে
পূর্ব্বমত যমুনা প্রকাশে।
সবিস্ময়ে তদা যায়
দ্রুতগতি নন্দালয়
গুপ্ত-ভাবে নন্দরাণীপাশে॥

(২৩)

প্রসবি হেথা যশোমতী
কন্যারূপে যেন সতী
সুখে নিদ্রা যান সুস্থকায়ে।
রাখি পুত্র তার সনে
হরি কন্যা সঙ্গোপনে
যান দ্রুত বসু নিজালয়ে॥

(২৪)

দেবকী চিন্তিত হেথা
পতিপানে চেয়ে রতা
আনি' কন্যা বসু দিল তাঁরে।
পেয়ে কন্যা মনোরমা
ত্যজি দুঃখ বসুরমা
দোঁহে থাকে হরি কথা স্মরি॥

(২৫)

প্রাতে শুনি' এ বারতা
প্রসূতা দেবকী তথা
কংস দ্রুত ধায় অসিকরে।
হেরি কন্যা অনুপমা
যেন হরমনোরমা
নির্দ্দয় তাহে যায় বধিবারে॥

(২৬)

কন্যা সে ক্ষণসম্ভবা

কহে কথা অসম্ভবা
রে কংস ! ধ্বংস তোর এবার।
বধিবে তোমাকে যে
গোকুলে জন্মেছে সে
বলি অদৃশ্যা সাক্ষাতে তার ॥

(২৭)

দৈববাণী হ'লে দুষ্ট
চিন্তা করে নিজ ইষ্ট
হরি কৃষ্ণ-বধের উপায়।
ঘটে যা দৈবনির্ব্বন্ধে
বুঝিবে কি তা মোহান্ধে
তাই কংস মগ্ন ঐ চিন্তায় ॥

(২৮)

এদিকে পেয়ে গোবিন্দ
আনন্দে গোকুলে নন্দ
পুত্র-স্নেহে করেন পালন।
যশোদার নীলমণি
খেয়ে সর ক্ষীর ননী
খেলাচ্ছলে কত লীলা করেন ॥

(২৯)

ওহে ভক্ত ! ভক্তি মনে
হেন জন্মাষ্টমী-দিনে
কর জন্মকথামৃত পান।
গাও কৃষ্ণগুণ-গান
কর হৃদে কৃষ্ণধ্যান
কৃষ্ণপ্রেমে কর কৃষ্ণনাম ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী।

লেখক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণসাংখ্যস্মৃতিতীর্থ

(১)

কৃষ্ণস্থূলপয়োধরাম্বরধর ধারাধরা কৃষ্ণভা
প্রেম্নাকৃষ্ণবিলাসিনীব রজনী কৃষ্ণং ভজেৎ সাধুনা ?
দূর্ব্বাশ্যামলশালিকৃষ্ণবসনা কৃষ্ণাম্বুধারাধরা
পৃথ্বী শ্যামপয়োধরাদ্রিগহনা কৃষ্ণেব কিং নোভবেৎ ?

(২)

ধ্বংসন্ কংসবনং প্রমত্তপবনো গর্ব্বেণ কিং বাত্যসৌ ?
ধারা বর্ষতি তদালয়লয়ং কর্ত্তুং সবজ্রস্বনম্ ?
কংসধ্বংসসনিদানদর্শনমনাঃ সংঘোষ্য বর্ষাসমং
স্বস্থানং কিমপেত্য যাতি যমুনাতীরে শিবাহধ্বপ্রদা ?

(৩)

তস্যাং ভাদ্রপদাষ্টমীনিশি দিশি প্রোদ্ভাসিকৃষ্ণচ্ছবি-
জ্যোতিঃ কিঞ্চনবিগ্রহং সমুদিতং স্বাঙ্কে নয়ন্ যত্নতঃ।
স্নেহাশঙ্কিতমানসঃ প্রতিপলং স্মৃত্বা চ কংসংদ্বিষং
রক্ষোপায়মনুস্মৃতঃ সমভবৎ কর্ত্তব্যমূঢ়ো বসুঃ ॥

(৪)

জ্ঞাত্বৈবং ভগবান্ বসুং কথিতবানাকাশবাণ্যা তদা,
'কা চিন্তা ! নয় গোকুলং জনক ! মাং কন্যাঞ্চ
তামাহর।'
শ্রুত্বৈবানকদুন্দুভির্বচইদং ক্রোড়ে সুতং তং বহন্
কংসায়ানভিয়া গৃহান্নিরগমচ্চক্ষুঃ ক্ষিপন্ সর্ব্বতঃ।

(৫)

নির্গত্যৈব পথি স্বদুঃখনিবহং বর্ষোদ্ভবংনাম্বভূদ্
ধৃত্বাবক্ষতলে সুতং মনইবত্রস্তোযযৌ গোকুলম্।
তত্রানন্তফণী ফণাঃ শিরসি তচ্ছত্রং দধৌ পৃষ্ঠতো
নাস্মিন্ কিঞ্চিদনন্তরূপচরিতে চিত্রং ভবে সম্ভবেৎ ॥

(৬)

সম্প্রাপ্তো যমুনাতটং সপরিতো দৃষ্টিং দদৌযত্নতঃ
নো দৃষ্ট্বা পরপারসঙ্গতিবিধিং নৈরাশ্যমাগাদ্‌ভৃশম্‌ ।
বাতোত্তালতরঙ্গসঙ্গতজবা ভীমা নদীয়ং পুরঃ
হা হা ! কিংবিদধেঽত্র কাপিতরণী নাস্তীতি
চিন্তাকুলঃ ॥

(৭)

হংহো ! যস্য করে ভবার্ণবগতির্ভীতঃ স নদ্যাং গতো
সম্ভাব্যং তটনাবিকং পরতটেঽত্যুচ্চৈঃ সমাকারয়ৎ ।
নৈবায়াতি তদুত্তরং ন চ জনঃ শূন্যা চ দিক্‌ কেবলং
বাতাঘাতবশাৎ প্রতিধ্বনিরিয়াৎ কংসাৎ সভীতস্ততঃ ॥

(৮)

কিন্ত্বেকাগ্রমনা য ঈশশরণং গচ্ছেদ্‌ বিপন্মুক্তয়ে
ভক্তারক্তমনা দধৌ গতিবিধিং তন্মুক্তয়ে মাধবঃ ।
তস্মাৎ কাপি শিবার্থমগমৎ পাদেন তর্ত্তুং নদীং
ভীমাং তাং নবনীলনীরদরুচিং যস্যাং বসুর্ব্যাকুলঃ ॥

(৯)

কালিন্দীসলিলে তয়া চ শিবয়া চিত্রন্তু যাতংমুদা
বাতোদ্ধৃততরঙ্গসঙ্গতজবৈর্নো তদ্‌ ববাধে তদা ।
তদ্দৃষ্ট্বানকদুন্দুভির্মুদমগাত্তজ্জানুদঘ্নং পয়ঃ
মন্যে নৈব শিবা পরং শিবদয়া ভার্য্যা নদীয়ং পদা ॥

(১০)

এবং দেবনিদর্শনাদিব শিবা সন্দর্শিতং বিক্রমং
সংশ্রিত্য প্রয়তঃ পরং রবিসুতাতীরং নিশীথে বসোঃ ।
হস্তাৎ সম্পতচ্ছিশুস্তদুদকে শ্রীদেবকীনন্দনঃ
কালিন্দীহৃদয়ে মুদং জনয়িতুং পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাশ্রিতঃ ॥

(১১)

হা হা ! মে কিমভূৎ কথং হৃতসুতঃ স্বামিত্থমুচ্চৈর্লপন্‌
ক্লান্তোভ্রান্তমনাঃ করেণ মৃগয়ন্‌ প্রাপ্তঃ সুতংমায়িনম্‌ ।

স্বস্থস্তীরগতস্তদাস. বিকৃতাং দৃষ্ট্বা তথা সূর্য্যজাং
সন্ধিস্ত্যোত্তরণং সুতাধিগমনং প্রাপৎ পরং বিস্ময়ম্ ॥

(১২)

প্রাপ্তো গোকুলগোকুলেশ্বরপদং সর্ব্বঞ্চ সুপ্তং তদা
দত্ত্বা দৃষ্টিমিতস্ততঃ সুনিভৃতং যাতো যশোদাগৃহম্।
রাত্রাবেব তদা প্রসূয় তনয়াং সুপ্তা যশোদেহ যা
তস্যাঃ ক্রোড়গতং বিধায় তনয়ং তন্নন্দিনীমাদদৌ ॥

(১৩)

কালক্ষেপণমত্র ন কার্য্যমধুনা যায়ামিতি ব্যাকুলঃ
প্রাগাদানকদুন্দুভিঃ স্বনিলয়ং কন্যাং দধানস্তথা।
যা ভীতা খলু দেবকীত্বিহ বসেদ্ দত্তাবধানা বসৌ
তস্যৈ তাং প্রদদে যয়াহি কথিতা কংসস্য নাশশ্রুতিঃ ॥

(১৪)

যাবৎ স শ্রুতবানপ্রসূতনয়া সা দেবকীতি স্বয়ং
তাবদ্‌গর্ভবধায় দুর্ম্মতিরগাৎ কংসঃ স কারাগৃহম্।
তামালোক্য সুতাং পরামিব শিবাং হন্তুং যদোপক্রমে
'হন্তা তে ভুবি গোকুলে তনুমধাৎ' সোক্তেবমন্তর্দ্দধে ॥

(১৫)

তচ্ছ্রুত্বা স্ববিনাশিকৃষ্ণমনসা চিন্তাগ্নিভৃচ্চেতসা
ত্যক্তাহস্মিন্ মৃতিভীতিসম্ভববশাৎ কংসেন সুপ্তির্যদা।
কংসাধারধরাতিভারহরিণা প্রাধিষ্ঠিতং গোকুলং
সান্দ্রানন্দসুধাম্বুধৌ চ ভুবনং মগ্নং ভবেত্তৎক্ষণাৎ ॥

(১৬)

যঃ পূতনামরণলব্ধবিশেষকীর্ত্তিঃ
যদ্দেহশোভনমুপৈতি যশোদয়া চ।
যজ্জন্মলাভজপদং তিথিরেতি সাখ্যং
নাপো যদোরথরঘোস্তনুতাং শিবং সঃ ॥

ভক্তি-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লেখক—শ্রীআন্তনাথ কাব্যতীর্থ।

হরেঃস্মৃতিঃ সর্ব্ববিপদ্‌বিনাশিনী। শ্রীহরির স্মরণ মাত্রেই সকল বিপদ্ বিনষ্ট হয় সুতরাং বিপদের ভয় ভক্তের হইতে পারে না। ভগবানের প্রতি যাহারা আত্ম নির্ভর করে, তাহাদের অপর কোন চিন্তাই আবশ্যক করে না। যে নিজশক্তির উপর নির্ভর করে, যে নিজশক্তিবলে সমস্ত উপায় অপায় সাধন ও নিরোধ করিবে, আর যে ভগবানে আত্মসমর্পণ করে, সে ভগবৎ-কৃপার উপর নির্ভর করিবে। ভগবানের কৃপা সহজে মানব বুঝিতে পারে না। তজ্জন্য ভগবানে আত্মনির্ভর করিতে পারে না। একটা নারিকেল বৃক্ষ শৈশবে গৃহস্থদত্ত জলসেকে বর্দ্ধিত হয়, সেই উপকার ঋণ-পরিশোধনার্থ সে সারা জীবন গৃহস্থের তৃপ্তির জন্য মাথায় করিয়া সুপেয় জলযুক্ত নারিকেল-রাশি বহন করে। তাহাতেও ঋণ-শোধ হইল না—মনে করিয়া স্বপত্র শলাকা ঝাঁটারূপে পরিণত করিয়া গৃহস্থের গৃহ প্রাঙ্গণ মার্জ্জনা করে। আর মানব ভগবানের কৃপায় সুন্দর দেহ, শক্তিশালী ইন্দ্রিয়, বিচক্ষণ মন বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার কৃপা-ঋণ-পরিশোধার্থে কোন দিন কোনও চেষ্টা করে না।

ইহার কারণ, ভগবদ্ জ্ঞানের অভাব। অধিকাংশ মানবই নাস্তিক্যমতাবলম্বী দেহাত্মবাদী; ঈশ্বরেও পরলোকে অবিশ্বাসী। স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানবেরা প্রত্যক্ষ জগতের পরপারে আর কিছু আছে, ইহা বিশ্বাস করে না। সুতরাং জন্মান্তর-ভোগ্য স্বর্গাদি তাহারা স্বীকার করে না। তাহাদের এই মত যে, যাবজ্জীবেৎ সুখংজীবেদ্ যত দিন বাঁচিবে সুখে থাকিবার চেষ্টা করিবে। এমতাবলম্বী-দিগকে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করান খুব কঠিন। বৈষ্ণবেরা তর্ক ত্যাগ করিয়া বিশ্বাস অবলম্বন করিতে বলেন। কিন্তু দেহাত্মবাদীরা অন্ধবিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করে না। ভগবান্ স্বয়ং এসে দেখা দিলেও তাহারা সামান্য মনুষ্য-বোধে বিশ্বাস করে না। যদি করিত, তবে ভগবানের যত অবতার হইয়া গিয়াছে, তদানীন্তন লক্ষ লক্ষ লোক মুক্ত হইয়া যাইত। অকাট্যপ্রমাণ যুক্তি দেখাইলেও তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই জন্যই ভগবান্ নিজ মুখে বলিয়াছেন, মনুষ্যাণাং—সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে। সহস্র সহস্র

মনুষ্য মধ্যে কোন এক ব্যক্তি সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ন করে, সুতরাং সম্ভাবনা থাকিলেও সবাই ভগবদ্‌ভক্ত হইতে পারে না।

অন্য বিবিধ গুণালঙ্কৃত হইলেও মানবের ভক্ত হওয়া কঠিন। পূর্ব্ব ২ জন্মে ভগবৎপ্রাপ্তির অনুকূল সাধনা যদি থাকে, তবেই ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া উদ্ধারার্থ নিজ ভক্তকে প্রেরণ করেন। এই জন্য সাধন-ভক্তির অধীন হইয়া চিত্তকে ভগবদুন্মুখ করিতে হইবে। চিত্ত ভগবদুন্মুখ হইয়া তীব্র লালসাসম্পন্ন ও বাসনাশূন্য হইলে, তখন ভগবৎসাক্ষাৎকার-লাভ হয়। বিষয়ীর বাসনা-শূন্য হওয়াও কঠিন, ভগবানে তীব্র লালসাসম্পন্ন হওয়াও সুকঠিন। সুতরাং তাহার জন্মমৃত্যুরূপসংসারনিবৃত্তি হইবে না। তাহারা পরোক্ষ বিষয় চিন্তা করিতেও প্রস্তুত নহে। সাংসারিক জ্ঞানই তাহাদের নিকট পর্য্যাপ্ত। বিষয়েন্দ্রিয়স্পর্শজনিত সুখই তাহাদের নিকট স্বর্গতুল্য। তাহারা শত শত আশাপাশে বদ্ধ হইয়া কেবল সংসারচিন্তাতেই ধ্যাননিমগ্ন থাকে। কেহ কেহ নাম-যশের লোভে ধার্ম্মিক সাজিয়া থাকে। লোকসংগ্রহপ্রতিষ্ঠাই তাহাদের লক্ষ্য। রজ ও তমোগুণ হইতে উহারা কোন মতেই নিষ্কৃতি পায় না। সুতরাং উহারা দেহাত্মবাদী হইয়া দেহাতিরিক্ত আর কিছুই স্বীকার করে না।

যদিও উহারা বহুজন্ম পরে মুক্ত হইতে পারে, কিন্তু অগ্রসর হইবার উপায় উহাদের নাই। কারণ উহারা ভগবদস্তিত্বে অবিশ্বাসী বলিয়া সাধন ভজনের পথের পথিক হয় না। কোন কৃপালু ব্যক্তি দয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেও ঐন্দ্রজালিক বলিয়া তাহাকে উপহাস করে। স্ত্রী, পুত্র, দেহ, গেহ, বিত্ত, বিভব, বসন, ভূষণ, আহার্য্য, কলহ নিদ্রা—এই লইয়াই উহারা জীবন-পাত করে। পরজন্মে অবিশ্বাসী বলিয়া উহারা পাপ, পুণ্য, স্বীকার করে না। সুতরাং যে কোন পাপকার্য্য করিতেও উহারা সঙ্কুচিত বা ভীত হয় না। দানবচরিত্র যাহা কল্পনা করা হয়, ঠিক্ উহারা সেই রূপ প্রকৃতি-সম্পন্ন। উহাদের দীর্ঘজীবন জগতের অমঙ্গলজনক বিধায় ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া জগৎ হইতে উহাদিগকে সরাইয়া দিয়া থাকেন। ভগবানের লীলা ঐ অসুরেরা বুঝিতে পারে না। সুতরাং কয়জন ব্যক্তি ভগবদুন্মুখ হইতে পারে? বেদাদি শাস্ত্রও উহারা ভণ্ড ধূর্ত্তের রচিত বলিয়া অগ্রাহ্য করে। উহারা সততই শিশ্নোদরপরায়ণ ও ইন্দ্রিয়ারাম। দুঃখ-বিমুক্ত সুখ জগতে নাই, ইহাই উহাদের মত।

অসুরেরা কোন স্থানেই ধর্ম্মপথের অনুসরণ করে না, যুদ্ধস্থলেও নহে, সুতরাং দেবতারা অধর্ম্ম যুদ্ধে পরাস্ত হন। অসুরেরা কিছু দিনের জন্য জগতে আইসে, অত্যাচার করে, আবার ভগবত্ করে নিহত হইয়া চলিয়া যায়। দেবতারা অনেক দিন জগতে বিদ্যমান থাকেন। উহাই তাঁহাদের সৎকর্ম্মের পুরস্কার। তবে কি মুক্তিটা দেবতাদেরই একায়ত্ত থাকিবে ? অসুর তাহাতে চিরদিনই বঞ্চিত থাকিবে ? তাহা নহে। জন্মপ্রবাহের বেগে তাহাদের আত্মা বিশুদ্ধ হইয়া আসিলেই তাহারাও মুক্তি পাইবে। সমুদ্রমন্থনকালে যে অসুরেরা অমৃতলাভ করে নাই, দেবতারাই করিয়াছে, তাহারও অর্থ এই যে দেবতারা ভগবৎপরায়ণ বলিয়া অমৃতপানে অমর হইয়াছেন। মানব যখন বুঝিতে পারে, যে, সে ভগবানেরই অংশ-তখন সে অমর হইয়া যায়। সংসার সমুদ্র, তাহাতে দেবাসুরেরা রত্ন খুঁজিতেছে; সুকৃতি—বলে দেবতারা অমৃত, ব্রহ্মলাভ, করে, আর অসুরেরা ঐশ্বর্য্যলাভে পরিতৃপ্ত থাকে।

ভগবান্ যদিও বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট আছেন, সত্য, তথাপি আকাশবৎ নির্লিপ্ত, সুতরাং তাঁহাকে পাইতে হইলেও জগৎ হইতে মন তুলিয়া লইতে হইবে। যদি বল জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরা সংসারে থাকেন। সত্য, লোকশিক্ষার্থ নির্লিপ্ত-ভাবে তাঁহারা জগতে বিচরণ করেন। সংসারীর জগতে নির্লিপ্ত থাকা অসম্ভব। মন সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহাকে একই সময়ে উভয় বস্তুর অভিমুখী রাখা শক্ত। সুতরাং এক হাতে সংসার এক হাতে ভগবান্ রাখা চলে না। একটীকে না ছাড়িলে আর একটীকে পাওয়া যায় না। পক্ষপাতদোষশূন্য ভগবান্ মানবের কর্ম্ম-ফলের নিয়ন্তা মাত্র। জীব কর্ম্ম-ফলাভিমানী, সুতরাং তিনি নিজে নিজের ব্যবস্থাপক হইতে পারেন না। ইহাই শাস্ত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মা বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু দেহাত্মবাদীরা বলেন, আমি করিতেছি, আমি খাইতেছি—ইত্যাদি জ্ঞান দেহেরই হইতেছে, সুতরাং দেহাতিরিক্ত চৈতন্য মানি না।

আস্তিক বলেন, তোমার মত ভ্রমাত্মক, জড় ও চেতন দুটী স্বতন্ত্র পদার্থ আছে। তোমার দেহেন্দ্রিয়াদি জড় প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন, সুতরাং চেতন স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহা বিশেষ ভাবে সপ্রমাণ হইয়াছে। সুতরাং তোমার দেহাত্মবাদ আর চলিবে না। ইহাতেও নিস্তার নাই। সেই চেতন যে নিত্য এবং তাহার যে জন্মান্তর সম্ভব, ইহা অচ্ছেদ্য যুক্তি সহ প্রমাণ করিতে হইবে। আত্মাই যে ভগবানের অংশ ইহাও সপ্রমাণ করিতে হইবে। তার পরে ভগবানে ভক্তির কথা। কর্ম্মফলের উপর যখন ভগবানের কোনও ক্ষমতা নাই, তখন

উপাসনার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে—উপ—নিকটে, আসন—উপবেশন, ইহাই উপাসনার অর্থ। ভগবানের নিকটস্থ হইলে, সূর্য্যোদয়ে সমুদয় অন্ধকার যেমন বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ভগবদ্ দর্শন মাত্রেই যাহা ভোগ করা যাইতেছে, সেই কর্ম্ম ভিন্ন সমস্ত কর্ম্মক্ষয় অর্থাৎ ফলদানের বীজ নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং কর্ম্মক্ষয় হইলেই জন্মমৃত্যুপ্রবাহরূপ সংসার নিবৃত্তি হয়। অতএব উপাসনার প্রয়োজনীয়তা আছে। ভগবৎ সাক্ষাৎকার কি সম্ভব? সম্ভব। ঋষিগণ সমাধিলব্ধ জ্ঞানবলে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন।

মুক্তি লাভের অর্থাৎ ভগবানে বিলীন হইবার যে কয়টী পথ আছে ভক্তি তাহার অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ। অন্য পথে বিঘ্ন বা পতনশঙ্কা আছে, ভক্তি পথে তাহা নাই। ভক্তি-পথও আরও শিক্ষা দেয় যে, প্রভু, পুত্র সখা, ঈশ্বর ও পতি এই সব জাগতিক ভাব লইয়া তাঁহার ভজনা করা যায়। প্রিয় বস্তুর প্রতি পরম প্রেম অর্থাৎ আত্যন্তিক ভালবাসাকে ভক্তি কহে। সুতরাং তাদৃশ ভালবাসা সহজে জন্মে না। ভালবাসার পাত্রের রূপ, গুণ শক্তি, ঐশ্বর্য্য এসব জানা থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃই শাস্ত্রপাঠে জানা যায় তিনি নিরাকার। নিরাকার বস্তুই অসম্ভব, সুতরাং তাহার রূপও অসম্ভব। সত্য কথা। কিন্তু তিনি নিজের মায়াকে আশ্রয় করিয়া সাকার বিগ্রহ হইতে পারেন। ভক্তানুগ্রহার্থ হইয়াও থাকেন। শাস্ত্র বলেন তিনি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, তবে তাঁহার দয়া করিবার শক্তি কোথায়?

সত্য কথা, প্রাকৃতিক গুণ সত্ব, রজ, তম, প্রাকৃতিক ক্রিয়া তাহাতে নাই। অপ্রাকৃতিক গুণ ও অপ্রাকৃতিক শক্তি তাহাতে আছে। আবার সাকার হইলে প্রাকৃতিক গুণও তাঁহাতে থাকিতে পারে। নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়ের ইহাই অর্থ। অন্যথা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ভগবান্ হইতে উৎপন্ন তাহাতে গুণ আসিবে কোথা হইতে? মনুষ্য হইতে কেশ নখ উৎপন্ন হয়, কিন্তু কেশ নখ ও মনুষ্য একই পদার্থ নহে। তদ্রূপ ঈশ্বর হইতে প্রকৃতি উৎপন্ন হইলেও ঈশ্বর ও প্রকৃতি একরূপ নহে। সুতরাং তাঁহার রূপ, গুণ, শক্তি সমস্তই জানা যাইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতি ভালবাসা না জন্মিবে কেন? অন্ততঃ পুত্রভাবে বা সখাভাবেও তো তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি। বেশ কথা, আমার ভাব সেখানে যাইবে কিরূপে? কোথায় যাইবে, ঈশ্বরে? ঈশ্বর কোথায় নাই? তিনি তোমার হৃদয়েও আছেন। তবে তিনি মনোভাব জানিতে পারিবেন না কেন?

জানিতে পারেন কিনা বুঝা কঠিন। ফলের দ্বারাই জানা যাইতে পারে। তুমি যত শক্তি সঞ্চয় করিবে তাহা হইতে তাঁহার অনুগ্রহ বুঝিতে পারিবে। তুমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। এই জীবনেই কি ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়? নিশ্চিত, সাধনার বল থাকিলেই পাওয়া যাইবে। তবে, প্রথমেই যুক্তি তর্কের আশ্রয় লইলে চিত্ত সন্দেহাকুল হইবে, তাহাতে সাধনার ব্যাঘাত ঘটিবে। দর্শন লাভের উপায়, তীর্থস্নান, সাধুসঙ্গ, ভগবৎগুণ শ্রবণ, কীর্ত্তন, রূপচিন্তা, মহিমাস্মরণ, বিষয়ে বীতরাগ, বিষয় সংসর্গ ত্যাগ, শ্রদ্ধা, অনুরাগ, তপস্যা, সমাধি ইত্যাদি। যদি সাধনাবস্থায় মৃত্যু হয়? হয় ক্ষতি কি? পরজন্ম উপার্জ্জিত সংস্কার বলে আবার সাধনায় দ্বিগুণ প্রবৃত্তি হইবে। ধর্ম্ম স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও মহৎ ভয় হইতে রক্ষা করে। সুতরাং তজ্জন্য কোনও চিন্তা নাই। তবে, তীব্র সাধনাবলে মানব এই জীবনেই ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে! তবে, সাধন-বিরোধী কামিনীকাঞ্চনের বহুদূরে থাকিতে হইবে।

কিরূপ ভাবে ভগবানের দর্শন পাওয়া যাইতে পারে? যে, যে ভাবে তাঁকে চায়, সেই ভাবেই দেখা পায়। তিনি ভক্তের পক্ষে কল্পতরু। বহুজন্ম তপস্যার ফলে, নন্দরাজ পুত্র ভাবেই ভগবানকে পাইয়াছিলেন। ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্ত বর্ণিত আছে। জ্ঞান ও ভক্তির প্রভেদ এই যে, নিরাকারেরর উপাসনা অত্যন্ত কষ্টকর এবং বহুজন্ম পরে জ্ঞানী ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। আর ভক্ত ইহজন্মেই ভগবানকে পাইতে পারে। জ্ঞানী যাঁহাকে পায় ভক্তও তাঁহাকেই পায়। তবে ভক্ত নির্ব্বাণ মুক্তির অভিলাষী নহে। ভক্ত সেবারসিক এবং সহচর হইতে ইচ্ছুক। ফলে, ভক্ত বা জ্ঞানী কাহারও জন্মান্তর হয় না। তবে মন হইতে সংশয় অবিশ্বাস দুর করিতে হইবে এবং দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে সাধনা করিতে হইবে।

কোন একটা বিষয় লক্ষ্য করিতে হইলে, একাগ্রতা ও দৃঢ় বিশ্বাস চাই। ভগবৎলাভ বিষয়েও সেই একই নিয়ম। নিশ্চিতই বস্তু মিলিবে এমত একটা দৃঢ় ধারণা চাই। অনিশ্চিত বিষয়ের জন্য চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা বিফলও হইতে পারে। নিষ্ফল বা দুর্লভ বিষয়ের জন্য কেহই চেষ্টা করে না। ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য যখন লক্ষ লক্ষ লোকে যত্ন করিতেছে, তখন সে চেষ্টা বিফল চেষ্টা নহে ইহা মনে করিতে হইবে। যদি বল—ভগবানের যে সব মূর্ত্তি আছে, তিনি যদি সেই মূর্ত্তিতে দেখা না দেন, তবে তাঁহার অস্তিত্ব জানিব কিরূপে? ভগবান স্বয়ংই ইহার উত্তর দিয়াছেন। যে যথা মাংপ্রপদ্যন্তে, তানতথৈব-

ভজাম্যহং। যে ব্যক্তি আমায় যে ভাবে চায়, আমি সেইভাবেই তাহাকে দেখা দিয়া থাকি। সুতরাং ভক্তের বাসনা পূরণার্থ তিনি সবই করিতে পারেন। যদি মনে করা যায় যে, যখন তিনি মানবাকারে ধরায় অবতীর্ণ হন, তখন দেহ ধারণ জন্ম তাঁহাকে জননী-জঠরে বাস করিতে হইবে এবং গুণের অধীনও হইতে হইবে। বাজিকরের বাজির ন্যায় তাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম সবই অলৌকিক। তিনি কর্ম্মাধীন হইয়া বা প্রাকৃতিক গুণাধীন হইয়া জগতে আইসেন না। তাঁহার নিজ মায়াকে আশ্রয় করিয়া শরীর ধারণ করেন। লীলা শেষ হইলেই অদৃশ্য হন। তাঁহার জ্ঞান, স্মৃতি, কোন কালেই বিলুপ্ত হয় না। মনুষ্যাকার হইলেও ভগবদ্দেহ চিন্ময়। তবে মনুষ্য লোকে আসেন বলিয়া মনুষ্যের ন্যায়ই আচরণ করেন। তাঁহার অবতারের হেতু তিনি নিজেই বলিয়াছেন। যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের উদয় হয়, তখন সাধুদিগের পরিত্রাণ ও পাপীদিগের বিনাশার্থ তিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি হয়। বৈদিকযুগের নৃশংস পশুবধ, অত্যাচার নিবৃত্তির জন্য অহিংসা পরমধর্ম্ম এই মত প্রচারার্থ বুদ্ধাবতার। আবার বুদ্ধের মত প্রচারের ফলে ভারতে শোচনীয় জড়তা উপস্থিত হওয়ায় কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি-পাদনার্থ এবং মানব মণ্ডলীকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য কৃষ্ণাবতার। এইরূপ পর পর হইতেছে ইহা চিন্তা করিলেই জানা যায়। অতএব ভগবদ্দর্শন অসম্ভব নহে। তবে, মানব কামিনীকাঞ্চনের জন্য যেমত প্রাণান্ত চেষ্টা করে, তাহার শতাংশের একাংশ যত্নও ভগবৎ দর্শনের জন্য করে না। ভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা, মনুষ্য লোকে শীঘ্রই কর্ম্ম জন্য সিদ্ধি লাভ বটে।

কিন্তু ভগবৎ দর্শনলাভার্থে যত্ন করে, কটা লোক? একটু সময় ধ্যান ধারণায় নষ্ট করা অপেক্ষা সে সময় অর্থোপার্জ্জনের চিন্তা বিষয়ীরা সার্থক মনে করে। যখন যত্ন বিনা রত্ন মিলে না, তখন বিনা যত্নে ভগবৎদর্শন ঘটিবে কিরূপে? অনেকে মনে করে, শৈশবে বিদ্যার্জ্জন, যৌবনে ধনোপার্জ্জন, প্রৌঢ়াবস্থায় বিষয় ভোগ, তারপর ধর্ম্মচর্চ্চা করা যাইবে। এমত ধারণা ভ্রান্তিমূলক, কারণ, শৈশব ও বার্দ্ধক্যে মানব মনের অস্থিরতা ও দেহের অপটুতাবশতঃ ধর্ম্মানুশীলন করিতে পারে না। যৌবনেও প্রৌঢ়েও হয় না, সুতরাং একবারেই ধর্ম্মচর্চ্চা ঘটে না। মৃত্যুর পর কিছুই সঙ্গে যায় না, কেবল প্রিয় সুহৃদ ধর্ম্মই সঙ্গী হয়। সেই ধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কতদূর মূঢ়তার কার্য্য তাহা ভাবিয়া দেখুন।

আপনহিত পাগলেও বুঝে। না বুঝিলে দুঃখের দায়ী আর কে হইবে? আমরা স্বখাত সলিলেই ডুবিয়া মরি। আমাদের নিজ দুঃখের জন্য অপর কেহই দোষী নহে।

ভগবান আছেন, ইহা সত্য, তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়, ইহাও সত্য তবে, আমাদের যত্নের অভাব বলিয়াই আমরা দেখা পাই না। স্বর্গের যাত্রী ও নরকের যাত্রী গণনা করিয়া দেখ, নরকের যাত্রীর সংখ্যাই বেশী হইবে। ইহার কারণ কামিনী ও কাঞ্চন। নরকের পথ কোমল কুসুমাবৃত, আর স্বর্গের পথ কণ্টকাবৃত। সুতরাং প্রবৃত্তির মোহিনী মুর্ত্তিতে বিমুগ্ধ মানব, সহজে স্বর্গের যাত্রী হইতে পারে না। মানব একে কর্ম্মাধীন, তারপর রিপুর অধীন, সুতরাং সে স্বাধীন হইতে পারে না। রিপু পরতন্ত্র হইয়া অগম্যাগমন, মদ্যপান, অখাদ্যভক্ষণ, চৌর্য্য, প্রতারণা, দস্যুতা বিষদান, গৃহদাহ, নরহত্যা প্রভৃতি কিছুই তাহার করিতে বাকী থাকে না। সৎগুণে মানব দেবতা হয়, আবার অসৎ গুণে নরকের পিশাচ তুল্য হয়। যদি বল, সবই সে কর্ম্মবলে করে, তবে তাহার দোষ কি? পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মও কর্ম্ম, ইহজন্মের কর্ম্মও কর্ম্ম, ইহজন্মের কর্ম্ম-বেগ যদি প্রবল হয় তাহা হইলে ঐহিক কর্ম্ম প্রাক্তন কর্ম্মকে পরাজিত করিতে পারিবে না কেন? না পারিলে পুরুষকার বিফল হইয়া যায়।

মানব যদি পশু হইত তাহা হইলে কথা ছিল না। যখন মানবের হিতাহিত জ্ঞান আছে, ভালমন্দ বোধ আছে, তখন সে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিবে না কেন? মানবের রীতি দেখিলে বোধ হয় যেন প্রবল স্রোতে অবশভাবে ভাসিয়া যাইতেছে। কূলে উঠিবার চেষ্টাও করিতেছে না। হায়! কি দুর্দ্দশা! ইহা দেখিয়া জ্ঞানীগণ স্বতঃই সন্তপ্ত হন। উপদেষ্টা, সুহৃদ, শাস্ত্র, গুরু এত সব অনুকূল সহায় থাকিতেও মানবের অধঃপতন নিতান্ত দুঃখের কথা। মানব এতদূর পাপসাগরে ডুবিতে পারে, যাহা লেখনী লিখিতেও অসমর্থ। এই কলিযুগে আর ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার নাই, ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, পাপের ভয় নাই। মৃত্যু সদর্পে জনপদমধ্যে বিচরণ করিতেছে যৌবনে, শৈশবে প্রাণ হরণ করিতেছে। জনপদ শ্মশানে পরিণত করিতেছে। এ সব কিসের ফল? কারণ বিনা কার্য্য ঘটে না, তবে এ সব ঘটনার কারণ কি? কারণ মানবের কর্ম্মফল, যে ফল মানবকুলের উপর দিয়া ফলিতেছে, তাহার কারণ মানব পাপে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শুক্র, শোণিত সমস্তই দূষিত হয়, তজ্জন্য মারাত্মক ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া দেহ ধ্বংশ করে। এবং মানবের কর্ম্মফলে ঋতুর গুণ ঠিক প্রকাশ হয় না,

তজ্জন্য জল বায়ু দূষিত হয় এবং দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির উৎপত্তি হয় ও জনপদ ধ্বংস করে। "ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকং" ধর্ম্ম ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে রক্ষা করে। হিন্দুর ধর্ম্ম,শয়ন, ভোজন, আচার বিচার সব বিষয়ের সহিত এবং স্বাস্থ্যবিধির সহিত জড়িত। কোন বস্তু দ্বারা দন্ত মার্জ্জন করিবে, কোন প্রকৃতির লোক কিরূপ বস্তু ভোজন করিবে, কিরূপে সহবাস করিবে, কি ভাবে শয়ন করিবে, সমস্তই ধর্ম্মশাস্ত্রে উপদেশ আছে। ধর্ম্মানুশাসন লঙ্ঘন করিলেই স্বাস্থ্য ভগ্ন হইবে তাহার ফল মৃত্যু। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমরা মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতেছি। অজ্ঞানীর অধঃপতন সম্ভবপর, জ্ঞানীরপক্ষে সেটা দুঃখজনক। ধর্ম্মাচরণের ফল চিত্ত শুদ্ধি,তাহার ফল জ্ঞান,তাহার ফলমুক্তি, চিরদুঃখনিবৃত্তি। এখন বুঝুন ধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনে অধঃপতন হয় কিনা? ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়াও যখন সমগ্র মানব মণ্ডলীর মতিগতি ফিরাইতে পারেন নাই, তখন অন্যের প্রচেষ্টায় কি ফল হইবে? জ্ঞানের প্রদীপ মনে না জ্বলিলে, ভ্রম অন্ধকার ঘুচে না।

নিজের মুখ প্রতিবিম্ব নিজে দর্পণে দেখিয়া দোষ শোধন চেষ্টা না করিলে অন্যের সহস্র চেষ্টায়ও ফল ফলে না। পাথরের গায়ে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিলে, তাহা ফিরিয়া আইসে। সেইরূপ যে হৃদয় কামিনী কাঞ্চনের নেশায় বিচেতন, তথায় উপদেশ স্থান পায় না। গভীর দুঃখের সহিত মানব মণ্ডলীর এদুর্দ্দশা প্রকাশ করিতে হয়। আপাতরমনীয় বিষয়-সুখ-লালসায় মানব অনায়াসে অমূল্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। মৃত্যুকালেও একবার ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করে না। তখনও কামিনী কাঞ্চনের কথাই বলিতে থাকে। যে ভাবে ভাবিত হইয়া জীবন ত্যাগ করে, আবার সেইভাবে জগতে আইসে। বারংবার ঘটী যন্ত্রবৎ উত্থান আর পতন ঘটে। এই শোচনীয় পরিণাম স্মরণ করিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। পশুর নহে, মানবের এমত শোচনীয় পরিণাম অত্যন্ত দুঃখপ্রদ।

মানবের এ মত অবস্থা হইবার কারণ কি? বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে। তাহা হইতে অভিলাষ উৎপন্ন হয়, অভিলাষের বা কামনার বাধাপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হইতে অজ্ঞানতা, তাহা হইতে আত্মবিস্মৃতি, তাহা হইতে জ্ঞান লোপ, বুদ্ধি লোপ হইলেই মৃত্যু। বিষয়ের নেশায় মানুষকে পাগল করিয়া ফেলে। সুতরাং তখন আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। দেহ ইন্দ্রিয়ের অধীন, ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীন, মন রিপুর অধীন। অতএব এক মনকে বশীভূত করিতে পারিলে সমস্ত বিপদ দূর হইতে

পারে। কিন্তু, মনকে বশীভূত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তাহা হইলেও জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। মন বশীভূত করিবার উপায় স্বয়ং ভগবান বলিয়া দিয়াছেন। অভ্যাসের দ্বারা অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ক্রমশঃ বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে হইবে। আর সমস্ত পার্থিব বস্তুর দোষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক যাহাতে মন বীতশ্রদ্ধ হয় এবং তজ্জন্য বৈরাগ্য জন্মে তাহা করিতে হইবে। তাহা হইলেই মন স্থির হইবে এবং বাধ্য হইবে। মন বাধ্য হইলেই তখন স্থূল জগৎ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম জগতের চিন্তা করিতে হইবে।

অন্তর রাজ্যে অনুসন্ধান করিতে করিতে পরোক্ষ জ্ঞানের আলোক মনের উপর পতিত হইবে। তখন মন উৎফুল্ল হইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইবে। অগ্রসর হইতে ২ ভগবৎতত্ত্বের আভাস প্রাপ্ত হইবে। তখন সে সমস্ত ভুলিয়া প্রভুর নিকট দাসভাবে শরণাপন্ন হইবে। কারণ, জীব চিরদিনই কৃষ্ণদাস। তখন সে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কর্ম্ম, অকর্ম্ম, জীবন, মন সমস্তই তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া শান্তি লাভ করিবে। ইহাই ভক্তিমার্গ, এ পথে কোনও শঙ্কা নাই পতনের ভয় নাই। অর্থ ব্যয় নাই, কষ্ট সাধ্য কোন কার্য্য নাই, চাই কেবল বাধ্য মন। মন দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে। সখা, পুত্র, প্রভু, যে কোন ভাব তাঁহাতে আরোপ করিয়া ভাল বাসিবে। ভাব গাঢ়তর হইলে মহাভাবে পরিণত হইবে। তখন বিষয় জ্ঞান আদৌ থাকিবে না। তারপরই প্রভুর সহিত সর্ব্বদা মিলন এবং অপার প্রেম। ভক্তি হৃদয়ে নিদ্রিতবৎ থাকে, সাধনের বলে সাধ্যরূপ ধারণ করে। যাহা না থাকে তাহা কখনও উৎপন্ন হয় না। কাহারও পূর্ব্ব জন্মের সাধনা প্রভাবে পরজন্মে স্বতঃই ভক্তির উদয় হয়। কাহারও গুরুর কৃপায় ভগবানে ভক্তি জন্মে, কাহারও সাধুসঙ্গলাভে ভক্তি জন্মে। কাহারও জ্ঞানের পরিপাকাবস্থায় ভক্তি জন্মে, কাহারও ভগবৎ কৃপায় ভক্তি জন্মে।

ভক্তিই ভগবানকে সহজে লাভ করাইয়া দিয়া থাকে। তিনি স্বতঃই ভক্তির বশীভূত। তিনি যেমন ভক্তের প্রিয়, ভক্তও সেইরূপ তাঁহার প্রিয়। ভক্তের হৃদয়েই তাঁহার বৈকুণ্ঠধাম। ভক্ত ভগবানের প্রতি এতই প্রেমপ্রবণ যে, তাঁহাকে ছাড়া তাহারা দিতে চাহিলেও মুক্তি লইতে চাহে না। তাঁহারা বলে, চিনি হওয়া অপেক্ষা চিনির আস্বাদ গ্রহণ করাই অধিক সুখ। অনির্ব্বচনীয় সুখসাগর ভগবৎ সঙ্গলাভ হইলে আর কেহই জগতে ফিরিয়া আইসে না। ভগবৎ প্রাপ্তিজনিত আনন্দের সহিত তুলনা দেবার জগতে কিছুই নাই।

সেই আনন্দের আভাসমাত্র জগতে পতিত হওয়ায়, তাহাতেই জগৎ মুগ্ধ হইয়া আছে। তাহা মানবের অপ্রাপ্য নহে। ভগবানের কিঙ্কর ব্যতীত সেই আনন্দ আর কে উপভোগ করিবে? অতএব সহজে শ্রেয়োলাভ এক ভক্তি ব্যতীত অন্য উপায়ে হওয়া অসম্ভব। অতএব মানবজীবন সফল করিতে হইলে ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্দ্দেহি যশোদেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহিমে!
পুত্রান্‌দেহি ধনংদেহি সর্ব্বান কামাংশ্চ দেহিমে !!

শারদীয় উৎসবে
আগমনী-সঙ্গীত।

এত মা ভবানি! কৈলাসবাসিনি! নগেন্দ্রনন্দিনি! শিবানি! সর্ব্বাণি!
সম্বৎসর পরে, প্রফুল্ল অন্তরে, হেরিব মা দুর্গে! শ্রীপদ দুখানি ॥
নাহি গো মা মোর কোন উপচার, নাহি গৃহ নাহি সম্পদ সম্ভার,
আমি হীনমতি অতি পাপাচার, কেবল ভরসা মা তোমার, কৃপা গো ঈশানি ॥
রাখিয়া মা তোমায় হৃদয় আবাসে, পুজিব যতনে মনেরি উল্লাসে,
বলিব মা দুখ তোমারি সকাশে, কৃত্তিবাস দারা, তারা ত্রিনয়নি ॥
ষোড়ষোপচার পুজারি বিধান, নাহি মা আমার তাহা বিদ্যমান,
অনাহতে করি আসন প্রদান, নেত্রনীরে পদ ধোয়াব জননি ॥
তব ভক্ত যাঁরা ধনী গুণীজন, বিবিধ বিধানে করিবেন পূজন,
আমায় রেখেছ যেমন, সেরূপে অর্চ্চন, কর মা গ্রহণ দুর্গতিহারিণি ॥
তুমি বিশ্বমাতা কিবা দিব বলি, এ ব্রহ্মাণ্ডজীব তনয় সকলি,
মানসেতে জয় দুর্গা দুর্গা বলি, এবার করিবে অর্চ্চনা তোমায় তারিণী ॥

উচ্চ সার্টিফিকেট ও মেডেলপ্রাপ্ত করকোষ্ঠীর শুভাশুভ ফল গণক, কলিকাতার সুবিখ্যাত "নববিভাকর পঞ্জিকা," গণনা সমালোচকানুমোদক, আয়ুর্ব্বেদ মাসিক পত্রিকার ৩য় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায় মকরধ্বজ অনুপানবিধি, আলোচনা মাসিক পত্রিকায় ২য় বর্ষ নবম সংখ্যায় মাতৃবিলাপ প্রবোধ সুধালেখক, শ্রীমদ্ভাগবত কথক সত্য নারায়ণ লীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীতারিণীচরণ কবিভূষণ ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ব্বিদ রচিত।

খেলা শেষ।

লেখক—শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ান।

যমুনা তটে শ্যামরায় আর হলনা থাকা,
দূর অম্বরে সম্বরে রবি কিরণ পাখা।
কালো হয়ে আসে নিবিড় আঁধার ঘাট; মাঠ, বাট ঘেরে চারিধার
ছাড় এই বার যেতে হয় মোর বিনোদ বাঁকা;
করিলে কি যাদু নাহি জানি বঁধু তব প্রেমে প্রাণ পাইল কি মধু
দায় হলো মোর আপনারে আর সামালি রাখা,
ওগো চিতচোর চুরিজান বটে দিবা-লোকে এলে যমুনার তটে
হাতে হাত ধরি করিলে কি খেলা অমিয় মাখা,
কালো তুমি কালা নিশীথ তিমিরে যেও যেও যেও আঁধার কুটীরে
দেখিবে না কেহ রহিবে তুমি যে তিমিরে ঢাকা।

ন মাতুঃ পরদেবতা

শারদীয়া উৎসবে বিজয়াস্তুতি-গীতাঞ্জলি।

লেখক—শ্রীতারিণীচরণ কবিভূষণ ভট্টাচার্য্য।

কাতরে বলি মা তোমায় থাক গো মা! শুভঙ্করি!
যেওনা আর কৈলাসে বল্‌ব, দিগবাসে মিনতি করি॥
সম্বৎসর পরে তোমায় হেরিয়া নয়নে,
তাই আনন্দিত মনে, নিবেদি চরণে,
সাজি মম আভরণে, তিষ্ঠ সুবসন পরি॥
শিবসহ এসেছমা তিন দিন তরে,
কি বলিব হরে, মনে ভয় করে,

যদি আর নাহি তোমারে পাঠান সে ফণিধারী ॥
গৃহেতে জামাতা রাখি তোষে যেমন নরে,
আমি তোষিব তোমারে, আর সেই হরে,
হেথা বিহর লয়ে শঙ্করে, আনন্দে দিবা বিভাবরী ॥
কায়-রাজ্য দানপত্র লিখে দিব এইক্ষণে,
এবার তুমি কন্যা হও মা আমার যা বাসনা মনে,
সদা-মা বলিয়া যাই আসি দেখি পিতা হ'য়ে যদি তরি ॥
গিরি সুতা নাম তব গিরিশ বণিতা,
নির্দ্দয় পাষাণ আমি 'তাই' হতে চাই মা পিতা,
নৈলে তোমারি পিতৃ-যোগ্যতা, কি আছে বল আমারি ॥
চতুস্ত্রিংশৎ অব্দে মা-গো ষোড়শ আশ্বিনে তারা,
পাই যেন মা দরশন যদি যাও ভবদারা,
তারিণীর এই আমন্ত্রণ মনে রেখে কৃপা করি ॥

হিন্দুর বিবাহ সংস্কার।

লেখক—ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদ।

কত বয়সে হিন্দু কন্যার বিবাহ হওয়া উচিত এই বিষয় লইয়া মাঝে মাঝে আন্দোলন চলিয়া থাকে। যাহার যেরূপ অভিরুচি তিনি সেইরূপ মত প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু বাস্তবিক কোন্ মত সমীচিন তাহা ভাবিবার বিষয়।

জগত পরিবর্ত্তনশীল, দেশকাল পাত্রভেদে সর্ব্ব বিষয়ের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, সমাজের উন্নতিও শাস্ত্রের গূঢ় উদ্দেশ্য। সমাজ যাহাতে বিশৃঙ্খলায় বিধ্বস্ত হয়, শাস্ত্র কখনই এরূপ বিধি দিতে পারেন না। বিবাহ সম্বন্ধে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে মতের প্রচলন ছিল, আজ তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ইহাকেই বলে কালের স্রোত। ইহার গতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, কিন্তু ঐ স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেলেও চলিবে না, সমাজের হিতের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করিতে হইবে।

আমরা পৌরাণিক যুগে দেখিতে পাই গৌরীর অষ্টম বর্ষ বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। বোধহয় অন্য সকলে পরিণত বয়সে পাত্রস্থা হন। রামায়ণ মহাভারতের যুগেও একমাত্র সীতা ও তাহার ভাগিনীগণ ভিন্ন অন্য কাহারও অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্বকালে যুবকযুবতীগণ অনেক স্থলে পরস্পর মনোনয়ন করিয়া বিবাহ করিত। এই রীতিই গান্ধর্ব্ব্য বিবাহ আখ্যায় প্রচলিত হইয়াছিল। সাধ্বী সতীর আদর্শ স্থল সাবিত্রীর বিবাহও এই মতে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ বনপর্ব্বে দেখিতে পাই, তাহার পিতা বলিতেছেন—

পুত্রি ! প্রদানকালস্তে ন চ কশ্চিৎ বৃণোতি মাম্।
স্বয়মন্বিষ্য ভর্ত্তারং গুণৈঃসদৃশমাত্মনঃ ॥
প্রার্থিতঃ পুরুষো যশ্চ যোল্নিবেদ্যস্ত্বয়া মম।
বিমৃশ্যাহং প্রদাস্যামি বরয় ত্বং যথোপ্সিতং ॥

হে পুত্রি! তোমার বিবাহকাল উপস্থিত, অথচ আজও পর্য্যন্ত কেহ আমার নিকট তোমার পাণিগ্রহণ প্রস্তাব করিল না; সুতরাং তুমি নিজে অন্বেষণ করিয়া আত্মসদৃশপতি নির্ণয় কর, এবং এই পতি কে তাহা আমাকে জানাও, উপযুক্ত বিবেচনা করিলে আমি তাহাতে অনুমোদন করিব।

মহাভারতের যুগে স্বয়ম্বর-প্রথা প্রচলিত ছিল, সুতরাং স্বামী নির্ব্বাচনের ক্ষমতা না হইলে তাহাদের বিবাহ হইত না। রাজপুত জাতিও পৌরাণিক যুগের অনুকরণে অধিক বয়সের মেয়ের বিবাহ দিত, এই সমস্ত উদাহরণ দেখাইয়াই বোধহয় সমাজের উন্নতিকামী বিবাহ সংস্কার সমিতি যুবতিবিবাহের একান্ত পক্ষপাতী, কিন্তু দেশকাল পাত্রের উপর লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন তাহারা কিছুমাত্র মনে করেন নাই, তাহারা বলেন, বাল্য বিবাহে শারীরিক অধোগতি, দারিদ্র্যবৃদ্ধি, বালিকাদের শিক্ষার সুযোগহানি ইত্যাদি ঘটিতেছে। ইদানীং অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকও বলিয়া থাকেন, অল্প বয়সে পুনঃ পুনঃ সন্তান প্রসবের হেতু হিন্দু রমণীরা অকালে বার্দ্ধক্যে উপনীতা হইয়া কালের কবলে পতিতা হইতেছেন। এদেশে ১৫ হইতে ২৫ বৎসর বয়স্কা নারীর মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক, এবং বাল্য বিবাহ ইহার একমাত্র কারণ এইরূপই তাহাদের ধারণা। বাল্যবিবাহ অকাল বার্দ্ধক্যের অন্যতম গৌণ কারণ হইতে পারে কিন্তু ইহাকে কখনই একমাত্র কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। পূর্ব্বকালে যখন বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল তখনকার রমণীরা দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন, তাহাদের

স্বাস্থ্যও যেন কোন দুর্ভেদ্য দুর্গমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া ব্যাধিশত্রু হইতে রক্ষা পাইত। এখনও নিম্নশ্রেণী মধ্যে দেখা যায় কন্যাপণ প্রচলিত থাকাতে অনেক বালিকার অতি অল্প বয়সে বিবাহ হয় অথচ তাহাদের স্বাস্থ্য ভদ্র রমণীর স্বাস্থ্য অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, আজ নানাকারণে ভদ্র রমণীর স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ন হইতেছে এস্থলে তাহার আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

বাল্যবিবাহে দারিদ্র্য বৃদ্ধি হয়, এ কথা বাতুলের প্রলাপ বলিয়া উপহাস-যোগ্য। অল্প বয়সে বিবাহ দিলে বংশ বৃদ্ধি হইবে সুতরাং তাহাতে দারিদ্র্য অনিবার্য্য একথা অনেকে বলিতে পারেন কিন্তু ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুজাতির বংশ-বৃদ্ধি কি বাঞ্ছনীয় নহে? বংশবৃদ্ধি যাহাতে না হয় সেই চেষ্টা না করিয়া যাহাতে বংশ বৃদ্ধি হয় এবং সেই বর্দ্ধিত বংশের ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত ধনবৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করা যায়, সেই চেষ্টাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কার্য্য।

বাল্য বিবাহে বালিকাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যাঘাত হয়, এই কথা যুবতী বিবাহের পক্ষপাতীরা বলিয়া থাকেন। পুরুষ ও রমণী উভয়ের কার্য্যক্ষেত্র বিভিন্ন, সুতরাং উভয়ের একই প্রকারের শিক্ষাতে অনেক সময়ে সমাজে বিশৃঙ্খলাই ঘটে, একথা ইউরোপীয়েরাও স্বীকার করিয়াছেন। সংসার প্রতিপালনের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা বিবাহের পূর্ব্বেই তাহারা শিখিতে পারে, ইচ্ছা এবং যত্ন থাকিলে বিবাহের পরেও অনেক বিষয় শিখিবার অবসর পাওয়া যাইতে পারে।

যাহা হউক, আমাদের আলোচ্য, বর্ত্তমানে কিরূপ বয়সে মেয়েদের বিবাহ হওয়া উচিত, পৌরাণিক যুগের অনুকরণ যে চলিতে পারে না তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখাইব।

পুরাকালে যুবতীবিবাহের প্রচলন থাকিলেও নগ্নিকা অর্থাৎ যে কন্যা রজঃস্বলা হয় নাই এইরূপ কন্যাই বিবাহে শ্রেষ্ঠা বলিয়া পরিগণিত হইত। মহর্ষি গোভিল তাঁহার গৃহ্যসূত্রে বলিয়াছেন, নগ্নিকাকন্যাই বিবাহে প্রশস্তা, কিন্তু ঋতুমতী হইলেও তাহার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। আমরা এ বিষয় বিস্তারিতভাবে পরে আলোচনা করিব।

পুরাকালের যুগকে সুবর্ণ যুগ বলা যায়, নগ্নিকার বিবাহ শ্রেষ্ঠা হইলেও অনগ্নিকার বিবাহও চলিতে পারে এইরূপ বিধি থাকাতে বোধ হয় সেকালে পিতামাতা কন্যাদের অধিক বয়সে বিবাহ দিতেন। এখনকার ন্যায় সেই

সময়ে এইরূপ অনুষ্ঠানে রীতিনীতির কোন ব্যত্যয় ঘটিত না এবং এই রীতিনীতিই ভারতবর্ষে অনেককাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু জগৎ পরিবর্ত্তনশীল জল বায়ুর দোষে ক্রমে মানব সংসারে কুনীতি প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। তখন কন্যাকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতাবস্থায় গৃহে রাখা সম্ভবপর হইল না, সেই জন্যই বোধ করি পরাশর আইন করিলেন—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥

এবং "কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ" এই বিধি নির্ম্মিত হইল, অথচ এ নিয়ম কুলীন ব্রাহ্মণের পক্ষে খাটিবে না কেন তাহার কোন হেতু দেখিতে পাই না। অধিক বয়স্কা কন্যার নৈতিক অবনতি দেখিয়াই বোধ করি পরাশর এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি সমাজের মঙ্গলের জন্যই করিয়াছেন। কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে অধিক বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যার কুল-কলঙ্কের কথা অনেক সময়ে শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে মেয়েদের অবরোধপ্রথা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে, তাহারা পাড়া বেড়াইতে যায়, পরপুরুষের সম্মুখেও বাহির হয়, বধুদের ন্যায় তাহাদের কোন সঙ্কোচভাব থাকে না। এরূপ অবস্থায় অধিক বয়স পর্য্যন্ত মেয়েদের অবিবাহিতা রাখিলে সমাজ কলুষিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাই বলিয়া, পরাশরের বিধি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিবার সময় এখন আর নাই। মেয়েদের নির্দ্দিষ্ট বয়সে বিবাহ দিতেই হইবে অথচ ছেলেদের সম্বন্ধে সেরূপ বাধ্যতামূলক কোন বিধির প্রয়োজন কেহ মনে করেন নাই, সুতরাং নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যে মেয়েদের বিবাহ দিতে কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। অথচ আমাদের শাস্ত্রে (মহানির্ব্বাণতন্ত্র) একথাও পাই, যে বালিকা পতিমর্য্যাদা জানে না, পতিসেবা ও ধর্ম্মের শাসন শিখে নাই তাহার বিবাহ দিবে না যথা—

অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদাম্ অজ্ঞাতপতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালাম্ অজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥

কিন্তু পরাশরাদি বিবাহের যে বয়সের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে বয়সে পতি কাহাকে বলে তাহাই অনেকে জানে না।

অনেকে এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, যে দেশে বিধবাবিবাহের প্রচলন

নাই, সেখানে নিতান্ত অল্প বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত নহে। কিন্তু অনেকে আবার নানারূপ যুক্তিতে এই মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, হিন্দু বিধবার ধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্য একটী অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা বিধবা হইয়া ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিলে যৌবনের ভোগলালসা উপভোগের সময়ে তাহার তাদৃশ কষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু একটী যুবতীর বিবাহ দিতে না দিতেই যদি সে বিধবা হয় তাহা হইলে সে অনভ্যস্তা ব্রহ্মচারিণীর অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠে। কিন্তু এ সমস্ত মত পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া একটী অপোগণ্ড বালিকাকে আমরা নানাভাবে নির্য্যাতন করিতে পারি অথচ সেই বালিকার পিতা সপ্ততিবর্ষ বয়সে বিপত্নীক হইয়া পুনরায় একটী বালিকার পানিপীড়ণ স্বচ্ছন্দে করিতে পারেন এবং এইরূপ ঘটনা হিন্দু সমাজে অহর্নিশি ঘটিতেছে। কোনরূপ আইনেই তিনি দণ্ডনীয় হন না।

স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক যুক্তিতর্ক চলে। কিন্তু আমাদের মতে অতি অল্প বয়স এবং অতি অধিক বয়স, হিন্দু কন্যার বিবাহের পক্ষে উভয়ই দোষাবহ এবং এ ক্ষেত্রে কিশোর বয়সই প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয়।

মূর্ত্তিপূজা।

লেখক—শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়

(১)

মূরতি তোমার আরতি করি যে,
সাধে, মা আমার ঘটে এই ভ্রম?
অই যে ত্রিদিবে দীপালোক ঘটা,
ওকি, মা, হয় গো, মানব করম?

(২)

অই ঘোষে অই জীমূত গরজে,
যেন গো গম্ভীর রণ কোলাহল।
অই গো আবার বিজলী চমকে,
শানিত খড়্গ, হাসে খল্ খল ॥

(৩)

ওরাও কি মাগো, মানবের খেলা ?
তা না যদি হয়, ভ্রমের কি দোষ ?
ভ্রম কিবা হয়, বলিয়া মা দাও ;
কেবলি ভ্রমেতে উচিৎ কি রোষ ?

(৪)

প্রভাতে অরুণ লয়ে ফুল-ডালা,
মধুপ গুঞ্জন, কাকলি কুজন,
গীতবাদ্য ছলে, করি কোন্ খেলা,
দেখায় অই মা, ভকতি পুজন ?

(৫)

আবার কেন মা, প্রদোষ সময়ে,
আঁধার উদয়ে জ্বালি' দীপ মালা,
ঝিল্লিরব ছলে, ঘণ্টা বাজায়ে
দেখায় জগতে আরতির মেলা ?

(৬)

অই গো আবার দিবা দ্বিপ্রহরে
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তুলিয়া গগনে,
কে দেখায় বল, কি তাহার বাহার ?
তবু ভ্রমে দোষ, মানব জীবনে ?

(৭)

হয় ভ্রম হয়, ঘটুক্ সে ভ্রম
তবু তোমা যেন দেখি মূর্ত্তিমতী,
পূজি সে মূরতি, পালি সে নিয়ম,
শিখাইছ যায় ধরি' দিবা রাতি।

(৮)

তোমার মহিমা, তুমিই মা জান,
আপন গরিমা আপনি দেখাও ;
তাতেই তুমি মা, ভ্রম টেনে আন ;
তবে মা ভ্রমেতে কেন দোষ দাও ?

(৯)

নিরাকার তুমি, নির্ব্বিকল্প যদি
তোমার ধরম ; তবে মাগো বল,
কেন সে দেখাও, করিয়া বিবাদী
অপরূপ রূপ, হাঁসি' খল খল ?

(১০)

সন্তানে যদি মা, এতই ছলনা ;
ছলনার পথে নাহি কি নাহি কি
মুকতির দ্বার ? বল না, বল না।
আমি যে তোমার ছেলে অবিবেকী

(১১)

তন্ত্র, মন্ত্র কিবা ধর্ম্ম শাস্ত্রে কি যে,
বুঝিনা ত মাগো, অই সব গূঢ়।
কেবলি জানি মা, এই বাক্য বীজে,
মার দৃষ্টি পুত্রে যত দিন মূঢ়॥

কাশীর স্মৃতি।

লেখক—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

বহুদিন হইল বিশ্বনাথের অধিষ্ঠান ভূমি কাশী ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু আজও তাহার স্মৃতি ভুলিতে পারি নাই। সে বার বৎসর পূর্ব্বেকার কথা সাহিত্যগুরু পণ্ডিত ৺সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে এবং ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের স্বামী দয়ানন্দের আহ্বানে হিন্দু দর্শন পড়িবার জন্য কাশী গিয়াছিলাম। আমি যখন কাশী গিয়াছিলাম, তখন শীতকাল। কাজেই শীতের তীব্র যন্ত্রনাটা পথে বিশেষ অনুভব করিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে কাশীর দূরত্ব ৪২৯ মাইল। হাওড়া হইতে রাত্রি ৮॥ টার ট্রেণে চড়িয়া পরদিন বেলা ৮টায় ৪১৯ মাইল দূরবর্ত্তী মোগলসরাই গিয়া উপস্থিত হইলাম।

সেখান হইতে পুনরায় আউদ রোহিলখন্দ রেলওয়ের গাড়ীতে ১০ মাইল পথ যাইয়া একেবারে বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। কাশীতে যাইতে গেলে ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে অবতরণ করাই সুবিধা, কারণ ঐখানে সর্ব্বদা এক্কা, ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

ট্রেণ মোগলসরাই হইতে ছাড়িয়া যখন কাশীর উপরিস্থিত "ডাফরিণ ব্রিজের" উপর উপস্থিত হইয়াছিল তখন গবাক্ষ দিয়া উঁকি মারিয়া অন্য পারে উত্তর-বাহিনী গঙ্গার তীরে প্রতিষ্ঠিত, সূর্য্য কিরণে সমুদ্ভাসিত, সহস্র সহস্র মন্দির চূড়া বিশিষ্ট কাশীধাম দেখিয়া বস্তুতঃই বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়াছিলাম! বিশেষতঃ কাশীর মধ্যভাগে দুইটি গগনস্পর্শী মসজিদের মিনার সর্ব্বপ্রথমে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। নিম্নে উত্তর বাহিনী, পুণ্যসলিলশীতলা গঙ্গা বিলোল তরঙ্গ রঙ্গে, সৈকত-চুম্বিত অঙ্গে প্রবাহিত হইতেছেন। সম্মুখে হেমাম্বুদ কিরীটিনী ঊষার ন্যায় রক্তিমাভ সৌরকরোজ্জ্বল নগরী রজত হিল্লোলময় জাহ্নবী দর্পণে অনিন্দ্য-সৌন্দর্য্য ছটায় প্রতিবিম্বিত হইতেছে—এ দৃশ্য দেখিয়া কাহার প্রাণ আকুল না হয়?

ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে নামিয়াই একখানি এক্কা ভাড়া করিয়া সরাসরি গুরুধামে ভূকৈলাস রাজবাটীতে স্বামী জ্ঞানানন্দ ও স্বামী দয়ানন্দের সহিত সাক্ষাত করিতে গেলাম। চিরদিন সংসার আশ্রমে লালিত পালিত, সন্ন্যাসীর মাহাত্ম্য কি বুঝিব? দেখিলাম সদা হাস্যোজ্জ্বল একজন দীর্ঘ শ্মশ্রুবিলম্বিত সুন্দর স্থানে মহাপুরুষ দালানের বারান্দায় দাঁড়াইয়া স্নানসিক্ত জটাজুট শুকাইতেছেন। আমার তখনও শ্মশ্রুগুম্ফের রেখা দেয় নাই, উদ্ভিন্ন যৌবন তরুণ যুবকমাত্র। রাজবাটীর ফটকদ্বারে এক্কা আসিবামাত্র সকলেই উৎসুক ভাবে আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তখন স্বামী জ্ঞানানন্দ ও দয়ানন্দ মহারাজ—উভয়েই গুরুধামস্থ ভূকৈলাশের রাজবাটী লীজ লইয়া মহামণ্ডলের উপদেশক মহাবিদ্যালয় খুলিয়া তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। স্থানটি দুর্গাবাড়ীর অতি নিকট, বিজাপুর রাজবাটীরও অনতিদূর। অতি শান্ত, স্নিগ্ধ, তপোবনের ন্যায় পবিত্র সে স্থান। সাধনার পক্ষে এ স্থান অতি রমণীয় তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে?

আমি স্বামী দয়ানন্দ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী, একথা বলিতেই একজন হিন্দুস্থানী উপদেশক গিয়া স্বামীজিকে সংবাদ দিল। স্বামিজী তৎক্ষণাৎ দ্বিতল হইতে নীচে আসিয়া আমাকে যেন আমি তাঁহার বহুদিনের পরিচিত

শিষ্য এই ভাবে একটু মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি আজই আসিবে, একথা পূর্ব্ব হইতে আমাকে জানাইলে আমি ষ্টেশনে লোক রাখিতাম।"

যাহা হৌক, স্নানাহ্নিক শেষ করিয়া ও স্বামিজী মহারাজের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বেলা ২টা বাজিতে না বাজিতেই আমি কাশীতীর্থ দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। সঙ্গে গেলেন আমার ভাবী কয়েকজন সহপাঠী।

পথে যাইতে যাইতে ভাবিলাম, এই কাশীধাম নিতান্ত সামান্য স্থান নহে। এ যে কত শতাব্দী হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। এই কাশীধামেই ভক্তপ্রবর তুলসী দাস রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, এইখানে কুল্লুকভট্ট মনুসংহিতার টীকা, মহামতি যাস্ক নিরুক্তের টীকা ও পণ্ডিত প্রধান পাণিনী ব্যাকরণ সূত্র জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। এই পুণ্যধামেই কাপলি তাঁহার সাংখ্যদর্শন রচনা করিয়া সমগ্র ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন। এখানে মহামুনি গৌতম ন্যায়শাস্ত্র প্রচার করিয়া জ্ঞানের অপূর্ব্ব জ্যোতিতে পৃথিবীকে বিস্মিত ও বিমোহিত করিয়াছিলেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই পুণ্য-তীর্থেই বেদান্তের ভাষ্যও টীকা রচনা করিয়াছিলেন। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গও এই পুণ্যতীর্থে আসিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্লাবনে কাশীধামকে প্লাবিত করিয়াছিলেন। সুতরাং এই কাশীধামের প্রতি রেণুকণা আমার কাছে যে কত পবিত্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সুকঠিন।

কাশীধামের পূর্ব্বপ্রান্তে বরুণাও পশ্চিমপ্রান্তে অসি নামে দুইটি নদী প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। সেইজন্য ইহার নাম "বারাণসী।" আনন্দকানন, মহাশ্মশান, স্বর্গপুরী, অপুনর্ভব ভূমি, রুদ্রাবাস, আনন্দবন, তীর্থরাজ্ঞী, তপস্থলী, কাশী, কাশিকা বারাণসী ও বরণসী কাশীধামের আরও এতগুলি নাম আছে। কেহ বলেন যে, বহুকাল পূর্ব্বে বরণার নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন, তাঁহারাই নামানুযায়ী কাশীর নাম "বারাণসী" হইয়াছে। প্রসিদ্ধ চীন পর্য্যটক হুয়েন্থ সাংয়ের ভ্রমণ বৃত্তান্তে কাশীকে "পোলনিশি" নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মতে আয়ুরংশীয় সুহোত্র রাজার পুত্র কাশ—কাশীর প্রথম হিন্দু রাজা। তাঁহার পুত্র কাশীরাজ কাশ্য। এই কাশীরাজ হইতেই সম্ভবতঃ কাশী শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

পুরুবংশীয় ছাব্বিশজন রাজা কাশীধামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। শাক্যকুল-তিলক ভগবানাবতার বুদ্ধদেবের সময়ে দেবদত্ত নামক এক হিন্দু নৃপতি কাশীর

অধীশ্বর ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাধান্যের ও প্রাবল্যের সময় কাশীধাম বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী মগধরাজগণের শাসনাধীনে আসে। তারপর প্রদ্যোৎ বংশীয় রাজন্যগণ একশত বৎসরের উপর কাশীধামে রাজত্ব করিলে শিশুনাগ নামে জনৈক রাজা কাশীর রাজা হন। মগধরাজগণের পতনের পর খুব সম্ভব গুপ্ত বংশীয়েরা কাশীর অধিপতি হন। তারপর খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে গৌড়ের পালবংশীয় রাজগণ কাশীতে রাজত্ব করেন। গৌড়াধিপ মহীপালই কাশীর পাল বংশীয় প্রধান নৃপতি। কাশীর নিকট শারনাথে মহীপালের একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠে জানা যায় যে মহীপাল নামক গৌড়াধিপতি কাশীর অধীশ্বর ছিলেন। বহুকাল যাবত কাশী বাঙ্গালা ও মগধের রাজন্যবর্গের শাসনাধীনে ছিল।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চীনপর্য্যটক ফা-ইয়ান কাশী রাজ্যের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৩৩৩ ক্রোশ দেখিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

এক সময়ে জয়চন্দ্র বারাণসীর অধিপতি ছিলেন। তিরৌরির যুদ্ধে যখন মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজকে হত্যা করেন সেই সময়ে মহম্মদঘোরীর সেনাপতি কুতবুদ্দীন ও জয়চন্দ্রকে নিহত করিয়া কাশীধামে আগমন করেন এবং কাশীর অম্বরচুম্বী সহস্র সহস্র মন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করেন। সেই সময় হইতে সম্রাট আকবরের সিংহাসনারোহনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাশীধামে বিশেষ অশান্তি ও উপদ্রব ছিল। কিন্তু নিরপেক্ষ সম্রাট বুন্দীর সর্দ্দার রাও সুজন সিংহকে কাশীর শাসক করিয়া পাঠানতে সেই সর্দ্দারেরর চেষ্টায় কাশীর উপর মোগল পাঠানের তাণ্ডবলীলার অবসান হয়। জাহাঙ্গীরের আত্ম জীবনীতে (Private memoir of Jahangir) আছে সম্রাট জাহাঙ্গীর কাশীতে ন্যূনকল্পে দেড় হাজার দেবমন্দির ও অসংখ্য প্রাসাদ দেখিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের আমলে কাশীর উপর কোন অত্যাচার হয় নাই। পরবর্ত্তী সম্রাট শাহজাহানের সময় তিনি তাজমহাল নির্ম্মানার্থে যে সমস্ত ভাস্কর ও শিল্পী নিয়োগ করিয়াছিলেন সেই সমস্তকে আনিয়া হিন্দু রাজন্যগণ কাশীর মন্দিরাদির সংস্কার করেন। তারপর দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। অত্যাচারী সম্রাট আওরেঙ্গজেব। তিনি বেণীমাধবের মন্দির ভগ্ন করিয়া সেই স্থানে একটি সুউচ্চ মিনার সম্বলিত মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার কলঙ্কময় জীবনকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখেন। আওরেঙ্গজেব কাশীর নাম বদলাইয়া "মহাম্মাদাবাদ" রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সুখের বিষয় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ তাঁহার এই যাবানিক নামে শত অত্যাচারেও কাশীধামকে অভিহিত করে নাই।

১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহআলম ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কাশীরাজ্য প্রদান করেন। এই সময় হইতে রাজা বলবন্ত রায় ইংরাজ দিগের মিত্ররাজ বলিয়া পরিচিত হন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র রাজ চেৎসিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া হেষ্টিংসের হাতে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তৎপর ঐ বংশের মহীপ নারায়ণ রাজা হন। তাঁহার বংশধরগণই বর্ত্তমানে কাশীর সামন্ত নরপতি।

প্রথমেই অসি ঘাটে গিয়া দেখিলাম ওপারে কাশী মহারাজের প্রাসাদ। তাহার নিকট বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি সম্বলিত রামনগর মন্দির। এখানে রাম-লীলা উৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। তথা হইতে কয়েকজনে মিলিয়া ছোট একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে রওনা হইলাম। পথে বাধিল লালামিশ্রঘাট, আকরুলঘাট, শিবালয়ঘাট, দণ্ডীঘাট, হনুমান-ঘাট, মশানঘাট, লালীঘাট, কেদারঘাট, চৌকীঘাট, রাজাঘাট, নারদ-ঘাট, শোমেশ্বরঘাট, পাঁড়েঘাট, নন্দঘাট, ছত্রঘাট, বাঙ্গালীটোলাঘাট, গুরুপান্তঘাট, চোষট্টিযোগিনীঘাট, রাণামহালঘাট, মুনসীঘাট, অহল্যাবাঈ-ঘাট, দশাশ্বমেধঘাট। দশাশ্বমেধঘাট ছাড়াইয়া আমরা মানমন্দিরঘাট, প্রয়াগঘাট, ঘোড়াঘাট, ভৈরবঘাট, মীরঘাট, ললিতাঘাট, নেপালঘাট, সিন্ধিয়াঘাট, পঞ্চগঙ্গাঘাট প্রভৃতি ছাড়াইয়া মণিকর্নিকা ঘাটে আসিলাম। তারপর রাজ-ঘাটই সমধিক প্রসিদ্ধ।

কেদারঘাটের উপর কেদারনাথের রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত সুবৃহৎ মন্দির। কেদারঘাট অতি খাড়া, উঠিতে—অতি বড় যোয়ান মরদকে হাঁপাইয়া পড়িতে হয়।

দশাশ্বমেধ ঘাট কাশীর সর্ব্বপ্রধান পঞ্চঘাটের অন্যতম। পুরাণে লিখিত আছে যে পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই ঘাটে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া এই ঘাটের নাম "দশাশ্বমেধ" ঘাট হইয়াছে। দশাশ্বমেধ ঘাটের দৃশ্য অনেকটা কলিকাতার জগন্নাথ ঘাটের ন্যায়।

মানমন্দিরের ঘাটের উপর মহারাজ জয়সিংহের সময় নিরূপক মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দির দেখিলে এবং ইহার সেই প্রাচীন ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত বৃত্তাদি দেখিলে অতীত ভাস্কর্য্যের গৌরব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

তারপরই চির পবিত্র মণিকর্নিকা মহাশ্মশান। এই মণিকর্নিকার অপর নাম "চক্রতীর্থ" এখানে শ্বেত প্রস্তর রচিত বিষ্ণুর চরণ পাদুকা চিহ্ন রক্ষিত।

কাশীধাম বহু সংখ্যক শিবমন্দির মালায় বিভূষিত অনুমান দশ লক্ষাধিক শিবলিঙ্গ নানা আকারে এই মহাতীর্থে বিরাজমান। তন্মধ্যে বিশ্বনাথের মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। বিশ্বনাথের পুরাতন মন্দির ভাঙ্গিয়া দিয়া আওরেঙ্গজেব সেখানে মসৃজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র কুলতিলক বাজীরাও পেশোয়া বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মহারাজ রণজিৎসিংহ মন্দিরের উপরিভাগ সুবর্ণ মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন। মহারাণী অহল্যা বাঈ ও অনেক অর্থব্যয় করিয়া মন্দিরটির শিল্প-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন। সুবর্ণ মন্দির ও আওরেঙ্গজেব নির্ম্মিত মসজিদের মধ্যভাগে জ্ঞান বাপীকূপ। প্রবাদ এইরূপ যে কালাপাহাড় কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইবার ভয়ে বিশ্বেশ্বর ঐ কূপের মধ্যে লুকাইয়াছিলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়রের মহারাণী জ্ঞান বাপীর উপর সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট চল্লিশটি স্তম্ভসমন্বিত একটি চন্দ্রাতপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মন্দিরের ভিতরে সম-চতুষ্কোণ বেষ্টনীর মধ্যে বাণলিঙ্গ বিশ্বনাথ বিরাজিত। সকল সময়েই বিশ্বনাথ পুষ্প বিল্বদল ও গঙ্গাজলের মধ্যে ডুবিয়া থাকেন। বিশ্বনাথের মন্দির যাইবার পথে দক্ষিণে অন্নপূর্ণার মন্দির। মা আমার অন্নপূর্ণা, তাই মায়ের দয়ায় কেহ কাশীধামে অভুক্ত থাকে না। অন্নপূর্ণার মন্দিরের পর বৃদ্ধ কালেশ্বরের মন্দির। ইনিই নাকি কাশীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন দেবতা। তারপর মানস সরোবর, তিলভাণ্ডেশ্বর, শূলটঙ্কেশ্বর, কালভৈরব, নবগ্রহ মন্দির, কালকূপ, সঙ্কটাবিরেশ্বর, সূর্য্যকুণ্ড, বটুকভৈরব, বৈদ্যনাথ, বিশালাক্ষী প্রভৃতি দর্শন করিয়া গুরুধামের নিকট দুর্গা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। এখানে শাক্তমতে মায়ের পূজা হয় এবং অকাতরে ছাগবলি হইয়া থাকে। বানরের উপদ্রবে এখানে কাহারও রিক্তহস্তে আসিবার যো নাই। কিছু না কিছু বানরদিগকে না দিলে যাত্রীর প্রতি তাহারা বড়ই রুষ্ট হয়। আবার একটা সামান্য কদলী পাইলেই মহাখুসী হইয়া চলিয়া যায়। পরদিন আবার ভ্রমণে বাহির হইয়া অনেক কুণ্ড দেখিতে পাইলাম। কূপ ও স্বল্প পরিসর বারি উদ্গীরণকারী উৎসকেই এখানে কুণ্ড বলে। তাহা ছাড়া পুষ্করিণীও অনেকগুলি দেখিলাম। আর দেখিলাম মোসলমানের মসজিদ! যাহারা বলে হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মকে ঘৃণা করে তাহারা একবার কাশীধামে গিয়া দেখিয়া আসুক কেমন শান্তির সঙ্গে হিন্দু তার মন্দিরে ও মুসলমান তার মসজিদে ভগবানের উপাসনা করিতেছে।

কাশীধামে বার মাসে তের পার্ব্বণ নিত্য উৎসব লাগিয়াই আছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উৎসব হয় দোল পূর্ণিমার পর প্রথম মঙ্গলবারে "বুড়া মঙ্গল" উৎসব।

সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের মুমুক্ষু, স্নানার্থী যাত্রীগণের যে ভিড় কাশীতে দেখিয়াছিলাম, তেমন জনতা জীবনে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সে সময় গঙ্গা-তীরে একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত শুধুই কেবল মানুষের শির। প্রতি সন্ধ্যায় বিশ্বনাথের আরতি একটি দেখিবার জিনিস। সন্ধ্যাকালে যখন দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, সিদ্ধি ও চন্দন দ্বারা ভগবান বিশ্বনাথের অঙ্গ মর্দ্দন করিয়া শ্বেত চন্দনে তাঁহাকে বিভূষিত করিয়া, দশজন ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণ গোলাকারে বসিয়া ঘৃতকর্পূরে প্রজ্জ্বলিত দীপাধার লইয়া "শিব শিব শম্ভো" বলিয়া তাঁহার আরতি করেন। তখন মনে হয় না যে আমরা ভূমণ্ডলে—সত্যই যেন কৈলাশের প্রত্যক্ষ ছবি তখন মানস-নয়নে প্রতিভাত হয়।

বহুদিন হইল কাশীধাম হইতে আসিয়াছি। জীবন সায়াহ্নে আর সেই মুক্তিক্ষেত্রে যাইয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করিতে পারিব কিনা জানি না। কিন্তু যখনই "কাশীর" কথা মনে হয় তখনই প্রাণটা যেন কেন হঠাৎ ব্যাকুল হইয়া উঠে। সেই ব্যাকুলতার বশেই আজ কাশীস্মৃতি লিখিলাম।

হিন্দু-জাতি ধ্বংসের পথে।

লেখক—ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদ।

হিন্দু জাতি আজ ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, তাই হিন্দু আজ ধ্বংসোন্মুখ জাতি বা dying race বলিয়া চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, চারিদিকে কিছু কিছু আন্দোলনও চলিতেছে. কিন্তু ইহার কারণ নিরূপণ বা প্রতিকারের কোন উপায় দেখা যাইতেছে না।

হিন্দুর বৃদ্ধির হার হ্রাস পাইতেছে কিন্তু মুসলমানের বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ বাড়িতেছে সুতরাং উভয় জাতির সামাজিক ও সাংসারিক রীতিনীতির আলোচনা করিতে পারিলে বোধহয় এ সমস্যার কতক মীমাংসা হইতে পারে।

গত আদমসুমারীর হিসাব হইতে দেখা যায় বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা ২০৮০৯১৪৮ এবং মুসলমানের ২৬৪৮৬১২৩, সুতরাং হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ৫৬৭৬৯৭৬ জন। কিন্তু ৫০বৎসর পুর্ব্বে এরূপ ছিল না, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হিন্দুর সংখ্যা

১৭১ লক্ষ এবং মুসলমানের ১৬৭ লক্ষ ছিল, অর্থাৎ মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু ৪ লক্ষ বেশী ছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু ১৭২॥০ লক্ষ এবং মুসলমান ১৭৯ লক্ষ ছিল। এই নয় বৎসরেই মুসলমান হিন্দু অপেক্ষা ১৬ লক্ষ বেশী হইয়াছে, তাহার পর প্রতি দশ বৎসর হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান দশ লক্ষ করিয়া বাড়িয়াছে। মুসলমানের বৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার এস্থলে প্রয়োজন নাই, কিন্তু হিন্দুর বৃদ্ধির হার যেভাবে কমিয়া যাইতেছে তাহাতে দূর ভবিষ্যতে এ জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আশঙ্কা করিবার যথেষ্ঠ কারণ আছে। গত ৪০ বৎসরে মুসলমান বাড়িয়াছে শতকরা ৩৮৴৫ ভাগ কিন্তু হিন্দু মাত্র ১৫৴২ সুতরাং হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের বৃদ্ধির হার গড়ে দ্বিগুণেরও বেশী।

কেন এরূপ হয়? মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে, হিন্দু সমাজে নাই, মুসলমানের ইহা বংশ বৃদ্ধির একটা কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন। গত আদমসুমারী হইতেই দেখা যায় হিন্দু বিধবার সংখ্যা ২৫২৮৮০৩. মুসলমান বিধবার সংখ্যা ১৯২৪০১১ অর্থাৎ মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু বিধবার সংখ্যা ৬০৪৭৯২ বেশী। মুসলমান বিধবাদের মধ্যে গণনার সময় যাহারা সদ্যবিধবা হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশেরই পুনরায় নিকা করিবার সম্ভাবনা, বস্তুতঃ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মুসলমানের অধিকাংশ বিধবাই পুনরায় বিবাহ করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে হাজার করা ১৮০ জন স্ত্রীলোক বিধবা কিন্তু বিলাতে হাজার করা ৭০ জন, হিন্দু সমাজে ১৫ বৎসরের অর্থাৎ সন্তান উৎপাদনের পূর্ব্বেই হাজার করা ৩০ জন বালিকার বৈধব্যযন্ত্রণা আরম্ভ হয়।

মুসলমানদিগের বিধবা বিবাহ প্রচলন থাকায় বেশ্যার সংখ্যা কম দেখা যায়, অথচ হিন্দুর মধ্যে প্রকাশ্য এবং গোপন বেশ্যার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। ভ্রূণহত্যারূপ মহাপাপে যে হিন্দু ক্রমশঃ ডুবিয়া যাইতেছে তাহাও বোধহয় বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না।

বিধবা বিবাহের অ-প্রচলন হিন্দু জাতির অধঃপতনের অন্যতম কারণ কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। হিন্দুধর্ম্মে যাহারা অতিরিক্ত আস্থাবান এবং বিধবা বিবাহের বিরোধী, তাহারা উদাহরণ দিয়া বলিবেন, হাড়ি, ডোম, মুচি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে এবং জোলা, পটুয়া, নিকারি প্রভৃতি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তো আছেই কিন্তু তাহাদের (উভয় সম্প্রদায়ের) সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। সুতরাং বিধবা বিবাহের অ-প্রচলন বংশ হ্রাসের কারণ কেন হইবে?

এ যুক্তির খণ্ডন সহজেই করা যাইতে পারে। উপরি উক্ত জাতি সমূহের অধঃপতনের অন্য কোন গুরুতর কারণ থাকিতে পারে যাহার বিষয় আমরা পরে আলোচনা করিব। বিধবা বিবাহ বংশ বৃদ্ধির হেতু নহে এরূপ মত পোষণ করা সমীচিন বলিয়া বোধহয় না, তবে হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ চলিতে পারে কিনা অথবা যে স্থলে কুমারী বিবাহের জন্য পাত্র মিলে না, সেখানে বিধবা বিবাহ কেমন করিয়া চালান যাইতে পারে তাহার মীমাংসা করা আমাদের কার্য্য নহে। সমাজের সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন।

নিম্নজাতির প্রতি উচ্চজাতির বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের তুচ্ছ ব্যবহারের ফলে অনেকে হিন্দুধর্ম্মের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মাঝে মাঝে সংবাদ পাওয়া যায়। ইহা আংশিক সত্য হইলেও ইহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং ইহার চিকিৎসা আয়াসসাধ্য। আজ জগতের মহাপরিবর্ত্তনের দিনে উন্নত দ্বিজাজাতি একটু উদার হইলেই এ ব্যাধি সহজে প্রশমিত হইতে পারে।

পূর্ব্বে যে সমস্ত নীচ হিন্দু এবং মুসলমানের কথা বলা হইয়াছে তাহাদের অধঃপতনের একমাত্র কারণ তাহাদের বৃত্তিহীনতা বলিয়া মনে হয়। ইহাদের অনেকেই চাষাবাদ করে না, যাহাদের কোনরূপ অবলম্বন আছে এই ভীষণ জীবনসংগ্রামে তাহারাই অতিকষ্টে টিকিয়া আছে। কিন্তু যাহাদের কোন অবলম্বন নাই, দারিদ্র্যের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিতে করিতে তাহারা এমনই হীনবল হইয়া পড়িয়াছে যে একটা সামান্য মহামারীতেও নিতান্ত অসহায়ের ন্যায় সপরিবারে নিধনপ্রাপ্ত হইতেছে। গত ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে এইরূপ "পল্লীকে পল্লী" উজাড় হইবার দৃষ্টান্ত বহুলপরিমাণে পাওয়া যায়।

হিন্দুর অধঃপতনের অন্যতম কারণ দারিদ্র্য বলিয়া অনেকে মনে করেন। মুসলমানদের অধিকাংশই নিজ হাতে চাষাবাদ করে, আর কিছু না জুটিলেও অন্ততঃ দুবেলা দু'টী অন্ন অনেকে পেট ভরিয়া খাইতে পায়। আর আজ অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দুর অবস্থা কি? অভিভাবকের কষ্টার্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া স্কুল কলেজ ছাড়িয়া যখন সংসারের পথে আসিয়া দাঁড়ায় চারিদিকে চাহিয়া দেখে শুধুই অন্ধকার। কোন দিকে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। চাকরী মিলে না, ব্যবসায় করিতে জানে না, শিল্পশিক্ষার সহিত কোন

সংশ্রব নাই, লাঙ্গলের মুঠা ধরিবার ক্ষমতাও নাই, সে প্রবৃত্তিও শিক্ষিতের হৃদয়ে স্থান পায় না, তবে তাহার উপায় কি? ঘরে হাহাকার অথচ বাহিরে কোচার পত্তন না করিলে মানমর্য্যাদা ঠিক থাকে না। উপবাসী থাকিয়াও বাহিরে মুখের হাসি দিয়া হৃদয়ের দুর্ব্বলতাকে প্রাণপনে ঢাকিতে হইবে। এই দারিদ্র্য সমস্যার জন্য হিন্দু আজ উদরচিন্তারূপ তুষানলে পলে পলে দগ্ধ হইতেছে, হিন্দুকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয় তবে এই সমস্ত সমস্যারই সুমীমাংসা করিতে হইবে।

———0———

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩৩শ বর্ষ, ৩৩শ খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা। | শ্রাবণ। | ১৩৩৩ সাল। ১৮৪৮ শকাব্দাঃ

দেখা।

লেখক—শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্।

(১)

আঁখি সারা বিশ্ব দেখে, তোমাকে দেখে না শুধু!
শুধু জড়ে মত্ত মন-ভৃঙ্গ পান করে মধু!!!
সংস্কার-সমষ্টি-ভূত, সুধাই, মলিন মনে,—
"দেখিলে যাঁহাকে, দেখা হয় এই ত্রিভুবনে;
কোটি-রবি-ঘন দীপ্তি, চিদাকাশে যে উদয়;
শান্ত, স্নিগ্ধ ভর্গ মোর, সন্ধান কর কি তায়?"

(২)

অবিদ্যা-মলেতে ঢাকি' চিতের শাশ্বত-দীপ্তি,
দশেন্দ্রিয় সাথে ধাও সংসারে লভিতে তৃপ্তি,

ভ্রান্ত মন! সাথে ল'য়ে সে দুর্ব্বার অহঙ্কার,
বুদ্ধিকে পাড়ায়ে ঘুম ;—এ কি খেলা চমৎকার !!!
আরো চমৎকার কথা—নিজ ভ্রম নাহি জানে ;
না মানে বুঝালে ভ্রম,—অঘটন মায়া-টানে !!!
তেঁই নিত্য অপকর্ম্ম, নিত্য সাধু-সঙ্গাভাব,
ভগবৎ চিন্তাশূন্য, ভ্রমিতেছি মূর্ত্ত দাব!
তাই, যিনি অন্তরের দেবতা জাগ্রত রুদ্র,
মহাযোগী মত, আজি আছেন তামস-নিদ্র ;
(তাই) আঁখি সব দেখে, সুধু তাঁহাকে দেখে না কভু—
(তাই) সুখ-আশে ভ্রমি, কিন্তু কোথা সুখ ছাড়ি' বিভু ?

(৩)

হে আনন্দময় দেব! হে গুরু বিজ্ঞানময়!
প্রবল ইন্দ্রিয় দশে নিত্যকর্ম্মে করি' জয়,—
এই বল দাও নাথ ; তা'র পরে, দয়াময়,
বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ কর, অহঙ্কার কর লয়!
চিত্তের স্ফটিক কান্তি মনকে মিলায়ে দাও,—
সেই চিতে সর্ব্বজ্ঞান নিত্য—তা' দেখায়ে দাও!
নিতি এই জড়দেহে দশেন্দ্রিয়ে মুগ্ধ করি,
ইন্দ্রিয়-সুষুপ্তি-কালে-আত্মায় রমণ করি,
নিত্য তব যোগ রাখ—দুর্লভ নহ ত তুমি—
সদা আছ সাথে সাথে ; জন্ম জন্মান্তরে ভ্রমি,
দুবাহু বাড়ায়ে আছ, আলিঙ্গিতে স্নেহ-ডোরে,—
অহঙ্কারে মত্ত আমি, ত্যজি স'রে আছি দূরে !!!

(৪)

বাজাও গো চিদাকাশে সত্যের বিশুদ্ধ তন্ত্র!
জ্বালাও সেথায় শুদ্ধ-জ্ঞান-হোম শিক্ষা- মন্ত্র!
অহঙ্কার-ইন্ধনেতে ঢাল শুদ্ধ-বুদ্ধি হবি,
সে যজ্ঞে সবিতা ভর্গ দেখাও বিশ্বের করি !!!
সেই দিন দশেন্দ্রিয় আর নাহি রহিবে অরি ;
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার চিদাকাশ আলো করি,

ভাতিবে বিজ্ঞান শুদ্ধ পরম আনন্দ-আশে !
তার পর —ভাষা মূক পরম আনন্দাবেশে !!!

(৫)

দুর্দ্দম ইন্দ্রিয়গণ নিগ্রহে আপন হয় ;
নিগ্রহেতে মন বুদ্ধি অহঙ্কার মিত্র হয় ;
সেই স্থূল-আঁখি সাথে অবিদ্যা-আশ্রিত-বুদ্ধি
তোমা ছেড়ে, তব বিশ্বে হেরিতে করিত বুদ্ধি,
অবিদ্যা-মথিত সেই অস্থির মনের ভূমি
বিজ্ঞান-বিভায় দীপ্ত, নির্ম্মল করিলে তুমি,
তবে ত তোমাকে হেরি,' পাবে সর্ব্ব-দরশন—
বাহির হইলে অন্ধ, পূরে ভাতে দীপ্তি ঘন !
দৃষ্টি হ'তে লুপ্ত চাঁদ, অন্তর জ্যোছনা ময় !
তাই মাতা কালোরূপে স্থধু আলো-আলোময় !!!

হিন্দুর বিবাহ সংস্কার।

লেখক—ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু কাব্যবিনোদ সাহিত্যভূষণ।

কত বয়সে কন্যার বিবাহ হওয়া উচিত, এই বিষয় লইয়া ইদানীং অনেক আন্দোলন চলিতেছে। যাহার যেরূপ অভিরুচি তিনি সেইরূপই মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু কোন্ মত সমীচিন তাহা একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় মানবের আদিম অবস্থায় বিবাহ প্রথা আদৌ প্রচলিত ছিল না, পুরুষ যে কোন নারীতে উপগত হইত। কে কাহার ঔরসজাত সন্তান তাহার নির্ণয় হইত না, অনেক দেবতার নাম মাতার নাম হইতে হইয়াছে যেমন অদিতির পুত্র আদিত্য, দিতির পুত্র দৈত্য, বিনতার পুত্র বৈনতেয় ইত্যাদি। বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইলেও প্রথম অবস্থায় রাক্ষস, পৈশাচ, আসুরিক ইত্যাদি অপকৃষ্ট বিবাহই সংঘটিত হইত। সভ্যতার ক্রমঃবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রথা লুপ্ত হয়।

আমরা পৌরাণিক যুগে দেখিতে পাই একমাত্র গৌরীর অষ্টম বর্ষ বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, আর প্রায় সকলেই পরিণত বয়সে পাত্রস্থা হন। রামায়ণ মহাভারতের যুগেও একমাত্র সীতা তাহার ভগিনীগণ ভিন্ন অন্য কাহারও অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্বকালে যুবকযুবতীগণ অনেকস্থলে পরস্পর মনোনয়ন করিয়া বিবাহ করিত। এই রীতিই গান্ধর্ব্ববিবাহ আখ্যায় প্রচলিত হইয়াছিল। সাধ্বীসতীর আদর্শস্থল সাবিত্রীর বিবাহও এই মতে হইয়াছিল বলিয়া বোধহয়; কারণ বনপর্ব্বে দেখিতে পাই তাহার পিতা বলিতেছেন—

পুত্রি প্রদানকালস্তে ন চ কশ্চিৎবৃণোতি মাং।
স্বয়মন্বিষ্য ভর্ত্তারং গুণৈঃসদৃশমাত্মনঃ॥
প্রার্থিতঃ পুরুষো যশ্চ সনিবেদ্যস্তয়া মম।
বিমৃশ্যাহং প্রপস্যামি বরয়ত্বং যথোস্পিতং॥

হে পুত্রি! তোমার বিবাহকাল উপস্থিত অথচ আজও পর্য্যন্ত কেহ আমার নিকট তোমার পাণিগ্রহণ প্রস্তাব করিল না। সুতরাং তুমি নিজে অন্বেষণ করিয়া আত্মসদৃশ পতি নির্ণয় কর, এবং এই পত্রি কে তাহা আমাকে জানাও, উপযুক্ত বিবেচনা করিলে তাহাতে আমি অনুমোদন করিব।

মহাভারতের যুগে স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল। সুতরাং স্বামীনির্ব্বাচনের ক্ষমতা না হইলে তাহাদের বিবাহ হইত না। রাজপুত জাতিও পৌরাণিক যুগের অনুকরণে অধিক বয়সে মেয়ের বিবাহ দিত, এই সমস্ত উদাহরণ দেখাইয়াই বোধ করি সমাজের উন্নতিকামী বিবাহসংস্কার সমিতি যুবতীবিবাহের একান্ত পক্ষপাতী। কিন্তু দেশকাল পাত্রের উপর লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন তাহারা কিছুমাত্র মনে করেন না। তাহারা বলেন বাল্যবিবাহে শারীরিক অধোগতি, দারিদ্র্যবৃদ্ধি, বালিকাদের শিক্ষার সুযোগহানি ইত্যাদি ঘটিতেছে। আজকাল অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকও বলিয়া থাকেন, অল্প বয়সে পুনঃ পুনঃ সন্তান প্রসবের হেতু হিন্দু রমণীরা অকালে বার্দ্ধক্যে উপনীতা হইয়া কালকবলিতা হইতেছেন। বাঙ্গালা দেশে ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়স্কানারীর মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ১৯২১ সালের আদমসুমারী হইতে জানা যায় প্রসূতির মৃত্যুর হার ভয়াবহ। শতকরা ৮ হইতে ১০ জনের মৃত্যু, সন্তান প্রসবের ফলেই ঘটিয়া থাকে এবং মৃত প্রসূতিদের মধ্যে শতকরা ৫০ হইতে ৬০ জনের বয়স ১৫ হইতে ২০এর মধ্যে। বিবাহিতা যুবতীদের এইরূপ ধ্বংসের প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ বলিয়া

অনেকে মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদের মাতা পিতামহী প্রপিতামহীদের কোন্ বয়সে বিবাহ হইয়াছিল? ছ'মাস এক বৎসর বয়স্কা বালিকা বিবাহ হইত—সে বড় বেশী দিনের কথা নহে। কুলীন কায়স্থ কন্যার তখন এতই অনটন ছিল যে সন্তান জননীজঠরে থাকিতেই—কন্যা হইলে বিবাহ দিতে হইবে বলিয়া চুক্তিপত্র হইয়া যাইত। (আর আজ কালের কি দ্রুত পরিবর্ত্তন!) অথচ তাহারা পূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া গৃহের লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা গৌরীদানেরও পক্ষপাতী নহি।

এখনও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় কন্যাপণ প্রচলিত থাকাতে অনেক বালিকার অল্প বয়সে বিবাহ হয় অথচ তাহাদের স্বাস্থ্য যেন দুর্ভেদ্য কবচে রক্ষিত, শিক্ষিতা ভদ্র মহিলার ন্যায় ভগ্নপ্রবণ নহে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়াও কি বলিতে হইবে বাল্য বিবাহই হিন্দু রমণীর ভগ্নস্বাস্থ্যের একমাত্র কারণ? বর্ত্তমান সময়ে উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব কে অস্বীকার করিবে? ইদানীং কয়টী গৃহস্থের ঘরে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ এবং গব্যঘৃত দেখিতে পাওয়া যায়? পূর্ব্বে যে পরিমাণ মৎস্য পাওয়া যাইত, এখন তাহার শতাংশের একাংশও পাওয়া যায় কি? মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের ঘরে যে পরিমাণে মাছ তরকারী ইত্যাদি আসিয়া থাকে, তাহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুরুষদের ভোগ হইয়া মেয়েদের পর্য্যন্ত পৌঁছে না, সুতরাং গৃহ লক্ষ্মীরা পুরুষদের পাতে সমস্ত সমর্পণ করিয়া নিজেরা খুন্নিবৃত্তির জন্য প্রায়ই ছাইভস্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইভাবে বিন্দু বিন্দু করিয়া তাঁহারা মরণের পথে অগ্রসর হন। এই সংবাদ কয়জনে রাখিয়া থাকেন? হিন্দু রমণীর স্বাস্থ্যহানির অনেক কারণ আছে, বাল্য বিবাহের দোহাই দিলে চলিবে না।

বাল্যবিবাহে দারিদ্র্যবৃদ্ধি হয় একথা বাতুলের প্রলাপমাত্র. অল্প বয়সে বিবাহ দিলে বংশবৃদ্ধি হইবে, সুতরাং তাহাতে দারিদ্র্য অনিবার্য্য একথা যাহারা বলেন, তাহাদের জন্য মধ্যম নারায়ণ তৈলের ব্যবস্থা করিতে হয়। ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু জাতির বংশবৃদ্ধি কি বাঞ্ছনীয় নহে? বংশবৃদ্ধি যাহাতে না হয়, সেই চেষ্টা না করিয়া যাহাতে বংশবৃদ্ধি হয় এবং সেই বর্দ্ধিত বংশের ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত ধনবৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করাই কি বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে?

বাল্যবিবাহে বালিকাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যাঘাত হয়, এই কথা যুবতী বিবাহের পক্ষপাতীর দল বলিয়া থাকেন। পুরুষ এবং রমণী উভয়ের কার্য্য-ক্ষেত্র বিভিন্ন; সুতরাং উভয়েরই একইপ্রকারের শিক্ষার প্রয়োজন দেখিতে

পাওয়া যায় না। একথা ইউরোপীয়েরাও আজকাল স্বীকার করিয়া থাকেন। সংসার প্রতিপালনের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন তাহা বিবাহের পূর্ব্বেই হইতে পারে। ইচ্ছা এবং যত্ন থাকিলে বিবাহের পরেও অনেক শিখিবার অবসর পাওয়া যায়।

যাহা হউক, আমাদের আলোচ্য বর্ত্তমানে কিরূপ বয়সে মেয়েদের বিবাহ হওয়া উচিত। পৌরাণিক যুগের অনুকরণ যে চলিতে পারে না তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখাইব।

পুরাকালে যুবতীবিবাহের প্রচলন থাকিলেও নগ্নিকা অর্থাৎ যে কন্যা রজস্বলা হয় নাই, এইরূপ কন্যাই বিবাহে শ্রেষ্ঠা বলিয়া পরিগণিত হইত। মহর্ষি গোভিল তাঁহার গৃহ্যসূত্রে বলিয়াছেন নগ্নিকা কন্যাই বিবাহে প্রশস্তা, কিন্তু ঋতুমতী হইলেও তাহার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। আমরা এবিষয়ে বিস্তৃতভাবে পরে আলোচনা করিব।

পুরাকালের যুগকে সুবর্ণযুগ বলা যায়! নগ্নিকার বিবাহ শ্রেষ্ঠা হইলেও অনগ্নিকার বিবাহও চলিতে পারে এইরূপ বিধি থাকাতে বোধ হয় সেকালে পিতামাতা কন্যাদের অধিক বয়সে বিবাহ দিতেন, এখনকার ন্যায় সেই সময়ে এইরূপ অনুষ্ঠানে রীতিনীতির কোন ব্যত্যয় ঘটিত না। এবং এই রীতিনীতিই ভারতবর্ষে অনেককাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, আবহাওয়ার গুণে ক্রমে মানবসংসারে কুনীতি প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। তখন কন্যাকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতাবস্থায় গৃহে রাখা সম্ভবপর হইল না। সেই জন্যই বোধকরি পরাশর আইন করিলেন—

অষ্টবর্ষা ভবেদগৌরী নববর্ষাতু রোহিণী,
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা ॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতর স্বয়ং ॥

এবং "কলৌ পরাশর স্মৃতঃ" এই বিধি নির্ম্মিত হইল। কিন্তু এই বিধি কুলীন ব্রাহ্মণের পক্ষে খাটিবে না কেন তাহার কোন হেতু পাওয়া যায় না। কন্যাকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রাখিলে যদি 'মেল' 'ঘর' 'শ্রেণী' মিলে তাহাদের অল্প বয়সে কেন মিলিবে না? কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যার পিতা এবং অপর শ্রেণীর কন্যার পিতাদের সম্বন্ধেও বা ভিন্ন ব্যবস্থা কেন হইল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সুতরাং আমাদের মনে হয় অধিক বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যার

নৈতিক অবনতি দেখিয়াই পরাশর এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি সমাজের মঙ্গলের জন্যই করিয়াছেন। বাস্তবিক কন্যার বিবাহের উদ্যোগ করিতে করিতে সে যদি রজস্বলা হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই যে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে, এরূপ আমরা মনে করি না। কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে অধিক বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যার কুলকলঙ্কের কথা অনেক সময়ে শুনিতে পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে মেয়েদের অবরোধপ্রথা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। তাহারা পাড়া বেড়াইতে যায়, পরপুরুষের সম্মুখে বাহির হয় বধুদের ন্যায় তাহাদের কোনই সঙ্কোচভাব থাকে না। এরূপ অবস্থায় খুব বেশী বয়স পর্য্যন্ত মেয়েদের অবিবাহিতা রাখিলে যে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। তাই বলিয়াই যে অষ্টম বর্ষেই মেয়েদের বিবাহ দিতে হইবে এমন কথাও আমরা বলি না। স্বামী কি পদার্থ বিবাহের উদ্দেশ্য কি পবিত্র, কি মহৎ, যে বয়স পর্য্যন্ত বালিকারা না বুঝে তাহার পূর্ব্বে তাহাদের বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রই তাহার প্রমাণ—

অজ্ঞাত পতিমর্য্যাদাম্ অজ্ঞাত পতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালাম্ অজ্ঞাত ধর্ম্মশাসনাম্॥

বিশেষতঃ অনেকে এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, যে দেশে বিধবাবিবাহের প্রচলন নাই, সেখানে নিতান্ত অল্প বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত নহে। কিন্তু অনেকে আবার নানারূপ যুক্তিতে এইমত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। হিন্দু বিধবার ধর্ম্ম—ব্রহ্মচর্য্য, একটী অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা বিধবা হইয়া ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিলে যৌবনের ভোগলালসা উপভোগের সময়ে তাহার তাদৃশ কষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু একটী যুবতীর বিবাহ দিতে না দিতেই যদি সে বিধবা হয়, তাহা হইলে সেই অনভ্যস্তা ব্রহ্মচারিণীর অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠে। বিশেষতঃ অল্প বয়সে বিবাহ দিতে পারিলে বয়স্কা কুমারীদের অভিভাবকের স্নেহলতার পিতার ন্যায় কোন মানসিক উদ্বেগের আশঙ্কা থাকে না।

কিন্তু এই সমস্ত মতের মূলে সামান্য সত্য নিহিত থাকিলেও আমরা এই মত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতে পারি না। একটী অপোগণ্ড বালিকাকে বিধবা হইতে দেখিলে প্রাণ স্বতঃই কাঁপিয়া উঠে, জ্ঞানহারা হইতে হয়। মনে হয় নিষ্ঠুর পিতা-মাতা স্বইচ্ছায় ছাগশিশুর ন্যায় স্বীয় কন্যাকে বলি দিয়াছে।

স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক যুক্তিতর্ক চলে। প্রবন্ধ বাড়াইয়া কোন লাভ নাই, আমাদের মতে অতি অল্প বয়স এবং অধিক বয়স—হিন্দু কন্যার বিবাহের

পক্ষে উভয়ই দোষাবহ এবং এ বিষয়ে কিশোর বয়সই (অর্থাৎ যেরূপ আজকাল হইতেছে) প্রশস্ত বলিয়া বোধহয়। তবে পরাশর যে অনুশাসন করিয়া গিয়াছেন, কন্যা রজস্বলা হইবার পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ দিবে, কলিকালে এ বিধির সার্থকতা থাকিলেও, ইহার ব্যত্যয় ঘটিলেই যে কাহারও জাতিঃপাত হইবে এরূপ মনে করিবার কোন হেতু দেখা যায় না।

-0-

কোকিলের প্রতি।

লেখক—শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন।

"সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপশ্রিতাঃ।"
শ্রীভাগবতে ১১ ৭।৩২

নিশীথ সময়ে ওই কে ডাকিছ পাখি।
কুহু (১) রবে, বৃক্ষশাখে বসিয়া একাকী?
নাহি কিরে নিদ্রা তব বিরামদায়িনী?
নিদ্রা বুঝি ভাল নাহি লাগিছে তোমার?
কেন বা লাগিবে? সে যে মানব জীবন
বৃথা ক্ষয়কারী সদা—কৃষ্ণ নাম বিনা।
মানবের অর্দ্ধ আয়ু, গত যে নিদ্রায়!
তাই কিরে পাখি! তুমি জাগাও মানবে?
"কেন আর নিদ্রা যাও উঠহ মানব!
গাওরে বিভুর গান। যে জীবন গত
হতেছে এক্ষণ তব, পাইবে কি ফিরে?
দুর্লভ মানবজন্ম-চৌরাশীতি লক্ষ

(১) কুহু; ক=কে, উহু=দুঃখে অর্থাৎ কে তুমি নিদ্রায় জীবন নষ্ট করিতেছ? উহু! কর কি? কুহু শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাকরণ দুষ্ট হইল; কিন্তু পক্ষীর বোধাবোধ নাই। লেখক—

যোনি ভ্রমি, লভিয়াছ মানব জনম—
দুর্লভ জীবন তাহা—জীব মধ্যে শ্রেষ্ঠ
সে জীবন কেন তুমি খোয়াইছ বৃথা !"
তাই কিরে পাখি ! তুমি খেদে "উহুঁ" বল ?
তাই কিরে পাখি ! তুমি গাও কৃষ্ণ-নাম ?
শিখাইছ মানবেরে—অলস, অধম,—
গাইতে কৃষ্ণের নাম ? যে জিহ্বায় নাম
শ্রীকৃষ্ণের নাহি কভু উচ্চারিত হয়
সে জিহ্বা ত ভেক-জিহ্বা ! জিহ্বা নাহি তব
তথাপি শিখাও নরে গাইতে কৃষ্ণের
নাম মনোহর—স্নিগ্ধ প্রাণের আরাম।
ধন্য ও জীবন পুণ্য পাখিরে তোমার !
তির্য্যগ্ যোনি লভি পাখি ! শিখাইছ নরে
কুলাঙ্গারে অর্ব্বাচীনে তুমি গুরু হ'য়ে।
প্রণতি তোমারে পাখি ! তুমি গুরু মম।

খেয়া।

লেখক—শ্রীমন্মথকুমার রায় কাব্যভূষণ, বি, এল, বি, সি, এস।

আমি খেয়ার ঘাটে এসে,
　　সারা পথটি
　　ব'য়ে শ্রান্ত
　　　　ব'সলাম জীবন শেষে !
　　কেমনে যাব পার ?
　　চতুর্দ্দিক হেরি অন্ধকার !
　　কোথায় তরী,
　　কোথায় নাবিক,
　　কি উপায়ে—যাব আপন দেশে,

গর্জ্জে সিন্ধু,
ভীষণ ঢেউ,
প্রাণ কাঁপে ত্রাসে॥
সারা পথ ধূলা লয়ে,
ছিলাম খেলায় মত্ত হ'য়ে,
পেয়ে সঙ্গে ক্ষণিক সাথী,
ছিলাম তুচ্ছ রঙ্গেমাতি,
কোথায় এবে তারা ?
আপন আপন ব'লে সদা
ভুলাতো মোরে সারা ?
সব গিয়াছে ছেড়ে,
এখন—একা এসে, বসেছি সিন্ধুর পাড়ে !
হায়রে হায়,
কেমন ক'রে যাব এবে,
আপন গৃহ-দ্বারে ?
দিনের আলো যাচ্ছে নিভে,
আঁধার জমছে ঐ যে নভে,
দেখিনাতো কোথাও তরী
হাতে নাহি তায় একটি কড়ি,
কে আছে কাণ্ডারী এমন,
অভাগা কাঙ্গালিনী বুঝে,
করবে মোরে মায়ায় গ্রহণ
হায়, মরবো কিরে ডুবে
ঐ ভীষণ
জল রাশির
তল শূন্য কূপে ?
না, না, ভয় পাবনারে আমি
আছেন হরি দীনদয়াল অধমজন-স্বামী;
ডাকবো তাঁরে কেঁদে
মন-প্রাণ বেঁধে

আসবেন ছুটে, লবেন তুলে,
আপন নায়ে, যাব কূলে
রহিতে হরি, অধম-শরণ
পতিত-পাবন,
দীনবন্ধু।
কেন বৃথা কাঁপি ভয়ে
দেখে আঁধার,
দেখে ভীম
তরঙ্গাকুল সিন্ধু!

ভক্তি-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

এই মানব জীবনই প্রয়োজন সাধনের উপযোগী। সুতরাং কৌমার কালেই মন ভগবানের দিকে অভিমুখী করা উচিত। এই মানব জীবন অতি দুর্লভ ও অনিত্য, অতএব এই জন্মেই ভগবানের চরণ আরাধনা করা কর্ত্তব্য। কারণ, তিনি সর্ব্বভূতের আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃদ। ইন্দ্রিয়জনিত সুখ অদৃষ্ট বশতঃ যে কোন জন্মেই হইতে পারে। উহা পশুর ও মনুষ্যের তুল্য। তাহার জন্য বৃথা আয়াস করা অনুচিত। তাহাতে বৃথা আয়ুক্ষয় মাত্র হয়। ইহা উপন্যাস নহে, প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। আর তাহাতে অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গল নাই। কিন্তু ভগবানের চরণাম্বুজ সেবায় মঙ্গল হয়। সুতরাং সংসারী হইয়া যতদিন শরীর সবল থাকে, ততদিনই মঙ্গলার্থ যত্ন করা কর্ত্তব্য। মানবের আয়ু শতবর্ষ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আয়ু তাহার অর্দ্ধ। বাল্যক্রীড়াদিতে তাহার বিংশতি যায়, বিংশতি বর্ষ বিষয়ভোগে যায়। শেষ দশ বৎসর জরা আসিয়া দেখা দেয়। তখন আর ধর্ম্মকর্ম্ম কিছুই হয় না। সুতরাং জীবনটা বিফলেই গত হয়। কোন্ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ, সংসারে আসক্ত স্নেহপাশে দৃঢ়বদ্ধ আত্মাকে মুক্ত করিতে

পারে? মুক্ত হওয়া বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। তাহা সুকৃতি সাপেক্ষ। অথবা সাধুসঙ্গ সাপেক্ষ। প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর অর্থলিপ্সা কে পরিত্যাগ করিতে পারে? তস্কর, সেবক এবং বণিক্, ইহারা প্রাণহানি স্বীকার করিয়াও অর্থার্জ্জন করে।

প্রণয়িনী প্রিয়তমার সংসর্গে, মনোহর আলাপে, এবং বন্ধুবর্গের স্নেহবন্ধনে, কলভাষী শিশুদিগের প্রিয়তমসংসর্গে, অনুরক্ত চিত্তব্যক্তি, তাহা স্মরণ করিয়া কিরূপে তাহা পরিত্যাগ করিবে? পত্নী, পুত্র, স্বজনবর্গ, কন্যা, ভ্রাতাভগিনী, শ্বশুর, সুসজ্জিত মনোহর গৃহ, পশু ভৃত্য, কুল ক্রমাগত জীবিকা ইহা কি মানব ত্যাগ করিতে পারে? যেরূপ কোশকার কীট নিজ বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া নিজ বহির্গমনের পথও রাখে না, সেইরূপ মানব, পুত্র, কলত্র বিষয়রসে আসক্ত হইয়া অপূর্ণ কাম ও লোভবশতঃ নিরন্তর কর্ম্মেই ব্যাপৃত হয়। উপস্থ ও জিহ্বা জন্য মুখই সে অমৃততুল্য বোধ করে; সুতরাং সে কিরূপে মুক্ত হইবে? গৃহাসক্ত ব্যক্তি এমনই প্রমত্ত হয় যে, নিজের আয়ুঃক্ষয় ও পুরুষার্থের হানিও জানিতে পারে না। ত্রিতাপতাপে তাপিত হইলেও কষ্ট বোধ করে না। অজিতেন্দ্রিয় বহু কুটুম্ব সম্পন্ন ব্যক্তি অভাব নিবন্ধন, ইহলোকে রাজদণ্ড এবং পরলোকে নরকপাত; ইহা জানিয়াও পর-ধনাপহরণে বিরত হইতে পারে না। আজকালই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। গৃহাসক্ত ব্যক্তি কখনও আত্মাকে মুক্ত করিতে পারে না সে কামিনীগণের ক্রীড়া-মৃগ-স্বরূপ। এবং উহাদের সন্তানগণ শৃঙ্খল স্বরূপ। অতএব বন্ধ হেতু ভূত গৃহত্যাগ করিয়া অনাদিদেবের প্রতি আসক্ত হওয়াই শ্রেয়স্কর। তাহাই মুনিগণের বাঞ্ছিত অপবর্গ। ভগবান অচ্যুত সর্ব্বভূতের আত্মা, এবং তাঁহার প্রীতিসাধন সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ বলিয়া তাঁহাকে প্রীত করা বহু আয়াসের কারণ নহে। স্থাবর হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুতেই ভগবান আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাকে প্রীত করিতে কোনও বাহ্য বস্তুর আবশ্যক নাই, সেই অন্তরের বস্তু অন্তঃকরণ দিয়াই আয়ত্ত করিতে হইবে। তিনি তুষ্ট হইলে জগতে কি অলভ্য থাকে? অন্যান্য ধর্ম্ম সাধনে কি ফল? মুক্তি বাসনা বা কি জন্য? তাঁহার চরণারবিন্দের অমৃত পান এবং তাঁহার নাম কীর্ত্তনই চরমপুরুষার্থ। যে কোন শাস্ত্র হউক না তাহা যদি ভগবানের আত্মার্পণের অনুকুল না হয়, তবে পাঠ করা পণ্ডশ্রম মাত্র। ধর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি ভগবানের রুচি জন্মাইতে সমর্থ না হয়, তবে, তাহার অনুষ্ঠান বিফল শ্রম মাত্র। আমরা কোন ব্রত নিয়মাদি করিয়া তাহার দোষাপণমনের জন্য শ্রীহরির নাম স্মরণ করি।

আদিতে, মধ্যে, অন্তে শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করি। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে তিনিই আরাধ্য ইহা আর বলিতে হইবে কেন ? আমরা সর্ব্বাপেক্ষা আত্মাকেই ভালবাসি তিনি আত্মার ঈশ্বর, তিনিই জীবের জীবন, সুতরাং তিনিই একমাত্র আরাধ্য ইহাই বুঝা যায়। এই সারতত্ত্ব না জানিয়া যাহারা অন্য দেব, পিশাচাদির উপাসনা করে, তাহারা কর্ম্ম জন্য কিছু সিদ্ধিলাভ করিলেও কখনও মুক্তি বা শান্তি লাভ করিতে পারে না। জগৎব্রহ্মাণ্ডের একটী মূল কারণ, একটী মূলশক্তি আছে, ইহা লোকায়তিকেরাও স্বীকার করেন, সেই মূলকারণ বা শক্তিই বেদের নিরাকার ব্রহ্ম পদার্থ। অচেতন হ'তে কখনও চেতন, বা মিথ্যা হ'তে সত্য কখনও উদ্ভূত হইতে পারে না, ইহা নিশ্চিত।

অসৎ-সঙ্গ, ক্ষুদ্র দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ় নিশ্চয় সহকারে ভগবানে ভক্তি করিবে এবং গুণকীর্ত্তন, শ্রবণ করিবে। তাহাতেই ভগবানের লীলা, অনুপম গুণ, পরাক্রম বর্ণনা শ্রবণ করিয়া যাহার রোমাঞ্চ ও পুলকোদ্গম হয় এবং নির্লজ্জভাবে নৃত্যগীত করিতে থাকে, ও হে হরে ! হে প্রাণবল্লভ ! বলিয়া যখন ক্রন্দন করিতে থাকে, ভূতাবিষ্টের ন্যায় আনন্দধ্বনি করিতে থাকে, তখন সে সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। আর ভগবানের ভাব ভাবনার তাহার চিত্ত ভগবানের অনুকরী হইতে থাকে। প্রবল ভক্তিবশতঃ অজ্ঞান ও বাসনা দূর হয়। সে সম্পূর্ণ ভাবে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। ভগবানের শরণাগতিই মলিনাশয় শরীরীদিগের সংসারবন্ধনচ্ছেদনের একমাত্র উপায়। এবং তাহাই মোক্ষ সুখ বলিয়া পণ্ডিতগণ অবগত আছেন। স্বীয় আত্মার সখা হরির উপাসনাতে কি আয়াস আছে ? বিনশ্বর দেহ, গেহ, পুত্র কলত্রাদি, অস্থির জীবন মানবের কতটুকু প্রীতিসাধন করে ? পুণ্যার্জ্জিত স্বর্গাদি লোকও বিনশ্বর, সুতরাং কর্ম্ম শুভাশুভ কোনরূপেই প্রীতিপ্রদ নহে। ভগবানের শরণাগত হইলে সমস্ত কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। তদ্ভিন্ন আর নির্ভয়ের অন্যতম কারণ জগতে নাই ও হইতেও পারে না। সুতরাং ভগবৎ-ভজনই মানব জীবনের মুখ্য ব্রত। মানব যাহার জন্য ভোগ কামনা করে, সেই দেহ কুক্কুরাদির ভক্ষ্য। নিজের প্রিয়তম দেহই যখন নিজের নয় অনিত্য—তখন তাহা হ'তে ভিন্ন, পুত্র কলত্রাদির তো কথাই নাই। তাহারাও জীবন পর্য্যন্ত স্বসম্পৃক্ত। কিন্তু মানব, সেই দূরসম্বন্ধীয় পুত্রকলত্রাদির জন্য মানব, জীবন উপেক্ষা করিয়া, ন্যায় ও অন্যায় বিচার না করিয়া ধনোপার্জ্জন করে। বহু কুটুম্ব-সম্পন্ন গৃহী—তস্কর, বণিকের ন্যায় জীবন বিনিময়েও অর্থার্জ্জন করে।

ত্রিবর্গ যাঁহার অধীন সেই হরির আরাধনা করাই কর্ত্তব্য। তিনি প্রীত হইলে সর্ববিধ কল্যাণ লাভ সুলভ হয়। দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, চরিত্র, বহুজ্ঞতা, দান, শৌচ, তপস্যা, কিছুই হরির প্রীতির কারণ নহে; ভক্তিই হরির প্রীতির হেতু। ভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্তই বিড়ম্বনা মাত্র। ভগবান মানবগণের নিকট পূজাদি লইতে লোলুপ নহে। কারণ তিনি নিজলাভপূর্ণ অর্থাৎ তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। তবে মানবগণ যে, তাঁহার পূজাদি করে সে আত্ম সুখের জন্য। ভগবানের লীলা বিলাসাদি কেবল জগতের মঙ্গলের জন্য। মানব, প্রত্যেক জন্মেই প্রিয়বিয়োগ ও অপ্রিয় সংযোগ জন্য অপার ক্লেশ অনুভব করে। তাহারা যাহা দুঃখ নিবৃত্তির কারণ মনে করে তাহাও দুঃখপ্রদ। দুঃখ-সন্তপ্ত দেহীর দুঃখ নাশার্থ যে উপায় লোকে প্রসিদ্ধ আছে, ভগবদুপেক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে তাহা আত্যন্তিক উপকারী নহে। বালকের পিতামাতা, পীড়িতের ঔষধ, সাগরে নিমজ্জমান ব্যক্তির নৌকাও আত্যন্তিক রক্ষার কারণ নহে। কারণ, কালপাশ হতে কেহই নিস্তার পাইতে পারে না। দুঃখ সঙ্কুলভব-সাগর হতে নিস্তার পাবার ভগবান ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কার্য্য-কারণ শক্তি সকল ভগবানের অধীন। ভগবানই কালস্বরূপ, ব্রহ্মাদি পদ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে, অন্য বস্তুর কথা আর কি? শ্রবণ সুখকরমঙ্গলই বা কোথায়; আর তাহা মৃগতৃষ্ণা সদৃশ স্বপ্নতুল্য। আর অশেষ রোগের আয়তন এই কলেবরই বা কোথায়? এই রোগায়তন দেহে, মৃগতৃষ্ণা সদৃশ মঙ্গল লাভ সুদুর্লভ। মানব, জানিয়াও মধুতুল্য সুখলেশদ্বারা কামাগ্নি শান্ত করে। সুতরাং সাংসারিক দুঃখ, দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করেনা। সুতরাং সংসারনিবৃত্তির আশা তিরোহিত হয়।

কখনই তাহাদের মনে ভগবৎ প্রসঙ্গ উত্থিত হয় না। উহারা ভাগ্যক্রমে যদি কখনও ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করে, তবে, তাঁহার নিকট কাম্যবস্তুই প্রার্থনা করে। ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া যে কাম্য বস্তু প্রার্থনা করে, সে মূঢ় বণিকতুল্য। সে বিনিময়ে কিছু চাহিয়ালয়, তাহাই তার মহৎ ভ্রান্তি। স্বামীর নিকট যে স্বীয় কল্যাণ আশা করে, সে ভৃত্য নহে। মানব, হৃদয়স্থিত কামনা যখন পরিত্যাগ করে, তখনই সে ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু, ভক্ত কখনও হৃদয়ে কামবীজ রোপণ করিতে চাহেন না। সুতরাং তিনি ভগবচ্চরণারবিন্দ ব্যতীত কিছুই কামনা করেন না। তাহাই তাঁহার কাম্যবস্তু। তিনি মনুষ্যদিগের পাপনাশের হেতু ভূতভগবৎ কীর্ত্তিসুধাসিন্ধুতে অবগাহন

করিতে থাকেন। মানব যদি যথার্থ ভগবানের ভক্ত হয়, তাহা হইলে, যথার্থ নিশ্বাস ত্যাগ করে, নতুবা তাহারা ভস্ত্রার ন্যায় নিষ্ফল জীবন বহন করে। ভগবানের সেবার উপযোগী এই পঞ্চভৌতিক দেহ আত্মা, সুহৃদ ও প্রিয়ের ন্যায় বর্ত্তমান আছেন, পরমাত্মারূপে ভগবানও অনুকূল আছেন, তথাপি মানব সর্ব্ব-মঙ্গল-নিদান ভগবানের অভিমুখ হয় না। ইহা মানবের অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। ভজন সাধনের সম্যক্ উপযুক্ত দেহ পাইয়াও যদি মানব নিজহিত চেষ্টা না করে, তবে সে নিজে আত্ম হত্যাকারী বলিতে হইবে। "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং" আত্মার শক্তিতেই তাহাকে মায়ামুক্ত করিতে হইবে। নিজের পথ নিজেকেই করিয়া লইতে হইবে। নচেৎ বৃথা জীবন ভার বহনের কোনই ফল নাই। ভগবৎপ্রবণ না হইয়া বিষয়প্রবণ হওয়া সংসার প্রবৃত্তির কারণ।

যাঁহারা ভগবানকে অখিল জগদাধার বলিয়া জানেন, তাঁহারা মৃত্যুরও মস্তকে পদাঘাত করেন। কিন্তু যাহারা ভগবৎ বিমুখ, তাহারা পণ্ডিত হইলেও পশুবৎ বদ্ধ হইয়া থাকেন। ভগবানের প্রতি যাঁহাদের প্রীতি জন্মে, তাঁহারা নিজেকেও অন্যকে পবিত্র করেন। ভগবান ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ রহিত হইয়াও সমস্ত প্রাণীগণের ইন্দ্রিয় শক্তি বিধান করিয়া থাকেন। তিনি আকাশ সদৃশ সমদর্শী ও পরম কারুণিক। এবং শূন্য সদৃশ অবাঙ্মনো গোচর। তাঁহার স্বরূপ জানি বলিয়া যিনি শ্লাঘা করেন, তিনি কিছুই জানেননা। তিনি অজ্ঞেয়, সুতরাং জানি বলিলে দোষ হয়। যিনি জ্ঞাতা তিনি কখনও জ্ঞেয় হইতে পারেন না। তবে ঋষিগণ যে তাঁহার স্বরূপ জানিয়া থাকেন, সে বিশুদ্ধ সত্বগুণের বিকাশবশতঃ বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও মনের সাহায্যে। নতুবা অনন্তকে সান্তজ্ঞান দ্বারা কখনও জানা যায় না। তবে কৃপাসিদ্ধ ব্যক্তিরা সহজেই তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া থাকে। তাঁহার কৃপা বা ভক্ত-কৃপা ভিন্ন তাঁহার দর্শন দূরে থাক, অনুভব, এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিশ্বাস হয় না। এ জগতের পনর আনা তিন পয়সা রকম মানব অন্তর জগতের খবর রাখে না। তাহারা জিহ্বা ও উপস্থের তৃপ্তি সাধনেদ্দেশে সতত যত্ন করে। এবং তজ্জন্য অকার্য্য, কুকার্য্য কিছুই গণনা করেনা। তাঁহারা জানে, ইহাই সংসারের জীবনের মুখ্য কর্ম্ম।

অপ্রত্যক্ষ কোন বস্তুই লোকে বিশ্বাস করে না। বাষ্প-বলে রেল গাড়ী চলে, ইহাও এক সময় লোকে অবিশ্বাস করিত। সুতরাং বাক্য মনের অতীত বস্তু, ভগবৎ তত্ব মানব বিশ্বাস করিবে কিরূপে? সমস্ত প্রাণের একটা কেন্দ্র আছে

যেখান হ'তে সর্ব্বজীবে প্রাণ সঞ্চার হয়। আবার সেই বিভক্ত প্রাণ, মহাপ্রলয়ের সময় সেই কেন্দ্রে বিলীন হয়। নচেৎ শূন্য হইতে বা জড় হইতে প্রাণ আইসে না। যাহা থাকে, তাহাই আইসে, যাহার সত্ত্ব নাই, তাহা আসা অসম্ভব। সেই প্রাণের কেন্দ্রই ভগবান। যেমন একই তাড়িৎশক্তি, আলোক, তেজ, বেগ নানারূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ একই অখণ্ড শক্তি জগতে বিবিধাকারে বিকাশ হইয়াছে। তাঁহাকে লোকে, ভগবান, আল্লা, যিশু, বুদ্ধ বলিয়া ভজনা করে। কিন্তু মানবগণ বুঝিতে পারে না যে, সেই শক্তি তাহার ভিতরেও কার্য্য করিতেছে। উহা নিত্য ও অখণ্ড এবং বিশ্বব্যাপী। ইহা বুঝিতে পারিলে, মানব তাঁহার চরণে শরণাগত না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না। জড়বিজ্ঞানের বহুল প্রচারে, ক্রমশঃ লোক জড়ের দাস হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু জড়শক্তি অর্থ দিতে পারে, কিন্তু, শান্তি, সুখ দিতে পারে না। সুখ বাহ্য বস্তুতে নাই, অন্তরে। বাহ্য পদার্থ রুচিভেদে বা সময় ভেদে সুখ দুঃখের কারণ হয়। অনন্ত সুখসিন্ধু ভগবান ব্যতীত তৃপ্তি, শান্তি, সুখ, অমৃতত্ব আর কোথাও মিলিবে না।

যাহারা সত্যবস্তু না জানিয়া মিথুনীভাবে কেবল রতি সুখেরই বশতাপন্ন হয়, সুখবিহীন এই নশ্বর জগতে কে, তাহাদের সুখ বিধান করিতে পারে? যদিও ঋষিগণ পাদোদক দ্বারা অন্যের পাপ নাশ করেন বটে, তথাপি তাঁহারা নিরহঙ্কৃত ভাবে ভগবচ্চরণ পদ্মহৃদয়ে ধারণ করিয়া পৃথিবীস্থ মহৎ পুণ্যতীর্থ সমূহের সেবা করিয়া থাকেন। নিত্য-সুখস্বরূপ ভগবানে যাঁহাদের চিত্ত আসক্ত হয়, কুৎসিৎ সাংসারিক সুখ তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। কারণ তাঁহারা জানেন ইন্দ্রিয়ের সুখ সাধনে তৎপর ব্যক্তি ইহা মুত্র তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। ভগবৎবিমুখ জনগণ সর্ব্বদাই শমনভয়ে ভীত হইয়া থাকে। যাঁহারা ভগবানকে জানিতে পারেন এবং তাঁর নামগুণ সর্ব্বদা কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের কোনই ভয় নাই। তাঁহাদিগকে আত্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না। চিত্তকে ভগবদম্মুখ করিতে হইলে সব বিষয়ে সঙ্গহীনতা, সাধুসঙ্গ, সর্ব্বভূতে দয়া, মিত্রতা ও বিনয়, শৌচ স্বধর্ম্মাচরণ, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, বৃথা বাক্য না বলা, ঈশ্বরদৃষ্টি, গৃহাদির পর অভিমান শূন্যতা, তুল্য ব্যবহার, সর্ব্ববিষয়ে সন্তোষ, ভাগবতশাস্ত্রে অভিনিবেশ, অন্য শাস্ত্রের নিন্দা না করা, সংযত, সত্য, শম, দম, অদ্ভুদ-কর্ম্মা শ্রীহরির নামগুণ কীর্ত্তন তাঁহার জন্য সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ইষ্ট, দান, তপস্যা, জপ, সদাচার, স্ত্রী, পুত্র প্রাণকে পরমেশ্বরে নিবেদন, নিখিল কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ, এইগুলি শিক্ষা করা আবশ্যক!

(ক্রমশঃ)

ত্রিগুণ অতীত পথে।

——(০)——

লেখক—শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

(১)

ত্রিগুণ অতীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ
আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব সুখ-দুঃখ বিরমে তখন
পুণ্য-পাপ ভেদভাব চিত্ত হ'তে হয় বিদূরিত
সংশয়ের অবসানে শব্দাতীত তত্ত্ব বিকশিত
নাহি রয় নিষেধ বিধান।

(২)

ত্রিগুণ অতীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ
নেহারে সে—আত্মা তার পরিপূর্ণ করে ত্রিভুবন
একমাত্র নভ যথা ঘটমধ্যে ঘটের বাহিরে,
কার্য্যকারণের পাশ পায় নাশ অন্তরে অচিরে
ঘটে তার করম বিরাম।

(৩)

ত্রিগুণ অতীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ
সৈন্ধব হারায় যথা নীর মাঝে অস্তিত্ব আপন
বিরাট্ ভূমার মাঝে ডুবে যায় ব্যক্তিত্ব তাহার
অখণ্ডিত আত্ম-বোধে ঘুচে যায় ক্ষুদ্র অহঙ্কার
নাহি রয় নিষেধ বিধান।

(৪)

ত্রিগুণ অতীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ
অনল-পরশে যথা লভে নানা কনক-গঠন
একাত্মিকা কনকতা, সেই মত বিচিত্র-জগৎ
আত্মযোগে আপনাতে আত্মময় হয় যুগপৎ
নাহি রয় ভিন্ন তার স্থান।

(৫)

ত্রিগুণ অতীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ
অমনি জীবত্ব তার পরমাত্মে হয় নিমগন
সচ্চিৎ আনন্দরূপে লভে মহা পরিপূর্ণতায়
নদী যথা উদধিতে সামরসে সাগরত্ব পায়
নাহি রয় নিষেধ বিধান।

(৬)

ত্রিগুণ অতীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ
বহিরভ্যন্তরাতীত আপনারে জানে সে তখন
বিদ্যার পরম পদ আপনার স্বরূপ দর্শনে
স্বপ্রকাশ পরমাত্মা সমুদিত হয় শুদ্ধমনে
নাহি রয় ভিন্নতার স্থান।

(৭)

ত্রিগুণ অতীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ
কার্য্যকার্য্যে আর তার নাহি রয় কর্ত্তৃত্ব কখন
দগ্ধ-বাসে রয় যথা বৃত্তি-হীন প্রাণের বিলাস
কর্ম্ম-নাশে দেহে তথা বন্ধ-হীন বসন আভাষ
নাহি রয় নিষেধ বিধান।

(৮)

ত্রিগুণ অতীত পথে যোগী যবে করে বিচরণ
কে বা সে, আসিল কেন, কোথা হ'তে—বুঝে সে তখন,
নির্ম্মল-গগন-সম শুদ্ধ-তত্ত্ব করিয়া ধারণ
লভে সে আপনা মাঝে ব্রহ্মানন্দ সামরস ঘন
হয় জীব শিবের সমান।

জাতি-তত্ত্ব।

——(০)——

লেখক—শ্রীশম্ভুনাথ দাশ।

বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র হিন্দুসমাজ বহু জাতিতে ও বহু শাখাতে বিভক্ত। সামাজিকতার গণ্ডী এতই কঠোর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এক জাতিতে জন্মলাভ করিয়া অন্য জাতির লোকের সহিত আদান প্রদান খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ থাকিতে হইবে। কিন্তু কোন্ সময়ে কোথা হইতে এই এই সমস্ত জাতির উৎপত্তি হইল তাহা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। এই সামাজিক বিভিন্নতা একদিনের বা একজনের কৃত নহে। প্রাচীনকাল হইতে এ যাবৎকালের শাস্ত্রগ্রন্থ ও ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই সাম্প্রদায়িকতা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। আমি এই প্রবন্ধে সেই সাম্প্রদায়িক ক্রমবিকাশের কথাই আলোচনা করিব। যখন আর্য্যগণ বংশবৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে মধ্য-এসিয়া হইতে নানাদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহাদের এক শাখা ভারতেরও একপ্রান্তে আসিয়া দেখা দিল এবং সেইস্থান হইতে আস্তে আস্তে সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ভারতে আর্য্যবিজয়ের পূর্ব্বে অনার্য্যগণ এদেশে বাস করিত, আর্য্যগণ প্রথমে সেই অনার্য্যদিগকে পরাভূত করিয়া ভারতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। অনার্য্যগণের কেহ কেহ পাহাড় পর্ব্বতে বনে জঙ্গলে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। তাহাদের বংশধরগণ আজিও গারো, কুকি, সাঁওতাল, খাসিয়া প্রভৃতি নামে পরিচিত। অনার্য্যগণের কেহ কেহ আর্য্যগণের দাসত্ব স্বীকার করিয়া এদেশেই বসবাস করিতে লাগিল। আর্য্যগণ তাঁহাদের পূর্ব্বতন নিবাস পরিত্যাগ করিয়া নানা-দেশের নানা-পাহাড়-সমতলভূমির মধ্য দিয়া নানা বিপদাপদ উপেক্ষা করিয়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়ায় তাঁহাদের মানসিক সংকীর্ণতা দূরীভূত হইয়া নূতন নূতন ভাবের সূচনা করিতে লাগিল। প্রকৃতির রমণীয়তা, গাম্ভীর্য্যতা, ভীষণতায় মনের স্বাভাবিক ভাবগুলি সামগানে পঞ্চনদের তীরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল এই সমস্ত গাথা হইতে প্রকৃতি পূজার ভাব উপ্ত হয়। প্রকৃতির রমণীয়

গাম্ভীর্য্য, ভীষণতায় তাঁহারা যে সমস্ত সামগাথা রচনা করিয়া গান করিতে লাগিলেন, উত্তরকালে তাহাই বেদ-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

বেদ হিন্দুর পরম পবিত্র আদি ধর্ম্মগ্রন্থ। আমরা এই বেদ-গ্রন্থে জাতি-বিভাগের কোন নিদর্শন পাই না, ঋগবেদে একটী শ্লোকে শুধু বর্ণ-বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা অনেক পরবর্ত্তীকালের লেখা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে! সে যুগে শুধু একজাতি ছিল—আর্য্য। ভারতে গ্রীক্ আক্রমণের সময় হইতে হিন্দু-নামের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন আর্য্য-সমাজ একই জাতিতে, একই মন্ত্রে, একই কর্ম্মে গ্রথিত ছিল। সকলেই যাগ-যজ্ঞ, কৃষিকার্য্য, পশু-পালন, অধ্যয়ন, যুদ্ধ-কার্য্য প্রভৃতি করিতেন। এ দেশে স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার পর তাঁহাদের কর্ম্মের পার্থক্যে সমস্ত বিষয়েই পার্থক্য আসিয়া পড়িল। ঐ সমস্ত আর্য্যগণের কেহ হয়ত যাগযজ্ঞ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা লইয়া ব্যাপৃত রহিলেন ও তাঁহাদের পরিবারবর্গকেও সেই বিষয় শিক্ষা দিলেন। কেহ হয়ত ব্যায়াম, ক্রীড়াকৌশলাদি লইয়া থাকিয়া যুদ্ধ-বিদ্যাশিক্ষা করিয়া তাঁহাদের পরিবারবর্গকেও তাহাই শিক্ষা দিলেন। কেহ হয়ত কৃষিকার্য্য ব্যবসায় প্রভৃতি লইয়াই থাকিলেন। আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করাইলেন। কর্ম্মানুসারে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের সঞ্চার হইল। এইরূপে আস্তে আস্তে গুণ ও কর্ম্মবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে চারিটী বর্ণ-বিভাগ হইয়া পড়িল। হিন্দুর পরম পবিত্র দর্শনগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"চতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"

অর্থাৎ :—

গুণ ও কর্ম্মবিভাগ দ্বারা আমি চারিটী বর্ণ সৃষ্টি করিলাম। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, গুণ ও কর্ম্ম-বিভাগ হওয়াতে চারিটী বর্ণ-বিভাগ হইল। এ স্থানে আমি আর একটী কথা উল্লেখ করিতে চাই—তাহা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে গেলে ইহা স্বতঃই মনে হইবে যে প্রাচীনকালে যে সমস্ত তত্ত্বদর্শী-পণ্ডিত আপনাদের মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকে লোকের বিশ্বাসোৎপাদনের জন্য ও তাঁহাদের মতগুলি অলঙ্ঘনীয় করিবার জন্য ভগবানের ভূমিকায় বা তাঁহাকে কোন না কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট রাখিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রীয় যৌক্তিকতা দেখাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ কে লিখিয়াছেন বা কোন সময়ে রচিত বা সত্যই ভগবানের

বাক্য হইতে উদ্ধৃত কি না তাহার আলোচনা আমি এ স্থানে করিতে চাহি না। মোটের উপর স্বয়ং ভগবান যাহা বলিয়াছেন তাহাই উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য প্রকাশ করিব। গীতায় চারিবর্ণের কি কি লক্ষণ তাহার উল্লেখ আছে:—

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম॥
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥
কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥"

অর্থাৎ:—

হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রের আপনাপন আচার ও গুণদ্বারা কর্ম্মবিভাগ করা হইল। শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ঈশ্বরেবিশ্বাস ব্রাহ্মণের স্বভাবগত কর্ম্ম। শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ, যুদ্ধে সাহসিকতা, দান, যুদ্ধে স্থির, ঈশ্বরে বিশ্বাস ক্ষত্রিয়ের স্বভাবগত কর্ম্ম। কৃষি, গো-পালন, বাণিজ্য বৈশ্যের কর্ম্ম। পরিচর্যা করাই শূদ্রের কর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাবত রচিত হইবার সময় হিন্দু-সমাজ চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু সে সময়ে গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণ-নির্ণয় করা হইত। তাই গীতায় আর একস্থানে লিখিত আছে,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদ্যন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

অর্থাৎ:—

যাহার যে লক্ষণ বলা হইল, সে সকল লক্ষণ যদি অন্যত্রও দেখা যায় তবে তাহা দ্বারাই বর্ণনির্দ্দেশ করা যাইবে।

ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের আচার পালন না করিলে তাহার ব্রাহ্মণত্ব থাকিত না। এক কথায় ব্রাহ্মণত্ব তখন কাহারও জন্মগত একাধিপত্যে আসে নাই, ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে যেমন অবনমিত হইয়া পড়িত,

তেমনই কেহ নীচবর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়া গুণ ও কর্ম্মানুসারে উচ্চবর্ণে উন্নীত হইতে পারিত। তাহার প্রমাণ বিশ্বামিত্র, ব্যাসদেব, শুকদেব প্রভৃতি ঋষিগণ, হিন্দুর পবিত্র মহাভারত গ্রন্থেও আমরা ইহার আভাস পাই। আরণ্যক পর্ব্বে একস্থানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কহিতেছেন,—

'সত্যং দানং ক্ষমাশীলং আনৃশংস্যং তপোঘৃনা,
দৃশ্যতে যত্র নাগেন্দ্র ? স-ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ।"

সর্প :— শূদ্রেষ্বপি চ সত্যং চ দানং অক্রোধ এব চ।
আনৃশংস্যং অহিংসা চ ঘৃণা চৈব যুধিষ্ঠিরঃ ॥

যুধিষ্ঠির :—শূদ্রে তু যদ্ ভবেদ্ লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ নবিদ্যতে।
ন চ শূদ্রো ভবেৎ শূদ্রো ব্রাহ্মণো নচ ব্রাহ্মণঃ ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রং ইতি নির্দ্দিশেৎ ॥

অর্থাৎ :—

হে নাগেন্দ্র! সত্য, দান, ক্ষমা, আনৃশংস্য, তপ ঘৃণা যাহাতে দেখা যাইবে তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে।

সর্প :— হে যুধিষ্ঠির! শূদ্রেও ত সত্য, দান, অক্রোধ, আনৃশংস্য, অহিংসা ও ঘৃণা দেখা যায়।

যুধিষ্ঠির :— শূদ্রের ভিতর যে সকল গুণ দেখা যায়, ব্রাহ্মণে তাহা নাও দেখা যাইতে পারে। শূদ্র হইয়াও সে শূদ্র নয়, ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নয়। হে সর্প! যাহার ভিতর এই সকল বৃত্তি দেখা যাইবে তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে, আর যাহার ভিতর এই সকল গুণ না দেখা যাইবে তাহাকে শূদ্র বলিয়া জানিবে।

যে সময় মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিত হয় তখন জাতিগত কঠোরতার সৃষ্টি হয় নাই। তারপর—সংহিতা যুগ। তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান স্মৃতিকার মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র মনুসংহিতায় সামাজিক কঠোরতার সূচনা দেখিতে পাই। কাল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাব ও রুচি পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। মনুসংহিতায়ও চাতুর্ব্বর্ণ্যের গুণকর্ম্ম ব্যাখা দেখিতে পাই, কিন্তু গীতার কর্ম্ম-বিভাগ হইতে ইহা কঠোরতার নিয়মে বদ্ধ।

অধ্যাপনং অধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহৈঞ্চব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥
পশূণাং রক্ষণং দানমমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ॥
একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুকর্ম্ম সমাদিশেৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনুসূয়য়া॥

অর্থাৎ

অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান. গ্রহণ, ব্রাহ্মণের কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রজাপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন বিষয়ে অনাসক্তি, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। পশু-রক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বণিক্ ব্যবসায়, সুদগ্রহণ কৃষিকার্য্য বৈশ্যের কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইল। একমাত্র প্রভুসেবাই ও এই সকল বর্ণের অকুণ্ঠিতচিত্তে সেবা করাই শূদ্রের একমাত্র কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইল।

এই সময়েই চাতুর্ব্বর্ণ্যের মধ্যে কঠোরতা আসিয়া দেখা দিল! একবর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়া সৎকর্ম্ম ও সদ্‌গুণ দ্বারা আর কাহারও জাতি বিচার হইবেনা বলিয়া শাস্ত্রকারগণ শাস্ত্রের বাঁধন আঁটিয়া দিলেন। জন্মগত পার্থক্যই এযুগের প্রধান মত। এই সময়ে ব্রাহ্মণদিগের এতই প্রতিপত্তি হইয়া পড়িল যে তাঁহারাই সমাজ-কর্ত্তৃরূপে বিরাজিত হইলেন ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় বস্তু তাঁহাদেরই অধি-কারভুক্ত বলিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিতে লাগিলেন।

"ব্রাহ্মণো জায়মানোহি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥"

অর্থাৎ :—

ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন্। ধর্ম্মকোষের রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ সর্ব্ব প্রাণীর প্রভু। অথবা সর্ব্বভূতের ধর্ম্মধনের রক্ষা করিতে তিনি সমর্থ!

এই সমস্ত জাতিগত পার্থক্য আসিয়া পড়ায় সমাজের এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহে উৎপাদিত সন্তান কোন বর্ণেই স্থান না পাইয়া সঙ্কর জাতিতে পরিণত হইল। এই সময় হইতেই ক্রমশঃ বহুজাতির সৃষ্টি হইতে লাগিল। মিশ্রিতবর্ণের সংমিশ্রনে যেমন সঙ্কর জাতির

উৎপত্তি হইয়া সমাজ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল, তেমনই আর এক-দিক হইতে জাতিগত পার্থক্য আসিয়া পড়িল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আর্য্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে বিভক্ত হইয়া পড়ায় পরিবারগত কর্ম্মও পৃথক্ হইয়া পড়িল। বৈশ্য-বর্ণের মধ্যে আবার এক এক পরিবার এক এক ব্যবসায় অবলম্বন করায় পরিবারগত ভাবে সেই সেই ব্যবসায় লইয়া থাকিতে লাগিল, এবং আস্তে আস্তে কর্ম্ম-বিভাগের সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ জাতির সৃষ্টি হইল। বৈশ্য-বর্ণের মধ্যেই এইরূপ জাতিগত বৈষম্য বেশী হইয়া পড়িল।

ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের গোঁড়ামী যখন পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত—সেই সময়ে ভারতের একপ্রান্তে বৌদ্ধধর্ম্মের-পতাকা ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিল। তদানীন্তন নৃপতিগণও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য নানাদেশে ধর্ম্ম-প্রচারক পাঠাইয়া আবালবৃদ্ধ সকলকেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মে দেশ প্লাবিত হইয়া গেল। পৌরাণিক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রন্থে পাওয়া যায়, বৌদ্ধ-বিপ্লবের সার মর্ম্ম ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য লইয়া দ্বন্দ্ব। কিন্তু পরিশেষে ব্রাহ্মণ্য শক্তিরই জয়লাভ হইল। এই সমাজবিপ্লবের দিনে এক মহাত্মার অবির্ভাব হইল—তাঁহার নাম শঙ্করাচার্য্য। শঙ্করাচার্য্য ভারতকে জ্ঞানযোগ শিক্ষা দিলেন, ব্রহ্মণ্যশক্তির জয়লাভে অন্যান্য বর্ণ নিস্তেজ হইয়া পড়িল।

যে দিন মুসলমানের বিজয়-পতাকা পত্‌পত্‌রবে মুসলমানের ভারত বিজয় বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিল, সেদিন হিন্দু-ধর্ম্মের উপর আর একটী প্রচণ্ড ঝটিকা সমুপস্থিত হইল। এই কাল পরিবর্ত্তনের ও ঝটিকাবর্ত্তের মধ্যদিয়া হিন্দুর ধর্ম্মের নিষ্ঠা বজায় রাখা এতই কঠিন হইয়া পড়িল যে, দেশ মুসলমান ধর্ম্মে প্লাবিত হইয়া যায় যায় এমন সময় চৈতন্যদেব হরিনামের অফুরন্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়া হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিলেন। গীতার মাহাত্ম্যও সফলতা লাভ করিল।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত,
অভ্যুত্থানম অধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অর্থাৎ :—

হে ভারত! যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইবে ও অধর্ম্ম প্রাবল্য-লাভ করিবে, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করিব। সাধু ব্যাক্তিগণের পরিত্রাণের জন্য দুষ্কৃত ব্যক্তির বিনাশের জন্য ধর্ম্ম রক্ষণার্থ আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইব।

হিন্দু-ধর্ম্ম আবার মস্তকোন্নত করিয়া দাঁড়াইল। চৈতন্যদেবের প্রেম-ধর্ম্মের সমন্বয়-মন্ত্রে নূতন সম্প্রদায় গঠিত হইল বটে, কিন্তু ফলে ব্রাহ্মণের প্রাধান্যই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। দেশে সংস্কৃতচর্চ্চার আন্দোলনে আবার তাঁহারা শাস্ত্রচর্চ্চাব্যবসায়ী হইয়া বিরাজিত হইলেন কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আপনাপন গুণ-কর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া শূদ্রত্বে পরিণত হইল। ব্রাহ্মণ সমাজের গুরুই রহিলেন কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্যের আর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। সমগ্র হিন্দু-সমাজ দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত হইল।—ব্রাহ্মণ ও অ-ব্রাহ্মণ।

বহু বিপদাপদের মধ্য দিয়া হিন্দু-সমাজ বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু-সমাজে যত জাতিগত বৈষম্য, এমন আর কোন সমাজে দেখা যায় না। এই জাতি-বিভাগ থাকাতে সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে। অসুবিধার দিক্ দিয়া দেখিতে এই বিস্তীর্ণ সমাজ বহুভাগে বিভক্ত হওয়ায় জাতিগত বৈষম্য হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, শক্তিহীনতা আসিয়া পড়িয়াছে। একজাতির লোক অন্যজাতির লোককে কোনপ্রকারেই প্রীতির চ'ক্ষে দেখিতে পারে না।

এমনকি অন্যের জল পর্য্যন্ত পান করিলেই ধর্ম্মপাত হইয়া যাইবে বলিয়া শাস্ত্রকারগণ শাস্ত্রের বাঁধন আঁটিয়া দিলেন। এই সামাজিক গণ্ডী-বিভাগের জন্য সামাজিক, ধর্ম্ম, রাজনৈতিক কোন বিষয়েই একতা সম্ভবপর নহে। সুবিধার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে হিন্দু-সমাজ এইরূপে গণ্ডীবদ্ধ হওয়ায় ছোট ছোট গণ্ডীগুলি যতটুকু গঠিত করিয়া লইবার সুবিধা আছে। বর্ত্তমানে সময়ে জাতিগত হিংসা, দ্বেষ, আসিয়া পড়ায় প্রত্যেক জাতিরই নিজ নিজ মতে গঠিত করিয়া লইবার আগ্রহ দেখা যায়। সুবিধার তুলনায় জাতিভেদ থাকার অসুবিধাই বেশী। প্রাচীনকাল হইতে এই যে জাতি-বিভাগ চলিয়া আসিতেছে, ইহা একেবারে দূরীভূত হওয়া সম্ভবপর নহে; তাই প্রত্যেক গণ্ডী আপনাপন সুবিধামত গঠিত করিয়া লইলে সমগ্র হিন্দু-সমাজই উন্নত হইয়া পড়িবে। কারণ বিশাল হিন্দু-সমাজ এই গণ্ডীরই সমষ্টি, ব্যষ্টি লইয়াইসমষ্টি।

প্রতীক্ষা।

———(•)———

লেখক—শ্রীকৃষ্ণনাথ মিত্র।

কত যে বরষ্ হ'য়েছে অতীত
তবুও পাইনি দেখা।
এজীবনে কিগো আর কি হবে না
নাই কি ললাটে লেখা।
নয়নের জল করে ছল ছল
বক্ষঃ ভাসিছে নীরে—
হে মোর সাধনা! বঞ্চিয়ে কেন
স'রে যাও অতি দূরে?
সকল সময় সকল কাজেই
থমকি থমকি চাই;
কি ছিল আমার কি যেন হারাই
মন সদা কাঁদে তাই।
ঘুমহীন রাতি চ'লে গেছে কত
চক্ষু অসাড় তায়;
তবু চেয়ে থাকি শূন্য পরাণে
তোমার প্রতীক্ষায়।
এ জীবন মোর বঞ্চনাময়
এ যে ত বদ্ধ কান্না।
হৃদয়-উৎস শুকায়ে গিয়াছে
রুদ্ধ হ'য়েছে ধারা।
আমার জীবনে নব বসন্তে
পিক কি গা'বে না আর,
স্বর কি সে তার হারিয়ে ফেলেছে
কণ্ঠ রুদ্ধ তার।

হে চিরপ্রবাসী, নও কি প্রয়াসী
হৃদয়ে লভিতে স্থান ?
আসন বিছায়ে পথপানে চেয়ে
চোখ করে হান্ ফান্।

হিন্দুর পলিটিক্স।

—(০)—

[লেখক—শ্রীদীনেশ চন্দ্র লাহিড়ী]

"পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স্ নাই। "জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!" ইহাই তাহাদের পলিটিক্স্। তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স্ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এদেশের মাটীতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।"

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র একদিন বড় দুঃখে মর্ম্মন্তুদ-ভাষায় আক্ষেপ করিয়া কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাই ভারতের এই সঙ্কটসময়ে স্বতঃই মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়,—বাস্তবিকই কি তাই, বর্ত্তমান যুগে হিন্দুর কি পলিটিক্স নাই ? থাকিবে কি করিয়া ? যে জাতির অর্দ্ধেক মরে ম্যালেরিয়ায়, অর্দ্ধেক মরে অনাহারে অর্দ্ধাশনে, সে জাতির আবার পলিটিক্স ?

সুদূর অতীত-যুগের কথা আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে,—পলিটিক্স যদিও ছিল, তাহার স্বরূপ অন্যরূপ এবং সমাজের মস্তক—তপোবল-সম্পন্ন, কূট, অধ্যাত্মতত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ ছিল ;—উহাই সার্ব্বজনীনভাবে— উন্মুক্ত উদারভাবে সর্ব্বজাতির আলোচনার বিষয় ছিল না। জনসাধারণ রাজনীতিকে বড় বুঝিতেও চাহিত না,—কিন্তু ধর্ম্মকে সকলেই মনেপ্রাণে অনুভব করিত, তাহাকে ভয় ও মান্য করিয়া চলিত।

মুসলমানের পয়গম্বর যখন ধর্ম্মপ্রচার করিতে গেলেন, তখন তাঁহার একহস্তে কোরাণ, অন্যহস্তে তলোয়ার; হয় কোরাণ গ্রহণ করিয়া ইসলামের

বিরাট্ পতাকাতলে সঙ্ঘবদ্ধ হও,—নতুবা প্রাণ দাও। কিন্তু হিন্দুর মত ও ধর্ম্ম যখনই প্রচারিত হইয়াছে,—তখনই উহা সাম্য, মৈত্রী, প্রেম, ভালবাসা ও শান্তির পূত বারিধারাদ্বারা, বলপূর্ব্বক কিম্বা অস্ত্রদ্বারা নয়। তাই দেখা যায় পৃথিবীর অন্যান্য জাতির পলিটিক্স ভারতীয় হিন্দুজাতির পলিটিক্সের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র রকমের। ইউরোপের অন্যান্য জাতি বর্ত্তমান যুগে যে রাজনীতির সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন, উহাতে ধর্ম্মের শান্তভাব আদৌ নাই। ধর্ম্ম ও রাজনীতি সে দেশে পৃকক্ভাবে বিদ্যমান এবং রাজনীতির জন্যই যেন বাঁচিয়া আছে, ধর্ম্মের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্কই নাই! কিন্তু ভারতীয় হিন্দুর রাজনীতি ধর্ম্মের সঙ্গে পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে বিরাজিত; একটীকে বাদ দিয়া অপরটীকে আশ্রয় দিতে চাও,—সম্পূর্ণ বিফল হইবে। ইহার প্রমাণ—মাহাত্মা গান্ধীর "অসহযোগ" আন্দোলন। বিলাতী পলিটিক্সের বেদীর উপরে এই আন্দোলনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়া আমাদের দেশ উহা হজম করিতে পারে নাই তাই মহাত্মাজি এক বৎসরের জন্য আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টায় পুনরায় বর্ণাশ্রমের শান্ত উদার আশ্রয়তলে ফিরিয়া গিয়াছেন, যোগী-গুরু অরবিন্দ এখনও ধ্যানমগ্ন।

ভারতের হিন্দু শান্ত নিরীহ জাতি; অস্ত্রের ঝাঞ্ঝা, রাজনীতির তীক্ষ্ণ চালবাজি সার্ব্বজনীনভাবে গ্রহণ করিবে না, ইহা ভারতের আর একজন তপস্বী জ্ঞানী গুরু ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বলিয়াছিলেন "আমেরিকা', ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে সামান্য একজন কৃষকের নিকট রাজনৈতিক-বিষয়ে একটী প্রশ্ন কর, সে তৎক্ষণাৎ চটপট্ উহার উত্তর দিয়া বসিবে, কিন্তু ভারতীয় হিন্দুর ইতর শ্রেণীর একটী লোককে সেই প্রশ্ন করিলে সে তাহার উত্তর দিতে পারিবে না; কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী প্রশ্ন কর, সে তৎক্ষণাৎ উহার উত্তর দিবে। একহস্তে দৃঢ়ভাবে ধর্ম্মকে ধরিয়া অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিবার, তাহা শিক্ষা কর, কিন্তু মনে রাখিও যে, সেইগুলিকে হিন্দুজীবনের সেই মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে।"

তাই আজ আমাদের ইউরোপীয় পলিটিক্স্ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মের সুদৃঢ় ছাঁচে উহাকে ঢালাই করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে;—নতুবা উহা ব্যবহারোপযোগী হইবে না। আবার এরূপ ধর্ম্মের সহিত পলিটীক্স্‌কে মিশাইতে

হইবে, যদ্দারা সমগ্র ভারতে বিরাট্ নেশন গড়িয়া উঠে,—যে নেশনের পতাকা-তলে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান্, জৈন, ব্রাহ্ম, বাউল, আউল, বৈষ্ণব, শৈব, ইহুদী ইত্যাদি ভারতের ছত্রিশ কোটী জাতি আসিয়া সমবেত হইতে পারে। এরূপ বিরাট্ সার্ব্বজনীন—সাম্যও মৈত্রীর ধর্ম্ম কি কখনও ভারতে গড়িয়া উঠিতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে, ঐ শুনুন তাহার ইঙ্গিত,—দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে জনৈক সর্ব্বস্বত্যাগী তপোবল-সম্পন্ন সন্ন্যাসী—কি বাণী ভারতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। "ত্যাগ ও সেবা,—উভয়ই ভারতীয় সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম-জীবনের পক্ষে অসাম্প্রদায়িক অবলম্বন। তুমি যে সম্প্রদায়েরই সাধক হও,—ত্যাগ ও সেবার দ্বারা নিজ ধর্ম্ম-জীবন পরিপুষ্ট করিয়া ভারতীয় নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সহায়তা করিতে পার এবং হৃদয় হইতে সংক্রামক আধুনিক দোষ দূর করিয়া ও 'মতুয়ার বুদ্ধি' নাশ করিয়া নেশনের পুনর্গঠনে যোগদান করিতে পার।"

আজিকার এই ঘোর দুর্দ্দিনে ইহাই হিন্দুর পলিটিক্স্, অন্য পলিটিক্সের গাছ সত্য সত্যই ভারতে গজাইবে না। পর সেবাদ্বারা পরের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারিবে, দুর্দ্দিনে তাহার প্রাণের উপর যে স্বরাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে,—সেই স্বরাজই স্থায়ীভাবে টিকিয়া যাইবে। স্বরাজ বা আত্মার চরম মুক্তিই—ভারতের একমাত্র পলিটিক্স্,—সমগ্র হিন্দু-জাতির রাজনীতির তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা গ্রীস্-সম্রাট্ আলেক্জাণ্ডার স্তম্ভিত হইয়াছিলেন সামান্য একজন উলঙ্গ শুষ্ক-দেহধারী সন্ন্যাসীর নিকট। যাহার প্রভাবে বিস্মিত হইয়া তিনি সেই সন্ন্যাসীকে ধনমানের প্রলোভন দেখাইয়া নিজদেশে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী অর্থমানাদির প্রলোভনের কথা শুনিয়া হাস্য-সহকারে গ্রীস্ যাইতে অস্বীকৃত হইলেন; তখন সম্রাট্ নিজ রাজপ্রতাপ প্রকাশ করিয়া "যদি আপনি না আসেন, আমি আপনাকে মারিয়া ফেলিব।" তখন সন্ন্যাসী বলিলেন "তুমি এখন যেরূপ বলিলে, জীবনে এরূপ মিথ্যা কথা আর বল নাই। আমায় মারে কে? জড়জগতের সম্রাট্, তুমি আমায় মারিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। আমি চৈতন্য-স্বরূপ অজ ও অক্ষয়; আমি কখন জন্মাই নাই কখন মরিবও না; আমি অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ। তুমি বালক, আমায় মারিবে? ইহাই প্রকৃতি তেজ এবং এই তেজই হইবে—

"হিন্দু-পলিটিক্সের প্রধান অঙ্গ।"

———0———

সামাজিক অত্যাচার।

লেকখ—শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

সমাজে অত্যাচারের সংখ্যা নাই, কিন্তু আজকাল সামাজিক অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে বিবাহে পণপ্রথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। নব-শাখ জাতিমধ্যে অর্থাভাবে কন্যাসংগ্রহ করিতে না পারায় ক্রমশঃ বংশ লোপ হইতেছে। আর শ্রেষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদিগের মধ্যে কন্যার বিবাহে দারিদ্র্য উপস্থিত হইতেছে। কন্যার পিতাকে পীড়ন করিয়া বরের পিতা অর্থগ্রহণ করেন। উহা কোন শাস্ত্রসঙ্গত বা নীতিসঙ্গত রীতি নহে, বরং অধর্ম্মজনক কার্য্য বলা যায়। কন্যা-পক্ষীয়েরা সন্তুষ্টচিত্তে যাহা দেন, তাহা অগ্রাহ্য নহে, তবে পীড়ন করিয়া আদায় করা নীতি বহির্ভূত। নিজ সমাজকে বাঁচাইতে হইলে, লালসার শাণিত অস্ত্র এখন কসায়খানা হ'তে দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। ভ্রাতার কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া শোণিত পান করা উচিত নহে। পণপ্রথারূপ অত্যাচার বহুদিন নীরবে চলিতেছে, এখন অসহ্য হওয়ায় অনেকে অত্যাচার নিবারণের জন্য রাজার নিকট আইন চাহিতেছে। আইন হইলেই যে, অত্যাচার শেষ হইবে ইহা মনে করা যায় না। একমাত্র গুরু ও পুরোহিত মহাশয়েরা ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে এবং সামাজিক শাসন বিধিবদ্ধ হইলে তবে যদি অত্যাচারের নিবৃত্তি হয়, নচেৎ নহে। অনেকে কন্যাদায়ে বিপন্ন হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন, অথবা বাস্তুবাটী বিক্রয় করিয়া কাশীর ছত্রে নাম লিখাইয়াছেন, ইহা শুনা যায়।

যেমন মেছ-বাজারে জেলেনী, মাছ পচাই হোক্ আর রসাই হোক্ সে বারআনা প্রতি সের লইবেই। তোমার বিশেষ গরজ বলিয়া সেই দর দিয়াই লইতে হইবে। এও সেইরূপ, তোমার কন্যা সেয়ানা হ'য়েছে, বিবাহ দিতেই হইবে। এ ত পাশ্চাত্য ভূমি নহে, যে ইচ্ছা করিলে কন্যা অনূঢ়া থাকিতে পারে। এখানে তুমি মর আর থাক, তোমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। নচেৎ দয়ালু সমাজ তোমায় ত্যাগ করিবে। সুতরাং আমি যে দর দিব তাহা তোমাকে পূরণ করিতেই হইবে। নচেৎ অন্যত্র দেখিয়া লও। সাদা কথা—যেহেতু তুমি কন্যার পিতা, তজ্জন্য তুমি

মহাপাতকী। আমি নৈকষ্য-কুলীন, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তারপর ছেলে আবার পাশকরা, তবে আমার দাবীর মত টাকা না দিবে কেন? কিন্তু দেবীবর ঘটকের কৌলীন্য মর্য্যাদা নির্দ্দেশ সময় হ'তে কুলে পোকা লাগিয়া গিয়াছে। আর এখন মুখে করা যায় না। তাতে কি? তোমার গরজ বেশী, সুতরাং তুমি টাকা দিতে বাধ্য। বহু-বিবাহ-রাক্ষসী এদেশের শুভাদৃষ্ট বশতঃ বহুদিন মরিয়াছে, এখন পণপ্রথা পিশাচীর নিষ্ঠুর অত্যাচারে সমাজ "ত্রাহি" "ত্রাহি" ডাক ছাড়িতেছে। এ পিশাচী কতদিনে মরিবে কে জানে। মনুষ্যের পুত্র ও কন্যাই হয়, ভাগ্যগুণে কাহারও কন্যার সংখ্যা বেশী হয়। বেচারী সামান্য উপার্জ্জন করে, অনেকগুলি কন্যা, এখন তাহার উপায় কি? সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও যে তাহার দায় হ'তে অব্যাহতির উপায় নাই। দয়ালু সমাজ বলিবেন, হয় সে কন্যা বিক্রয় করুক, অথবা বারাঙ্গনা-গৃহে বিলাইয়া দিক্। বারাঙ্গনা-গৃহে বৎসরে কত যে কন্যা যাইতেছে তাহার সংখ্যা ক'জন রাখেন?

অকাল-বৈধব্য, ভ্রূণহত্যা পিশাচের অভিনয়, বিধিমত মুখে চূণ-কালী পড়িতেছে, তাহাতে হিন্দু-সমাজের ঘৃণা বা লজ্জা নাই। ছেলের বিবাহের বেলায় মুরুব্বিগিরি দেখা যায়। কথিত পণপ্রথায় যে কি ক্ষতি হইতেছে, তাহা সাধারণের অবগতি নাই। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত দরিদ্র। অথচ সেই দেশে পণপ্রথা বিদ্যমান। দরিদ্রপ্রধান দেশে আরও বেশী দারিদ্র্যবৃদ্ধি করা কি সঙ্গত? আজ সমান্য পল্লীগ্রামেও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ৫০৲ টাকার কমে মাস যায় না। হয়ত তাহার আয় ২৫৲ বা ৩০৲ অপর ২০৲ টাকা তাহার মাসিক ঋণ। সেই দুই এক হাজার টাকা সহসা কোথা হ'তে সংগ্রহ করিবে? ইহা যদি সমাজের লোক না বুঝেন, তবে সমাজ ধ্বংস হইবে। দরিদ্রবহুল সমাজ কোনও উন্নতিকর কার্য্য করিতে পারে না। এমনকি তাঁহাদের বাঁচিবার প্রয়োজনীয় দ্রব্য পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করিতে পারে না। আধুনিক শিক্ষিত যুবকগণ পণপ্রথার অবৈধ ভাব বুঝিতে পারেন, দুই এক স্থানে সভাসমিতিও হয়, কিন্তু সবাই কসায়খানার গৃহ হ'তে এক পদও স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইতে পারে না। যে স্থানে আসিলে, বিবেক-বুদ্ধি সব বিলুপ্ত হইয়া যায়, রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা সামাজিক দোষ নিবারণার্থ আন্দোলন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সামাজিক দোষ পরিহার না করিলে, সমাজ ক্ষীণবল হইয়া ধ্বংস হইয়া যায়।

শাস্ত্রে অষ্টপ্রকার বিবাহের উল্লেখ দেখা যায়। আজকাল ব্রাহ্মণাদি সমাজে যে বিবাহ চলিতেছে, উহাকে ব্রাহ্ম-বিবাহ কহে। কন্যাকে আচ্ছাদন ও অর্চ্চনা করিয়া শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন বরকে ডাকিয়া কন্যা দান করাকে ব্রাহ্ম-বিবাহ কহে। তাহাতে বরপক্ষের অর্থ লইবার কথা নাই। তবে সমর্থ ব্যক্তিরা বিবাহকালে কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ, ধন বা ভূমি দিতে পারেন, ইহা বর্ণিত আছে। বরের ওজনে স্বর্ণ, অর্থ লওয়া মাংস বিক্রয় কহে। পূর্ব্বে আমি যে কসায়খানার কথা বলিয়াছি, তাহাই সত্য কিনা এখন বুঝুন। বিবাহ দিয়াই কন্যার পিতার নিস্তার নাই, তারপর সম্বৎসর ধরিয়া তত্ত্ব করিতে হইবে। সে তত্ত্ব করিতে কন্যার পিতা আত্মতত্ত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া পাগলপারা হইয়া যান। বাক্যবাণের নিশিথ আঘাত প্রতিনিয়তই তাঁহাকে সহ্য করিতে হয়। যাঁহারা নিজেকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা সমাজের উপর এতাদৃশ অমানুষিক অত্যাচর করেন, ইহাই আশ্চর্য্য। বোধ হয় স্বার্থান্ধ হওয়ায় তাঁহাদের বিবেকবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়। হিন্দু-সমাজের নেতৃগণ এতাদৃশ নির্ম্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেন যে দণ্ডায়মান হইতেছেন না তাহা বুঝিতে পারি না। গুরু ও পুরোহিত মহাশয়দিগের নির্ভয়ে এখনি এই অত্যাচারের বিলোপসাধনার্থ বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। নচেৎ আইনের দ্বারা কিছু হইবে না।

চলিত কথায় বলে, ভুঁড়ী নষ্ট হইলে মুড়ী নষ্ট হয়। অর্থাৎ উদরের গোলযোগ ঘটিলে, মাথারও গোল ঘটে। আমাদের মাথা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ, তাঁরা কালমাহাত্ম্যে এখন ধনীর দ্বারস্থ। সুতরাং ধনীর ইঙ্গিতে এখন তাঁহারা পরিচালিত হইতেছেন। ধনীর অত্যাচার সকল দেশেই তুল্য, তাহারা ধনবলে আপন স্বার্থ সাধন করেন। কিন্তু, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যদি নিজ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্মান ও গৌরব সমধিক বৃদ্ধি হয়। আর যাঁহারা ধর্ম্মের পরিচালক, তাঁহারা ভীত হইলে চলিবে কেন? এখনও এমন দিন আসে নাই যে, হিন্দু-সমাজ গুরু-পুরোহিত ত্যাগ করিয়া ছেলেমেয়ের বিবাহাদি দিতে পারেন। সমাজের অত্যাচার নিবারণার্থ যদি তাঁহারা এতটুকু তেজস্বিতা না দেখাইতে পারেন তাহা হইলে, সমাজ নষ্ট হইয়া যাইবে। কন্যা সেয়ানা হইলে, হিন্দু-সমাজের কন্যার পিতার মনে যে ভীতিসঞ্চার হয়, তাহা মৃত্যুভয় হ'তেও সমধিক ভয়ঙ্কর। সে তখন বলিদানার্থে আকৃষ্যমাণ

ছাগশিশুর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পরস্পর সহানুভূতি পাইবার জন্যই লোকে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। যদি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে, বনে যাইয়া বাস করাই ভাল। অন্নদায় ও কন্যাদায় যুগপৎ সমাজে সমুপস্থিত, এখন লোকে প্রাণ বাঁচাবে না মান বাঁচাবে? আমরা আর হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গিতে চাহিনা। পণপ্রথা অত্যাচারে কত যে ঘৃণিত ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা আর বলিবার যোগ্য নহে। সভ্য সমাজেও যদি এই ঘৃণিত ব্যাপার বন্ধ না হয়, তবে, আর কি বলিব? নীতি, ধর্ম্ম, সামাজিক অবস্থা এসব যাঁহারা পর্য্যালোচনা না করিয়া পরপীড়নে উন্মুখ হন, তাঁহারা সমাজের শত্রু বিশেষ। সহানুভূতিসম্পন্ন হৃদয়বান পুরুষের সমবায় ব্যতীত সমাজের দোষ ক্ষালিত হইবে না।

বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের জনক, বর্ত্তমানের কার্য্যফল ভাবী লোকদিগকেও ভুগিতে হইবে। সুতরাং স্বার্থান্ধ হইয়া সমাজের অনিষ্ট করা বিধেয় নহে। যে, তরুর শীতল ছায়ায় বসিয়া জীবন শীতল করিতে চাই, তাহার মূলচ্ছেদন করিলে, ছায়া পাইব কোথায়? পূর্ব্বে মনে করা যাইত যে, কু-সংস্কারাপন্ন সেকেলে লোকগুলা সমাজ থেকে সরে গেলে, শিক্ষিত সমাজ খুব ভাল হইবে। এখন দেখি উল্‌টা বুঝিলি রাম; শিক্ষিত সমাজ সবাইকে জিতিয়াছে। এক কথায় বরের পিতা পুত্র বিবাহ উপলক্ষে সব বাসনা পূর্ণ করিয়া লইতে চান। হিন্দু সমাজ, পাশ্চাত্য সমাজ নহে, কন্যার ইচ্ছামত পাত্র নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা নাই, অনূঢ়া থাকিয়া স্বদেশ সেবা করিবার পথও নাই। বিবাহ না দিলেই জাতি যায়। সাংঘাতিক ব্যাপার! অগ্রসর হইলে মাথায় লৌহ কবাটের সাংঘাতিক আঘাত লাগে। পাশ্চাৎপদ হইবার পথ নাই। কন্যার বিবাহ না দিলে জাতি যায়। বুঝুন কিরূপ বিষম সমস্যা। অগ্রে সমাজকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অন্য আন্দোলন শেষে করা উচিত। সামাজিক শক্তি ক্ষয় না করিয়া বর্দ্ধিত করাই উচিত। সামাজিক শক্তি বর্দ্ধিত করিতে হইলে, জাতীয় একতা চাই। স্বজাতি প্রতি সহানুভূতি না থাকিলে, একতা জন্মে না।

নানাবিধ অত্যাচারে সমাজের শক্তি ক্ষয় হইয়া পড়িতেছে, তারপর প্রতি-নিয়ত অবৈধভাবে অর্থ শোষণ নীতি চলিতে থাকিলে, সমাজের শক্তি ক্ষয় হইবে। এবং সমাজ ধ্বংশের পথে অগ্রসর হইবে। সুতরাং দুর্নীতি সমাজ হইতে অচিরাৎ যাহাতে দূরীভূত হয় তাহার জন্য সমর্থ ব্যক্তিবর্গের যত্ন করা কর্ত্তব্য। যদি কোন ধনবান ব্যক্তি জামাতাকে কিছু দিতে চান, সে স্বতন্ত্র

কথা। কিন্তু, এত ভরি স্বর্ণ ও দুইহাজার টাকা না পাইলে তোমার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিব না ; এ রীতি চলিতে দেওয়া কখনও শ্রেয়স্কর নহে। যদি দুই চারিজন সহৃদয় ব্যক্তি বিনাপণে পুত্রের বিবাহ দেন, তবে, তাহা দেখিয়াও মতিগতি ফিরিতে পারে। আর যাহার সহিত কুটুম্বিতা করিব গোড়ায়ই তাহার সহিত অসদ্ভাব করিলে, বোধ হয় সে মনোমালিন্য কখনও ঘুচে না। যাহা শাস্ত্রসঙ্গত নহে, নীতিসঙ্গত নহে, ভদ্রতার অনুমোদিত নহে, অথচ সমাজের ক্ষতিজনক, তাহা যত সত্বর সমাজ হ'তে দূর হয়, ততই মঙ্গল। আমার মত অরণ্যে রোদন অনেক হইয়াছে, কিন্তু ফল এ পর্য্যন্ত এক কপর্দ্দকও হয় নাই। এক্ষণে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে সহৃদয় ব্যাক্তিগণের এবং গুরুপুরোহিতদিগের যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে এবং যুদ্ধে জয়ী হইতে হইবে ; নচেৎ আর পথ নাই।

শ্রীআদ্যনাথ বিদ্যাভূষণ।

ক্ষাত্র-ধর্ম্ম।

লেখক—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার, উকিল।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে চারিটী বর্ণ বিভাগ যুগ-যুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই যে চারিটী বিভাগ ইহা শুদ্ধ হিন্দু জাতির পক্ষেই যে প্রযুজ্য তাহা নহে। জগতের সর্ব্ব জাতিতেই এই বিভাগ দৃষ্ট হয়। এই বিভাগ সমাজের পক্ষে অতীব মঙ্গলজনক। এই চারিটী বিভাগ না থাকিলে সমাজগঠন আদৌ সম্ভবপর হইত না। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অধ্যয়ন, অধ্যপনা যজন ও যাজন, ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম অধ্যয়ণ যজন, বাহুবল দ্বারা রাজ্য রক্ষা ও শাসন ইত্যাদী বৈশ্যের ধর্ম্ম অধ্যয়ন ধনোপার্জ্জন ইত্যাদী শূদ্রের ধর্ম্ম শ্রম দ্বারা উক্ত ত্রিবিধ ধর্ম্মের সেবা। বস্তুতঃ প্রতি সমাজেই এই চতুর্ব্বিধ লোকের অবস্থিতি প্রয়োজনীয়। কেবলমাত্র অধ্যয়ন, যজন, যাজন দ্বারা সমাজ চলিতে পারে না। দেশের সুশৃঙ্খলা ও বিদেশী

আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিতে এবং সমাজ সুশৃঙ্খল রাখিতে হইলে ক্ষাত্র ধর্ম্মের প্রযোজন। সমাজকে উন্নত, দেশের লোককে ধনশালী ও স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা চালাইতে সক্ষম করিতে হইলে ধনোপার্জ্জন বিশেষ প্রয়োজন। আর যাহারা এই সমস্ত কার্য্য করিবে তাহাদের সেবা নিরত লোকের প্রয়োজন কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে চারি বর্ণের লোকেরই প্রয়োজন।

দেশ যখন অবনতির পথে যাইতে থাকে তখনই সমাজে এই চতুর্ব্বর্ণের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। যে সমাজে কেবলমাত্র বিদ্বান্ লোক আছে অর্থাৎ যাহাতে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা শূদ্র আছে সে দেশ ক্ষাত্র শক্তির অভাবে পরাধীনতা শৃঙ্খলে যে আবদ্ধ হইবে তাহাতে আর কোন বাধা নাই। সেইরূপ যে দেশে কেবলমাত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র আছে সে দেশ বুদ্ধিহীনতার জন্য কেবলমাত্র বাহুবল বা ধনবন্ত হইয়া অন্য জাতির সহিত জীবন সংগ্রামে বহুদিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। পুরাকালে মুনি-ঋষিগণ জপ তপ লইয়া থাকিতেন কিন্তু তাঁহাদিগকে অন্যান্য জাতি হইতে রক্ষা করিত ক্ষত্রিয়েরা। ভারতবর্ষ ক্ষত্রিয় শূন্য হওয়ায় আজ পরাধীন, অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য সকলেরই ধর্ম্ম লোপ পাইয়া সকলে শূদ্রপদবাচ্য হইয়াছে। যতদিন দেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ধর্ম্ম প্রবল না হইবে ততদিন দেশের শুভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবলমাত্র অধ্যয়ন বা কেবলমাত্র বাণিজ্য দ্বারা দেশের মঙ্গলজনক কার্য্য সম্পন্ন হইবে না।

ক্ষাত্রধর্ম্ম দেশ-মধ্যে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। ক্ষাত্রধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে সমাজের ব্যক্তিগণকে সুস্বাস্থ ও বলশালী করিতে হইবে। সুস্থ ও বলবান দেহ না হইলে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য কোন ধর্ম্মই প্রতিপালিত হইতে পারে না—শূদ্র ধর্ম্মও নহে। ক্ষাত্রধর্ম্ম দ্বারা কেবলমাত্র যুদ্ধবিদ্যা সূচিত হইতেছে না। ভারতের অবনতির প্রধান কারণ শারীরিক বলের অভাব। শারীরিক বলের অভাবে মানসিক বলের হ্রাস হয়, দুর্ব্বল শরীরে বলবান মন কখন বাস করিতে পারে না। সাহস মানসিক বৃত্তি বটে কিন্তু তাহার অবস্থিতি শারীরিক বলের উপর। এই শারীরিক বল অর্জ্জন করিতে হইলে বাল্যকাল হইতে তাহার আরাধনা করিতে হয়। বিদ্যা অর্জ্জনে যেমন তপস্যা চাই শারীরিক বল অর্জ্জনেও তদ্রূপ তপস্যার প্রয়োজন। বিদ্যার্জ্জন দ্বারা

যেরূপ জ্ঞানের প্রসার হয়, মানুষ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য উপলব্ধি করিতে পারে; শারীরিক বল অর্জ্জনের দ্বারাও তেমনি মানবের সাহস, ধৈর্য্য, বীরত্ব প্রভৃতি বৃত্তির স্ফুরণ হয়। এদেশ ক্রমশঃ যেরূপ অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িতেছে তাহাতে আমাদের প্রতি পরিবারের কর্ত্তব্য হইতেছে তাহাদের সন্তানসন্ততিকে যে পরিমাণ কষ্ট স্বীকারে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার অন্ততঃ অর্দ্ধেক ক্লেশ স্বীকারে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের মধ্যে শারীরিক বলের চর্চ্চা না থাকায় যত ক্ষতি হইয়াছে বোধ হয় শরীর পাত না করিয়া তাহার শতাংশের একাংশ বিদ্যা উপার্জ্জন করিলে তত ক্ষতি হইত না। "শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" এই মন্ত্র আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা বালক বালিকার বিদ্যা শিক্ষায় যত ব্যস্ত তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিতে তাহার একাংশও ব্যস্ত নহি। ইংরাজজাতি পড়াশুনার যে পরিমাণ আদর করে তাহার শতগুণ আদর করে খেলা ধুলায়।

সমাজ গঠিত হয় লোকের দ্বারা, মানবের ব্যক্তিগত সমষ্টিই সমাজ। সমাজের ব্যক্তিগণ দুর্ব্বল হইলে সে সমাজও দুর্ব্বল হয়। দুর্ব্বল দেহে সৎ গুণের স্থান কোথায়? দেহ দুর্ব্বল হইলে মন দুর্ব্বল হয়। মন দুর্ব্বল হইলে তাহা হইতে সৎবৃত্তি অন্তর্হিত হয়। হিন্দু জাতির মধ্যে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে শারীরিক বলের চর্চ্চা নাই তাহার ফলে তাঁহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন আর সেই দুর্ব্বল লোকের দ্বারা গঠিত সমাজ সর্ব্বপ্রকার অসদ্‌গুণের আকর হইয়া উঠিতেছে। একতা সমাজ হইতে বিদূরিত হইয়াছে। কেহ কাহার ভাল ইচ্ছা পোষণ করেন না ব্রাহ্মণ বৈদ্যকে দেখিতে পারেন না। বৈদ্য কায়স্থকে হিংসা করেন, একজাতি অন্য জাতির উন্নতি পছন্দ করেন না। এক জাতি অন্য জাতিকে স্নেহ বা ভালবাসার চক্ষে দেখেন না; জাতিভেদ উঠিয়া যাওয়া দূরের কথা ক্রমশঃ এত দৃঢ় হইতেছে যে এক জাতি অন্য জাতির প্রতি সম্যক ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া উঠিতেছেন। আর তাহার ফলে দলাদলি, এই দলাদলি, কোথায় না—গ্রামে গ্রামে দলাদলি, সহরে দলাদলি রাজনীতি ক্ষেত্রে দলাদলি, বিদ্যাক্ষেত্রে দলাদলি, চাকুরেয় চাকুরেয় দলাদলি, উকিলে উকিলে দলাদলি, দোকানদারে দোকানদারে দলাদলি। এই দলাদলির ফলে কেহ কাহার কথায় আস্থাবান নহেন, কেহ কাহার অধীনতা স্বীকারে সম্মত নহেন; সকলই স্ব স্ব প্রধান। আর তাহার ফলে সমাজ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইতেছে। ফলে কি ক্রেতা, কি বিক্রেতা কাহারও কাছে উপযুক্ত

সম্মান পাইতেছে না। কি দেশে, কি বিদেশে কেহ তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিতেছে না।

জাতির উন্নতিসাধন করিতে গেলে জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। জাতির মধ্যে এমন সব নেতার উদ্ভব হওয়া প্রয়োজন যাহারা এই জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ বা শ্রেণী একত্র করিয়া এক বৃহৎ জাতিতে পরিণত করিতে সক্ষম হন। রাজনীতি বা সমাজ-নীতি যে কোন ক্ষেত্রেই হউক না কেন সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে সে জাতির উন্নতি সুদূর-পরাহত হইবে।

এই যে আজকাল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটী সংঘর্ষণের ভাব জাগিয়া উঠিতেছে। কেহ কেহ বলেন ইহাতে তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ আছে এবং তাঁহাদের ইঙ্গিতেই ইহা হইতেছে। জগতে প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করে আর যখন সর্ব্বত্রই জীবন-সংগ্রাম দৃষ্ট হয় তখন এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমই বা এ ক্ষেত্রে ঘটিবে কেন? ইহাতে হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতির যত দোষই থাকুক, হিন্দুর পক্ষে সর্ব্বাগ্রে দেখা প্রয়োজন তাহাদের অভাব কোথায় এবং এই জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে হইলে বা জয়লাভ করিতে হইলে তাহাদের পক্ষে কি কর্ত্তব্য? তাহাদের কর্ত্তব্য যে কি তাহা তাহারা যে না বুঝেন তাহা নহে কিন্তু উপায় অবলম্বন তাহাদের পক্ষে বড়ই কষ্টসাধ্য। উপায় যে একতা এবং উপায় যে তাহাদের মধ্যে ক্ষাত্র-ধর্ম্মে প্রসার তাহার আর দ্বিতীয় মত নাই। এই ক্ষাত্র-ধর্ম্মের প্রসার করিতে গেলে হিন্দুর প্রত্যেক লোককে স্বাস্থ্যবান হইতে হইবে প্রত্যেককে শৈশব হইতে ব্যয়ামকুশল হইতে হইবে, প্রত্যেককে শারীরিক বলের জন্য তপস্যা করিতে হইবে, আরাধনা করিতে হইবে।

এই যে সেদিন পাবনায় এতগুলি হিন্দুপরিবারের উপর মুসলমানের দ্বারা অত্যাচার সংঘটিত হইল ইহা কি কখন সম্ভবপর হইত যদি হিন্দুর মধ্যে ক্ষাত্র-ধর্ম্মের অভাব না হইত। এই যে লুঠ তরাজ হইল কৈ খবরের কাগজে কোথায়ও ত দেখি না যে দুর্ব্বৃত্তগণ বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কৈ কোথায়ও ত একথা শুনি না কেহ একখানা লাঠি লইয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। কেহ কি একখানা লাঠী লইয়া সম্মুখীন হইতে পারিত না? পারিত না, কারণ পারিলে কি কেহ স্বেচ্ছায় স্বীয় অর্থ অন্যকে লুণ্ঠন করিতে দেয়, পারিলে কি কেহ স্বেচ্ছায় আজ পথের ফকির হয়, পারিলে কি কেহ স্ত্রী কন্যাকে শ্বাপদ সঙ্কুল বনে জঙ্গলে পাঠাইয়া অপমানের হস্ত হইতে রক্ষা

করিতে চেষ্টা পায়? পারে না কেন? পারে নাই কেন? সেখানে কি মানুষ ছিল না? সেখানে কি রক্ত মাংসে গঠিত দেহধারী জীব ছিল না? ছিল কিন্তু সে দেহে বল নাই, সে দেহে সাহস নাই, সে দেহে তেজ নাই, সে দেহ নির্জীব। সে দেহে ক্ষাত্র-বীর্য্য নাই। এই ক্ষাত্রবীর্য্যের অভাবে আজ দেশের এই দুর্গতি। ক্ষাত্রবীর্য্যের অভাবে আজ একটী বড় আশ্রয়ে বাস করিয়াও তাহারা নিরাশ্রয়, দেশে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট থাকিতেও তাহাদের ধনসম্পত্তি রক্ষিত হয় নাই, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত থাকিতেও অত্যাচারীর হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ নাই। রক্ষা অপরে করিতে পারে না; যেমন মানব নিজের মানসিক বল দ্বারা নিজেকে পাপ পথ হইতে রক্ষা করে তেমন নিজের শারীরিক ও মানসিক বলই কেবলমাত্র মানুষকে নির্য্যাতিত হইতে রক্ষা করিতে পারে। যাহারা নির্য্যাতনকারী তাহারা যদি বুঝিতে পারে যে যাহার বা যাহাদের উপর নির্য্যাতন করিতে তাহারা অগ্রসর হইতেছে তাহাদের বল আছে, কৌশল আছে, তাহাদের নিকট গমন করিলে নিজেরাই নির্য্যাতিত হইবে তখন সেই কাপুরুষের দল ফিরিয়া আইসে। এই ভয় তাহাদিগকে দেখাইতে হইলে নিজেদের বলশালী হইতে হইবে, নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন যে কাবুলী একাকী নির্বান্ধব বিদেশে গমন করিয়া তাহার দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছে এবং টাকা আদায় করিতেছে। কেহ তাহার উপর অত্যাচার করে না, কেহ তাহার টাকা বাকী রাখে না, কেহ তাহার টাকা বা দ্রব্যাদি কাড়িয়া লয় না। একাকী একজন কাবুলীকে কেহ না আঁটীতে পারে কিন্তু দশ বিশজনে ত পারে, তবে তাহার উপর কেহ অত্যাচার করিতে অগ্রসর হয় না কেন? কারণ সে কাবুলী। কারণ তাহার শরীরে সামর্থ আছে, তাহার মনে বল আছে, তাহার মনে ভয়ের লেশমাত্রও নাই। পাবনায় হিন্দুগণকে যদি দুর্ব্বৃত্তগণ কাবুলীর ন্যায় মনে করিত তবে তাহাদের গৃহাদি লুণ্ঠন করা ত দূরের কথা তাহাদের নিকটেও ঘেসিতে পারিত না। তাই বলিতেছিলাম চাই শারীরিক বল। চাই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম।

কোন সামান্য কার্য্যও অনেক স্থলে একদিনে সংগঠিত হয় না অতি বড় এই যে জাতি-গঠন কার্য্য ইহা কখন অল্পদিনে সংগঠিত হওয়া সম্ভবপর নহে। এত বড় হিন্দু জাতি, বহু পুরাতন, সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মে শতধা বিভক্ত, বহু পঙ্কিল কুসংস্কারে মোহাচ্ছন্ন, ইহাদিগকে একত্র করিতে সময়ের

প্রয়োজন; নেতার পর নেতার আবির্ভাব হইতেছে কিন্তু কেহই ত এ দিকে দৃষ্টি করিতেছেন না ফলে বায়ু-মণ্ডলে দাহ্যমান ঊর্দ্ধগামী উল্কাপিণ্ডের ন্যায় অতি অল্প সময়ে নেতৃগণের অস্তিত্ব সমাজের মন হইতে নিবিয়া যাইতেছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে নেতাগণ যে পথে সমাজকে চালিত করিতেছেন তাহা ঠিক পথ নহে। সমাজ যে উন্নতি পথে ধাবিত হইতে উৎসুক তাহা এই সব নকল নেতার পশ্চাৎ ধাবমান জনসংঘের কার্য্য-বিবরণী আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। একবার এক নেতাকে পরীক্ষা করিয়া জন-সঙ্ঘ দেখিতেছেন, পথ ঠিক হয় নাই তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য নেতার পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। সত্যকার নেতা মিলিতেছে না। যে দুষ্ট-ক্ষত সমাজ-অঙ্গের মজ্জাগত হইয়াছে উপরে উপরে মলমের প্রলেপ দিলে তাহা বিদূরিত হইবে না তাহার জন্য কঠিন ও কষ্টসাধ্য চিকিৎসা চাই। সেই দুষ্ট বিষ সমাজ-অঙ্গ হইতে বিদূরিত না হওয়া পর্য্যন্ত সে ক্ষত শুষ্ক হইবে না, সমাজদেহ সম্যক্ পরিপুষ্ট হইবে না। সুস্থ সবল হইবে না। তজ্জন্য কাহার হয় ত জীবনব্যাপী আরাধনা চাই, এক জীবনে না হইলে আর এক জীবনের প্রয়োজনও হইতে পারে। কথিত আছে বহু কষ্টে বাদসাহ আউরাঙ্গজেব কাশ্মীর দখল করিয়া হুকুমজারি করিয়াছিলেন যে কোন পুরুষ কটিবন্ধ ব্যবহার করিতে পারিবে না, বহু শতাব্দী পরে এই সামান্য আদেশের ফলে দেশের পুরুষ লোক ক্ষাত্র-বীর্য্য শূন্য হইয়াছিল, আলস্যপরায়ণ হইয়াছিল, আউরাঙ্গজেব একটি যোদ্ধৃ জাতিকে আলস্যপরায়ণ অকর্ম্মণ্য জাতিতে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর একটী অকর্ম্মণ্য আলস্য পরায়ণ মরণের পথের যাত্রী সমাজকে কর্ম্মঠ, যোদ্ধা ও কাজের লোক করিতে, সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইলে শতাব্দীর চেষ্টা খুব অধিক সময় বলিয়া মনে হয় না সকল বিষয়ের সহজ পন্থা থাকা সম্ভব নহে কিন্তু বিপথে গমনে এই সব উন্নতি হয় ত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পিছাইয়া যাইতে পারে। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া জাতীয় উন্নতির প্রচেষ্টা দেশ মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে কিন্তু তাহার ফল যে সুখকর হইয়াছে এমত মনে হয় না। এ দেশে প্রধানতঃ দুইটী জাতি হিন্দু ও মুসলমান, এই উভয় জাতির মিলন ভিন্ন জাতীয় উন্নতি সহজসাধ্য নহে। এক জাতি এখনও ক্ষাত্র-ধর্ম্ম হারায় নাই তাহারা সময়ে অসময়ে তাহাদের প্রতিবেশীর উপর ক্ষাত্র তেজ বিকীরণ করিয়া তাহাদের ক্ষাত্রশক্তি বৃদ্ধি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। আর ইহাতে তৃতীয় পক্ষের সুবিধা বই অসুবিধার কোন কারণ নাই।

এই মুসলমান জাতির সহিত মিলন কখন সম্ভবপর হইবে? যখন হিন্দুজাতি তাহাদের ন্যায় ক্ষাত্রশক্তি সম্পন্ন হইবে। দুর্ব্বলের সহিত সবলের, ধনীর সহিত নির্ধনীর, বুদ্ধিমানের সহিত নির্বুদ্ধির বন্ধুত্ব আদৌ সম্ভবপর নহে, ঘটিলেও ক্ষণস্থায়ী হয়। তাই বলিতেছিলাম যাহাতে বালক বালিকা শৈশব হইতেই ব্যয়ামচর্চ্চা করে, কষ্টসহিষ্ণু হয়, মিতাচারী হয় সেদিকে প্রতি পিতামাতার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। লেখাপড়ার দিকে যে পরিমাণ দৃষ্টি দেওয়া হয় শারীরিক বল অর্জ্জনের দিকেও সেই পরিমাণ দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। বাল্য-বিবাহ রহিত করিয়া শিশু মৃত্যুর হার যাহাতে কমিয়া যায় তাহাও দেখা উচিত। এক কথায় ক্ষাত্রশক্তি যাহাতে সমাজে বৃদ্ধি পায় তদ্বিষয়ে প্রত্যেকের খুব দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। আত্মরক্ষার আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। সুতরাং ক্ষাত্রশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩৩শ বর্ষ, ৩৩শ খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | আশ্বিন। | ১৩৩৩ সাল। ১৮৪৮ শকাব্দাঃ

বিশ্ব-গ্রন্থাগার।

লোহাগড়া রামনারায়ণ লাইব্রেরির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে
সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর, এম, এ, বি, এল, সি, আই, ই,

বেদান্ত-বাচস্পতি মহাশয়ের

অভিভাষণ।

চিরতুষার ধবলিত উচ্চ গিরিশৃঙ্গে, উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা বিক্ষোভিত সাগরবক্ষে, শৃগাল-ভল্লুক-সিংহ-ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদাকীর্ণ অরণ্যে, বিহগকূজন মধুরিত, কুমুদ-কহ্লার-কোকনদ পরিশোভিত প্রশান্ত সরোবরে, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড পরিতপ্ত তৃণবিহীন মরুভূমিতে, ব্রীহি-যব-গোধূমপরিপূর্ণ উর্ব্বর শস্য শ্যামল ক্ষেত্রে, বিশাল বিশ্বের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, বিশ্বপতি তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বহস্তে লিখিত অসংখ্য অফুরন্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।

শুধু ধরণীবক্ষে নহে, রবি, শশী, তারা, গ্রহ, উপগ্রহাদির গাত্রেও ঐরূপ অসংখ্য গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। স্থলে, জলে তেজে, মরুতে, ব্যোমে, সর্ব্বত্রই অসংখ্য, অনন্ত গ্রন্থশালা। অসংখ্য রস, অসংখ্য ছন্দ ও অসংখ্য অলঙ্কার দ্বারা এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। প্রতি পত্রে, প্রতি পুষ্পে এবং প্রতি ফলে বিশ্বপতির হস্তলিপি আছে। কিন্তু, এই লিপি উদ্ধার করিবার শক্তি সকলের নাই। যাঁহারা এই লিপি পাঠ করিতে পারেন, তাঁহারাই কবি, ঋষি তাঁহারাই দ্রষ্টা।

প্রাচীনেরা এই পৃথিবীকেই বিশ্বের কেন্দ্রস্থল বলিয়া মনে করিতেন। সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রাদি পৃথিবীকেই প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল। বাস্তবপক্ষে, আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রস্থল সূর্য্য; শনি, বৃহস্পতি, শুক্র, মঙ্গল, বুধ, পৃথিবী এবং নবাবিষ্কৃত গ্রহগণ সূর্য্যের বিচ্ছিন্ন অঙ্গমাত্র এবং তাহারা সকলেই স্বীয় কক্ষে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। চন্দ্র পৃথিবীর একটী বিচ্ছিন্ন অঙ্গমাত্র এবং স্বীয় কক্ষে পৃথিবীর চারিদিকে পরিভ্রমণ করে। বৃহস্পতি ও শনির একাধিক চন্দ্র দৃষ্ট হয়। সমস্ত সৌর জগৎ, অন্য কোন বৃহত্তর জ্যোতিষ্কের চতুষ্পার্শ্বে স্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, সেই জ্যোতিষ্ক কি, তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। আমরা মাত্র একটী সৌর জগতের সন্ধান পাইয়াছি, কিন্তু যুক্তির দ্বারা অসংখ্য সৌর জগতের সত্তা সাব্যস্ত করা যাইতে পারে। আমাদের বাসভূমি পৃথিবী, সৌর জগতের একটী ক্ষুদ্রগ্রহ। স্বয়ং সূর্য্যও আপাত দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র তারকার ন্যায় একটী ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কমাত্র। যাঁহারা জ্যোতিষ্‌শাস্ত্র আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে এই অসীম বিশ্বে আজও পর্য্যন্ত পৃথিবী ভিন্ন অন্য কোন স্থান জীবের বাসোপযোগী হয় নাই। অন্য কোন স্থানেই জীবজগৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। এই হইল পৃথিবীর বিশিষ্টতা। সূর্য্যের অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর পৃথিবীর স্বীয় কক্ষ পরিভ্রমণ কালে কোন সময় চন্দ্র পৃথিবীর অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বীয় কক্ষে পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বে পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্যমণ্ডল অগ্নিময়, চন্দ্রমণ্ডল জলময়। চন্দ্রের স্বীয় জ্যোতিঃ নাই। আমরা যাহাকে চন্দ্রের কিরণ বলি উহা সূর্য্যেরই কিরণ, চন্দ্রের দেহে প্রতিফলিত এবং তাপ বিহীন হইয়া স্নিগ্ধভাবে আমাদের নিকট আসে। সূর্য্যকিরণই আমাদের অগ্নি প্রদান করে। পৃথিবীর গর্ভে অগ্নি নিহিত আছে বটে কিন্তু উপরিভাগ তাপরহিত হওয়াতে উদ্ভিদ ও জীবজগতে বাসোপযোগী হইতে সক্ষম হইয়াছে।

পৃথিবীর এই বিশিষ্টতার মধ্যে আর একটী বিশিষ্টতা আছে। সেই বিশিষ্টতা এই যে পৃথিবী মানবের বাসভূমি। খেচর, ভূচর, জলচর সকল জীবের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মানবই পৃথিবীর রাজা। মানব তাহার বুদ্ধিবলে পৃথিবীর সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থকে তাহার সেবায় নিয়োজিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। সিংহ, ব্যাঘ্রাদি প্রাণিগণ তাহার শাসনাধীন। সে দুরারোহ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিতেছে, সাগরবক্ষে অর্ণবপোত ভাসাইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে যাইতেছে, সে বৈদ্যুতিক অগ্নির দ্বারা তাহার গৃহ আলোকিত করিতেছে। সে সমুদ্রকে জয় করিয়া পরিতৃপ্ত হয় নাই, সে আকাশমার্গ জয় করিয়া খেচরের ন্যায় ব্যোমযান সাহায্যে আকাশ পরিভ্রমণ করিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে যাইতেছে। বিদ্যুৎ ও বাষ্পের সাহয্যে কেবল রেল এবং অর্ণবপোত চলিতেছে তাহা নহে, সে উহাদের সাহায্যে কত নূতন নূতন কল কারখানা করিয়া নিজের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিতেছে, তারযোগে সংবাদ প্রেরণে তৃপ্ত না হইয়া বিনাতারে দেশ হইতে দেশান্তরে সংবাদ প্রেরণ করিতেছে। কলিকাতায় বসিয়া কোন একটা কল নাড়িলে বিলাতে সংবাদ চলিয়া যায় এবং ঐরূপ কল পৃথিবীর যেখানে যেখানে আছে সেখানে সেখানে ঐরূপ সংবাদ পাওয়া যায়। সমুদ্রমধ্যে কোন জাহাজ বিপন্ন হইলে অন্যান্য সমস্ত জাহাজকে সেই সংবাদ দিয়া সাহায্য গ্রহণ করা যায়। আদি কবি বাল্মিকী তাঁহার কল্পনায় যে পুষ্পকরথ দেখাইয়াছিলেন, আমরা বর্ত্তমানে তাহা কার্য্যে পরিণত দেখিতেছি। এই সেদিন কোভাম্ সাহেব লণ্ডন হইতে পুষ্পকরথ আরোহণ করিয়া অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করিয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। হিমালয়ের তুষারাবৃত অত্যুচ্চ গৌরীশৃঙ্গ দুরারোহ বলিয়া খ্যাত ছিল। সমুদ্রের সমতল হইতে ২৯০০২ ফিট্ উচ্চ, ২৮০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া আরোহীগণ আর উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু স্যার ইয়ং হাজ্‌ব্যাণ্ড্ বলিয়াছেন যে গৌরীশৃঙ্গ জড় পদার্থ, তাহার এমন কোন উদ্ভাবনী শক্তি নাই যে সে অবশিষ্ট ১০০২ ফিট্ মানবের অধিকার হইতে বিচ্যুত থাকে। গৌরীশৃঙ্গ মানবের আয়ত্তাধীন হইবে। কি জড়জগতে, কি চৈতন্যজগতে মানবের শক্তির সীমা স্থির করা যাইতে পারে না। কেহই ইহা বলিতে পারেন না যে যাহা অদ্য মানবের অসাধ্য তাহা ভবিষ্যতে সাধ্যায়ত্ত হইবে না। যে শক্তির শাসনে এই বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে, যাঁহার শাসনে গ্রহগণ স্বীয় স্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, যাঁহার শাসনে চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ,

তারকাদি পর্য্যন্ত মানবের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে, এই পৃথিবীর অধীশ্বর মানবের শক্তির কোন সময় একেবারে অবসান হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। মানবশক্তি কোন সময় অসীম বিশ্বশক্তি স্পর্শ করিয়া একত্ব সম্পাদন করিতে না পারিলেও সে যে শাশ্বত কাল ঐ অসীম বিশ্বশক্তির দিকে ধাবিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, সুতরাং পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রস্থল, প্রাচীনদিগের এই ধারণা একভাবে প্রমাদপূর্ণ হইলেও অন্যভাবে উহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। লণ্ডনকে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল বলা যায়, কেননা লণ্ডন হইতে এই ব্রিটীশ সাম্রাজ্য সংরক্ষণ বিস্তার সংঘটিত হইতেছে। মানবই এই বিশ্বের সমস্ত বৈভব, সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত আনন্দ উপভোগের একমাত্র অধিকারী। সুতরাং, তাঁহার জন্মভূমি বসুন্ধরাকে বিশ্বের কেন্দ্রস্থল করা ভাববিশুদ্ধের লাঘব হয় না।

মানব পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিপতি হইলেও কেহ যেন মনে করেন না যে মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াই জ্ঞান বিজ্ঞানসম্পন্ন হয়। ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ ক্রম বিকাশের ব্যবস্থা, মানবজাতির জীবনেও তদ্রূপ। এইরূপে একটী জীবানু জাতি বর্ত্তমান মানব জাতিতে পরিণত হইয়াছে, তাহার বিবৃতি করা উপস্থিত বক্তব্য মধ্যে অসম্ভব। সে যে এক সময় সামান্য ক্রিমি ছিল, তৎপর জলচর, স্থলচর হইয়াছিল, সে যে কখন সর্পাকৃতি, কখন বিহঙ্গাকৃতি সম্পন্ন ছিল, সে যে প্রথমে ঋজুভাবে দাড়াইতে পারিত না, সে যে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় হস্তপদের সাহায্যে বিচরণ করিত, তাহার ভাষা যে প্রথমে পশুর ভাষার ন্যায় সীমাবদ্ধ ছিল, মানবের বর্ত্তমান যুগের অবস্থায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা বর্ণনা করা কবি কল্পনারও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সে যে সহস্র সহস্র ভূমি অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার বিশিষ্টতা ছিল এই যে তাহার একটী অন্তর নিহিত শক্তি ছিল যাহা দৃষ্টেতর প্রাণিজগতে ছিল না। সেই অন্তরনিহিত শক্তির বলে সে আজ এই ভূমণ্ডলে একছত্র, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, চক্রবর্ত্তী অধিপতি। এইজন্যই প্রাচীনেরা এই ধীশক্তির প্রদাতাকে প্রত্যহ স্মরণ করা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। "অহোরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত।" "যো ধীয়ো নঃ প্রচোদয়েৎ" —যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রদান করিয়াছেন তাঁহার বরেণ্য মহিমাকে ধ্যান করি—"ভর্গদেবস্য ধীমহি।"

এই ধীশক্তি মানবের বিশিষ্টতা এবং এই ধীশক্তির বলে সে বাক্, শব্দ বা বেদের অধিকারী। মানবের ক্রমবিকাশের সহিত যখন সে বিশ্বের অনন্ত গ্রন্থের সন্ধান পাইল তখন তাহা শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। অধিকার সকলের সমান থাকিলেও সকলে তাহা প্রচালন করে না। বিশ্বগ্রন্থ অধ্যয়ন করা সকলেরই অধিকার ছিল বটে, কিন্তু যাঁহারা এই অধিকার প্রচালনা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ঋষিপদবাচ্য হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের ধ্যান-লব্ধ জ্ঞানফলই শব্দ ব বেদ। তখনও অক্ষর বা লিপির আবিষ্কার হয় নাই, একমাত্র শব্দের দ্বারাই জ্ঞানের আদান প্রদান হইত। শিষ্যেরা গুরুর নিকট যাহা শুনিতেন তাহাই শিষ্যপরম্পরা শ্রুতিরূপে সংরক্ষিত হইত। জ্ঞানভাণ্ডারের পরিবৃদ্ধির সহিত স্মৃতিশক্তির সংরক্ষণে অসমর্থ হওয়ায় লিপির প্রয়োগ আরম্ভ হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে কিরূপে লিপি, চিত্র বা অক্ষরের আবির্ভাব হইল এইস্থলে তাহার বিবৃত অসম্ভব। তৎপরে কিরূপে একপ্রদেশ হইতে অন্যপ্রদেশে সেই লিপির প্রচলন হইল ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা এইস্থলে অসম্ভব। ঐরূপ কিরূপে মানবের ধীশক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাষার আকার ধারণ করিল তাহার ব্যাখ্যাও এইস্থলে অসম্ভব। সুতরাং, আমরা বহুস্তর পরিত্যাগ করিয়া যে স্তরে মানব পর্ব্বতগাত্রে, মৃণ্ময়পাত্রে, কাষ্ঠে, ধাতুফলক ইত্যাদিতে মনোভাব প্রকটিত করিতে আরম্ভ করিল, সেই স্তরে গিয়ে উপনীত হই।

এই হইল বিশ্বপতির বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মানবের পক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয়, বা গ্রন্থালয়ের সূচনা। গুরুর অধীত বিদ্যা যে স্থানে শিষ্যতে প্রদত্ত হয় সেই হইল আশ্রম, অরণ্য বা বিদ্যালয়। গুরুর মুখ হইতে নিসৃত বিদ্যা ভবিষ্যতে বিস্মৃত সম্ভাবনা বিধায় অক্ষরে পরিণত হইয়া গ্রন্থ, পুস্তক বা পুঁথিতে পরিণত হইল। এই সমস্ত পুঁথি তালপত্রে, ভুর্জ্জপত্রে, ধাতু ও কাষ্ঠফলকে লিপিবদ্ধ হইতে থাকিল। বেদ, বেদাঙ্গ অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ, স্মৃতি, পুরাণ, কাব্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি সকলই পুঁথিতে সংগৃহীত হইতে লাগিল। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালেও বহুবিধ বিদ্যার আবিষ্কার হইয়াছিল। ছন্দোগ্য উপনিষদে নারদ সনৎকুমারকে বলিতেছেন যে তিনি বহুবিধ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন :—

"স হোবাচর্গ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাস পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যা-

যে তন্তুগবোহধ্যেমি।" এইরূপ জ্ঞানের বিবৃদ্ধির সহিত শাস্ত্রের সংখ্যারও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দেশে যখন মুদ্রাঙ্কন ছিল না তখন হস্তলিখিত পুস্তকের যে কি আদর ছিল তাহা আমরা আদৌ কল্পনায়ও অনুভব করিতে পারি না। শিষ্যেরা গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া অধীত বিদ্যা পুঁথিতে সন্নিবিষ্ট করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিত। পুঁথি না থাকিলে অধ্যাপনা কার্য্য চলিত না। রঘুনাথের ন্যায় মেধাবী শিষ্য সর্ব্বত্র সুলভ নহে। পুঁথি না থাকিলে স্মৃতি হইতে অধীত বিদ্যা পুনরায় পুঁথিতে সন্নিবিষ্ট করা সকলের পক্ষে সহজ নহে। এই পুস্তকগুলি অতি যত্নের সহিত সংরক্ষিত হইত। বিগ্রহের ন্যায় পবিত্র স্থানে রক্ষিত হইত। সাধারণতঃ, দেবমন্দিরেই এই সমস্ত পুস্তকগুলি দেবতার ন্যায় নিত্য অর্চ্চনা প্রাপ্ত হইত। পাঠ আরম্ভ এবং পাঠ শেষের সময় পুস্তককে প্রণাম করিতে হইত। দৈবাৎ পুস্তকে পাদস্পর্শ হইলে তাহাকে প্রণাম করিতে হইত। লেখনী এবং মসীপত্রেরও ঐরূপ সম্মান ছিল। ভট্ট মোক্ষমূলার গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে সমগ্র ঋগ্বেদ সংগ্রহ করিয়া উহা মুদ্রাঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে সমগ্র ঋগ্বেদ ভারতবর্ষের একস্থানেতে পাওয়া যাইত না। ত্রিভাঙ্কুর, কশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি স্থান হইতে খণ্ড খণ্ড ভাবে সংগৃহীত হইয়া সমগ্র বেদ প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশই বেদবর্জ্জিত প্রদেশ। মহারাজ আদিশূর বৈদিক ক্রিয়ার জন্য কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখনও বঙ্গদেশে বেদ অধীত হয় না। বেদ মুদ্রাঙ্কিত হইবার পরেও বর্ত্তমানে এক এক জেলায় দুই একটী গৃহে বেদ পাওয়া যাইতে পারে মাত্র। আমরা প্রতি কথায় বেদের দোহাই দিয়া থাকি, কিন্তু বেদের বাহ্যমূর্ত্তির দর্শনেও লোলুপ নহি। প্রাচীনকালের কথা পরিত্যাগ করিয়াও আধুনিককালের কথা বলিতে গেলে মহাভারতগ্রন্থও দেশে দুর্লভ ছিল। আমার বাল্যকালে লোহাগড়া গ্রামে শাস্ত্রানুসারে দুইবার মহাভারত পুস্তকের পঠন হয়। ঐ সময়ে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে সমগ্র মহাভারত সংগ্রহ করা অতীব কঠিন কার্য্য ছিল। ফরিদপুর জেলা হইতে মহাভারত সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। ৺প্রতাপচন্দ্র রায় সংস্কৃত মহাভারত প্রথম মুদ্রাঙ্কিত করেন। তৎপরে সংস্কৃত মহাভারত দুই এক স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। লোহাগড়া বিদ্যালয়ে সংস্কৃত মহাভারত আছে। কিন্তু এই পুস্তকালয়ে নাই শুনিয়া আমি অত্যান্ত দুঃখিত হইলাম। তবে শুনিলাম যে কালীপ্রসন্ন সিংহের এবং বর্দ্ধমান রাজবাটীর প্রকাশিত অনুবাদ সংস্করণ দুইটীই আছে। অনেকে বলেন যে সংস্কৃত পড়ার লোক কোথায়। এই কথার

কোন মূল্য নাই। পুস্তকালয়ে কেবল যে সাধারণের পাঠ্যপুস্তক থাকে তাহা নহে, যে সমুদায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে তাহা সংরক্ষিত হওয়া আবশ্যক। পাঠের ও জ্ঞানলাভের সুযোগের ব্যবস্থাও আবশ্যক। যদি একজনও বর্ত্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে সেই পুস্তকের সদ্ব্যবহার করেন, তাহা হইলে পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; দেবমন্দিরে আসিয়া দেবতার পূজা করিবে না আশঙ্কায় কেহ দেবমন্দির প্রতিষ্ঠায় পরাঙ্মুখ হন না। আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই যে প্রত্যেক পুস্তকালয়কেই একটী দেবমন্দির স্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে এবং সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক পুস্তককেই একটী বিগ্রহের তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে। সাধনামার্গে যেমন বিভিন্ন বিগ্রহ বিভিন্ন পথ দিয়া উপগম্যস্থলে লইয়া যায়, গ্রন্থাদিও সেইরূপ বিগ্রহাদির ন্যায় মানবের চিরাভীপ্সিত একগম্য স্থানে বিভিন্ন উপায়ে লইয়া যায়। একই দেবমন্দিরে যেমন বিভিন্ন বিগ্রহের স্থান আছে, তদ্রূপ গ্রন্থমার্গে বিভিন্ন মার্গের গ্রন্থের স্থান আছে। প্রত্যেক গ্রন্থই এক একটী দেবতাস্বরূপ। প্রত্যেক দেবতাই যেমন এক একটী আদর্শ পরিপূর্ণ করেন, প্রত্যেক গ্রন্থও তদ্রূপ।

মন্দিরে আমরা দেবতার প্রতিষ্ঠা করি। অপদেবতার স্থান মন্দিরে নাই, গ্রন্থমন্দিরেও তদ্রূপ অপগ্রন্থ পরিবর্জ্জনীয়। যে গ্রন্থ মানবকে নিম্ন প্রদেশ হইতে ঊর্দ্ধপ্রদেশে লইয়া যাইতে না পারে, যে গ্রন্থ মানবের অসদ্বৃত্তি প্রশমন করিয়া সদ্বৃত্তি উন্মেষণা না করিতে পারে, যে গ্রন্থ মানবের জ্ঞাতব্য বিষয় পরিবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া তাহাকে বিশ্বপতির বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ না হয়, সে সমস্ত গ্রন্থের স্থান কোন গ্রন্থমন্দিরে থাকা উচিত নহে। এই বিশ্ব দ্বন্দ্বাত্মক অর্থাৎ এই বিশ্বে পাপও আছে; পুণ্যও আছে; সুখও আছে, দুঃখও আছে; শীতও আছে, গ্রীষ্মও আছে। অর্থাৎ বিশ্ব ভাল মন্দ লইয়া। অপকৃষ্টের অভাব হইলে উৎকৃষ্টের সত্ত্বা থাকিতে পারে না। কিন্তু, তাই বলিয়া আমাদের অপকৃষ্টের অনুসরণ করিতে হইবে না; উৎকৃষ্টেরই অনুসরণ করিতে হইবে। অপকৃষ্ট সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। জগতে সত্যও আছে, মিথ্যাও আছে, কিন্তু, উহার একটীকে পরিবর্জ্জন এবং অন্যটীকে পরিগ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই শাশ্বত বিধান। আমি নিজে কখন কখন ভগবানের বিধানের দোষ অনুসন্ধান করিয়া নূতন সৃষ্টির কল্পনা করি। ঐ কল্পনার একটী উদাহরণ নিম্নে দিলাম :—

হে আকাশ! ধরাধামে যত অবিচার
অনাচার দেয় ব্যথা মনেতে আমার,

কভু ভাবি মনে মনে থাকিলে শকতি
গড়িতাম নূতন করিয়া বসুমতী,
সূর্য্য মম দহিত না কভু জীবগণে,
নিত্যপূর্ণ চন্দ্র মম শোভিত গগনে,
অতিবৃষ্টি. অনাবৃষ্টি কভু না হইত,
প্রাণিগণ অন্নাভাবে কভু না মরিত,
পৃথ্বী করিত না কভু অগ্নি উদ্গীরণ,
কাঁপিত না ভূমি কভু হইয়া ভীষণ,
বহিত না বায়ু কভু হইয়া প্রবল,
তুষারে মণ্ডিত কভু হোত না অচল,
জীবগণে পরস্পরে হিংসা না করিত,
অকালে কালের গ্রাসে কেহ না পড়িত,
থাকিত না মরুভূমি সর্ব্বত্র উর্ব্বরা,
ধন, ধান্যে পূর্ণ সদা হোত বসুন্ধরা.
সত্যের হইত সদা সর্ব্বত্র বিজয়,
মিথ্যায় সর্ব্বত্র সদা'কাল পরাজয়,
না থাকিত প্রবঞ্চনা চৌর্য্য, ব্যভিচার,
সকলে ধার্ম্মিক হোত সব সদাচার।

এইটী কিন্তু কবির প্রলাপ। এইটী হইল ভগবানের বিধানের মূলতত্ত্বের অনভিজ্ঞতা। মানুষ যদি নূতন সৃষ্টি করিতে চায় তাহা হইলে সে দেখিতে পাইবে যে, যে সনাতন বিধান রহিয়াছে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম করিলেই মহা বিভ্রাট ঘটিয়া উঠিবে। নিত্য পূর্ণচন্দ্র আকাশে উদিত করিতে গেলেই সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর বিভ্রাট ঘটিবে। যাহা আছে তাহা ব্যতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই। বিশ্বপতি বিশ্বরাজ্য বিধানে যে শাশ্বত নিয়ম করিয়াছেন তাহার মধ্যে পাপ ও পুণ্য দুয়েরই স্থান রহিয়াছে। পুণ্যের ঈশ্বর একজন এবং পাপের ঈশ্বর আর একজন এইরূপ কখনই হইতে পারে না। কোন কোন সম্প্রদায় শয়তান নামক পুরুষকেই ঈশ্বরের শত্রু এবং পাপের আকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু. শয়তান ঈশ্বরের বিধানভুক্ত। যদি মানুষের স্বাধীনতা না থাকিত, যদি সে ভগবানের বিধানে স্বভাবতঃই ধার্ম্মিক হইত, তাহা হইলে ধার্ম্মিক বলিয়া কিছু থাকিত না। সংসারে সকলেই জ্ঞানী হইলে

জ্ঞানের গরিমা কোথায় থাকিত, সংসারে সকলেই ধনী হইলে ধনের গরিমা কোথায় থাকিত। মানুষকে ভগবান্ অপূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু স্বাধীনতা, ইচ্ছাশক্তি ও পূর্ণত্ব অধিকারের ক্ষমতা দিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম যে অসৎগ্রন্থ চিরকালই থাকিবে, কিন্তু তাহা সর্ব্বদাই পরিবর্জ্জন করিলে মানবের ইষ্ট সাধিত হইবে। যত প্রকার পুণ্যকার্য্য আছে তন্মধ্যে দান অপেক্ষা কোনটীও শ্রেষ্ট নহে—"দানাৎ পরতরং নহি।" দানের মধ্যে জ্ঞানদানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠদান—"জ্ঞানাৎ পরতরং নহি।" দরিদ্র ধনভিক্ষা করিলে তাহাকে ধনদান করা পুণ্যকার্য্য। কিন্তু, তাহাকে জ্ঞানের দ্বারা উপার্জ্জনক্ষম করিতে পারিলে অধিকতর পুণ্যের কার্য্য করা হয়। কেন না নিজে উপার্জ্জনক্ষম হইলে, সে আর পরের গলগ্রহ হইবে না। জ্ঞানদানই যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল, তাহা হইলে সেই জ্ঞানের আধার পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার কার্য্য অপেক্ষা অন্য কিছু মহত্তর হইতে পারে না। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠা করা অধিক প্রশংসনীয়। বিদ্যালয় কেবল ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য, পুস্তকালয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকল অবস্থায় সর্ব্বলোকের জন্য। প্রত্যেক পুস্তকালয় এক একটী জ্ঞানমন্দির স্বরূপ। এই জ্ঞানমন্দির হইতে চতুর্দ্দিকে বহুবিষয়ক জ্ঞান বিকীর্ণ করিতে হইবে এবং অজ্ঞান ও অপজ্ঞানের বিনাশ সাধন করিতে হইবে।

পুস্তকালয় বিদ্যামন্দির। এইস্থানে বিদ্যার অধ্যয়ন, বিদ্যার মনন ও বিদ্যার নিদিধ্যাসন চাই। কিন্তু অনেক সময় আমরা অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়া অবিদ্যা-কেই বিদ্যা মনে করিয়া তাহারই ধ্যান ও ধারণা করি। শ্রুতিতে এই অবিদ্যার উপাসনার বিষময় ফল অত্যুজ্জ্বল অক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে।—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরা পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" ॥

মানুষ যতক্ষণ অবিদ্যার মধ্যে থাকে ততক্ষণ আপনাকে আপনি অতিশয় পণ্ডিত মনে করে। অন্ধ যেরূপ অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কূপে পতিত হয়, এইসব মূঢ় ব্যক্তির ভাগ্যেও সেইরূপ ঘটে। যথার্থ পণ্ডিত হওয়া এবং অপণ্ডিত হইয়া আপনাকে পণ্ডিত মনে করা এদুইটী বিভিন্ন জিনিস। সুস্থব্যক্তি স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করে এবং উন্মত্ত ব্যক্তিও উন্মত্ত হইয়া আপনাকে সুস্থচিত্ত মনে করে। সে যে উন্মত্ত ইহা সে কিছুতে বুঝিতে পারে না। এইজন্যই চিকিৎসকের প্রয়োজন। শরীরের রোগের যেরূপ চিকিৎসা আছে,

মানসিক বিকৃতিরও সেইরূপ চিকিৎসা আছে। সুগ্রন্থ সেই চিকিৎসক। পূর্বাচার্য্যগণের দেহের তিরোভাব হইয়াছে। কিন্তু, তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের দ্বারা তাঁহাদের সহিত আমাদের নিত্য সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। কালিদাস মর্ত্ত্যে নাই কিন্তু, তাঁহার শকুন্তলা, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব তাঁহার অমরত্ব সম্পাদন করিয়াছে এবং তাহার সংস্পর্শে আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে সক্ষম হইতেছি বাল্মিকী রামায়ণ প্রণয়ণ হেতু অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন। জ্ঞানের রাজ্যে দেশভেদ, বর্ণভেদ বা ধর্ম্মভেদ নাই। অস্মদ্দেশে যেরূপ পূর্ব্বমনিষিগণ বিশ্বপতির বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিবিধ রত্নরাজি সঙ্কলন করিয়াছেন, অন্যান্য দেশেও তদ্রূপ। মন্ত্রদ্রষ্টা বহু ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়া মানবের চক্ষে জ্ঞানৈশ্বর্য্য উপস্থাপিত করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

প্রাচীনেরা জ্ঞান দুইভাগে বিভক্ত করিতেনঃ—পরা ও অপরা। যে জ্ঞানের দ্বারা বিশ্বনিয়ন্তার সন্ধান পাওয়া যায় তাহাকে তাঁহারা পরাবিদ্যা বা পরাজ্ঞান নামে আখ্যাত করিতেন। যে জ্ঞান দ্বারা ব্যবহারিক জগতে জীব তাহার নানাবিধ প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হয় তাঁহাকে তাঁহারা অপরা বা নিকৃষ্ট বিদ্যা বলিয়া অভিহিত করিতেন। কিন্তু, আমার বিবেচনায় এই পার্থক্য সংঘটনের কোন যুক্তিযুক্ত ভিত্তি নাই। যাহাকে আমরা অপরা বিদ্যা বলি তাহাও পরা বিদ্যার পুষ্টি সাধন করিতে সমর্থ হয়। ধন উপার্জ্জন বিষয়ে বিদ্যার কথা চিন্তা করা যাক। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা আমরা ধনোপার্জ্জন করি। সেই ধনের দ্বারা আমরা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করি। কিন্তু সেই ধন যদি কেবলই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই ব্যয়িত হয় তবেই তাহাকে নিন্দা করিতে পারি। কিন্তু ঐ ধন যদি বিদ্যা বা জ্ঞানের জন্য নিয়োজিত হয় তবেই সেই পরাবিদ্যার পুষ্টিকরণেই হইবে। জ্ঞানও ধনের অপেক্ষা করে। এই পুস্তকালয় নির্ম্মাণ করিতে অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে। ইহার উন্নতি সাধন করিতে আরও বহু অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং, যাহাকে অপরা বিদ্যা বলি তাহা পরা বিদ্যার একটী স্তর মাত্র। সকল বিদ্যাকেই মুখ্যবিদ্যার অভিমুখী করিতে হইবে। অস্মদ্দেশে, প্রত্যেক ঋষির আশ্রমে এক একটী বৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল। কাশী, কাঞ্চী, পুরী, মথুরা, অযোধ্যা, অবন্তী, উজ্জয়িনী, বদরিকা, নৈমিষারণ্য, বৃন্দারণ্য, নালন্দ, তক্ষশীলা প্রভৃতি স্থানে বহু গ্রন্থাগার ছিল। ধনী ও শ্রোত্রীয়ের গৃহে নানাবিধ গ্রন্থ থাকিত। আমাদের দেশেও যেরূপ, অন্যান্য দেশেও সেইরূপ বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। প্রাচীন রোম,

গ্রীস, মিশর প্রভৃতি দেশও অসংখ্য জ্ঞানভাণ্ডারে মণ্ডিত ছিল। আলেকজেণ্ড্রিয়ার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারের কথা সকলেই বিদিত আছেন। বর্ত্তমানে সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার আছে। ঐ সমস্ত গ্রন্থাগারে সমস্ত পৃথিবীর রত্নারাজি সংগৃহীত হয়। উক্ত মহাদেশের পণ্ডিতেরা কেবল স্বদেশের গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াই পরিতৃপ্ত হন্ না, পৃথিবীর যে স্থানে যাহা কিছু উপাদেয় প্রাপ্ত হন্ তাহা সংগ্রহ করিয়া নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডার পরিপূর্ণ করেন। আমাদের দেশের বহু প্রাচীন গ্রন্থ যাহা আমরা এতদ্দেশে প্রাপ্ত হই না তাহাও বার্লিন, ভিয়েনা, পেট্রোগ্রাড্, রোম, লণ্ডন ও প্যারিস্ নগরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পৃথিবীর এমন কোন ভাষা নাই, এমন কোন উপাদেয় গ্রন্থ নাই যাহা ইউরোপীয় জাতীয়েরা সংরক্ষণে পরাঙ্মুখ হন্, কিন্তু আমরা এতই কূপমণ্ডুক যে আমরা আমাদের নিজের দেশে কোন সংবাদ রাখি না। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বহু ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়া ভারতের রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে লইয়া যান্, কিন্তু আমরা জড়বৎ নিশ্চেষ্ট ও কর্ম্মবিমূঢ়। ইদানীন্তন অস্মদ্দেশে পুস্তকালয়ের সংস্থাপনের চেষ্টা পরিদৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু পুস্তকালয়ের পুস্তকনির্ব্বাচনের শিষ্টপ্রথার অভাবে অতি কুরুচিসম্পন্ন গ্রন্থের প্রচার বহুলতায় বিদ্যার উন্নতি না হইয়া অবিদ্যারই প্রশ্রয় হইতেছে। অধিকাংশ পুস্তকালয়েই কুৎসিৎ শৃঙ্গার রসাত্মক প্রবন্ধপূর্ণ পুস্তক থাকে এবং তাহা পাঠে যুবক যুবতীদিগের মানসিক বিকৃতি উপস্থিত হইতেছে। ভগবান্ রসস্বরূপ। এই রসের মধ্যে শৃঙ্গার রসই আদি রস। এই আদি রসের সাহায্যে ভগবান্ এই বিশ্বকাব্য রচনা করিয়াছেন।

"সোহকাময়ত একোহং বহু স্যাম্
তপস্তপ্ত্বা বিশ্বমসৃজম্।"

তিনি চিদাকাশে কামনা করিলেন যে তিনি একা বহু হইবেন এবং তপস্যা সম্পন্ন করিয়া বিশ্বসৃষ্টি করিলেন। মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভবে আদি রসের বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুবংশের মঙ্গলাচরণে যাঁহাকে একাধারে জগতের পিতা ও মাতারূপে বন্দনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই সম্বন্ধে আদি রসের অবতারণা করিয়াছেন। সমস্ত উৎকৃষ্ট বস্তুর যেমন অপপ্রয়োগ আছে, সেইরূপ আদিরসেরও অপপ্রয়োগ আছে এবং বর্ত্তমান কালের বাংলার উপন্যাস, নাটকাদি গ্রন্থে এই আদিরসের অপপ্রয়োগের বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং, পাঠ্যগ্রন্থ নির্ব্বাচনকালে এইরূপ কুরুচিসম্পন্ন গ্রন্থনিচয়কে পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। এতদ্দেশের পুস্তকা-

লয়ে বেদ, উপনিষদ্, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি গ্রন্থ না থাকিলে তাহা গ্রন্থালয়ের অভিধান প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নহে। নারায়ণ শিলার অভাবে যেমন কোন মন্দির, মন্দির পদবাচ্য হয় না, সেইরূপ বেদাদিগ্রন্থের অভাবে কোন গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার পদবাচ্য নহে। কেহ পড়ুক বা না পড়ুক, এগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। তাই বলিয়া সহজপাঠ্যগ্রন্থ যে থাকিবে না তাহা নহে। সাময়িক সাহিত্যেরও প্রয়োজন আছে। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সহিত সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। পুণ্যপুঞ্জময় ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি সংস্কৃত সাহিত্যের রসাস্বাদনে বঞ্চিত, তাহার জন্মই বৃথা, অধ্যয়নই বৃথা। ভারতের প্রত্যেক নর নারীরই কিছু না কিছু সংস্কৃত ভাষায় অধিকার থাকা কর্ত্তব্য। অন্ততঃ, সকলের পক্ষে সংস্কৃত গীতা অধ্যয়ন অত্যাবশ্যক। প্রণিধান করিয়া দেখিলে কিছু দুঃসাধ্য নহে। হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও এই দেবভাষার উত্তরাধিকারীর দাবীতে আমরা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বিবেচনা করি আজ যদি সংস্কৃতভাষা এবং তাহার বক্ষস্থিত সমস্ত রত্নরাজি ভারতভূমি হইতে অপসারিত হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর মধ্যে আমরা একটি বর্ব্বর নগণ্যজাতি বলিয়া পরিগণিত হইতাম। যাহার দ্বারা আমরা গৌরবান্বিত তাহার লাঘব সম্পাদন করা আত্মহত্যাসদৃশ। বিশ্বজ্ঞান-ভাণ্ডারে অসংখ্য বিষয় জানিবার আছে। বিশুদ্ধ আনন্দ সম্ভোগের এতই উপায় রহিয়াছে যে কুৎসিৎ আনন্দের কথা মনে উদয়ই হইতে পারে না। এই বিচিত্র ভূমণ্ডলের মধ্যে কত বিচিত্র বিচিত্র জিনিষ রহিয়াছে যে তাহার ইয়ত্তা নাই। এবং যদিও আমরা প্রত্যক্ষভাবে তাহা উপভোগ করিতে পারি না, কিন্তু গ্রন্থাদির সাহায্যে তাহার দর্শনের আনন্দ উপভোগ করিতে পারি। মানস সরোবর আমি কখনও দেখি নাই, কিন্তু সুইডেনদেশীয় পণ্ডিত পর্য্যটক সেন্ হিডেনের গ্রন্থপাঠ করিয়া আমি মানস সরোবর দর্শনের আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। বাংলাভাষায় এইরূপ গ্রন্থ কেন অনূদিত হয় না, তাহার কারণ আমি বুঝি না। এই ভূমণ্ডলে কত বিভিন্ন প্রকারের মনুষ্য আছে, তাহাদের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, জ্ঞান, রীতি ও নীতি অবগত হইয়া আমরা যে কেবল আনন্দ উপভোগ করিতে পারি তাহা নহে, বিভিন্ন স্তরের মানবের ক্রমবিকাশ সন্ধানও পাই। বাংলাভাষায় এইরূপ গ্রন্থ বিরল। এইস্থলে ইংরাজীগ্রন্থ পাঠকরা আবশ্যক। এই ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের কতশত জাতি, ভাষা ও সাহিত্য রহিয়াছে, আমরা তাহার কোন সন্ধান রাখি না

কিংবা জানিবারও চেষ্টা করি না। এইরূপ সমস্ত পৃথিবীস্থ মানবের ইতিহাস পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে আমাদের স্বার্থ স্বার্থ সঙ্কোচ বুদ্ধি ক্ষীণ এবং সার্ব্বজনীন উদারতা উপস্থিত হয়। পুস্তকালয়ে সংগৃহীত রাখিবার জন্য বহু বিদ্যাবিষয়ক বহুগ্রন্থ বহুভাষায় আছে। কিন্তু, আমাদের পুস্তকালয়ে সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজী ও পারস্যভাষার গ্রন্থ রাখাই অধিক প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক পুস্তকালয়কেই সর্ব্ববিষয়ক শিক্ষার একটী কেন্দ্রস্থল করা যাইতে পারে। জ্ঞানের বিভাগ করিয়া লইয়া এক এক জনের অধীত বিষয় অন্য সকলকে সহজে ও সংক্ষেপে অবগত করান এবং বৎসরান্তরে সেইগুলি মুদ্রিত করিয়া গ্রন্থাগারে ধারণ করান যাইতে পারে। মহাত্মা জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদতত্ত্বের গবেষণা করিয়া চেতনাচেতনের ভেদজ্ঞান বিনষ্ট করিয়াছেন। এই সত্যে উপনীত হইতে তাঁহাকে যে কত তপস্যা করিতে হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সকলেই জগদীশচন্দ্র হইতে পারে না বা হইতে পারিবে না, কিন্তু জগদীশচন্দ্রের শ্রমলব্ধ রত্নরাজি আমরা অনায়াসেই সম্ভোগ করিতে পারি। এইরূপ পশুপক্ষিদের সম্বন্ধে কত উপাদেয় গ্রন্থ আছে যাহা আমরা পাঠ করিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ ও জ্ঞানলাভ করিতে পারি। জ্যোতিষ্‌শাস্ত্র চর্চ্চা করিলে আমরা যে কত আনন্দ উপভোগ করিতে পারি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। যাঁহারা একবার গ্রহ, নক্ষত্রাদি তত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টিত হইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন উহাতে কত আনন্দ। কতিপয় বর্ষপূর্ব্বে যশোহর কালেক্টরেটের বর্ত্তমান কোষাধ্যক্ষ, স্নেহাস্পদ, শ্রীমান্ রাধাগোবিন্দ চন্দ্রকে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রতী করি। রাধাগোবিন্দ বর্ত্তমানে ঐ শাস্ত্রে একজন অভিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত। সম্প্রতি আমেরিকা হইতে তথাকার কোন জ্যোতিষ্‌শাস্ত্রানুশীলনী সভা তাহাকে একটী মূল্যবান্ দূরদর্শন যন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। অতি নগণ্যস্থান যশোহরও আমেরিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বিদ্যার চর্চ্চা থাকিলে এই ক্ষুদ্রগ্রামও কোন না কোন সময়ে মহতী কীর্ত্তির অধিকারী হইতে পারিবে।

লাইব্রেরীতে যে কেবল মুদ্রিত গ্রন্থ থাকিবে তাহা নহে, হস্তলিখিত পুঁথি, বাংলাই হউক কিংবা সংস্কৃতই হউক, তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত এবং যাহাতে ঐ সমস্ত গ্রন্থ কীটদষ্ট এবং ক্লেদযুক্ত না হয় তৎপক্ষে যত্ন রাখা উচিত। এই গ্রন্থাগারে এইরূপ প্রচেষ্টা চলিতেছে এবং কিছু পুঁথিও সংগৃহীত হইয়াছে শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। মুদ্রিত গ্রন্থেরও ঐরূপ সংরক্ষণ আবশ্যক।

প্রতিষ্ঠাতা একাই যে এ কার্য্য করিবেন তাহা নহে, নিকটবর্ত্তী সমস্ত পল্লীরই ইহার উন্নতিরদিকে দৃষ্টিরাখা কর্ত্তব্য। এ দেশে একটী দোষ দৃষ্ট হয় যে কোন ব্যক্তি কোন সদনুষ্ঠান করিলে অপরে তাহার সাহায্য করে না। সহযোগ ভিন্ন কোন বৃহৎকার্য্য সম্পন্ন হয় না। দেবালয় হউক কিংবা বিদ্যালয় হউক, চিকিৎসালয় হউক বা গ্রন্থালয় হউক, রাস্তা ঘাট, খালই হউক বা দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী হউক, সমস্ত বিষয়েই সাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগ আবশ্যক। এই পুস্তকাগারে সমস্ত জীবজন্তু চিত্র রাখা যাইতে পারে এবং তাহা দেখিয়া দূরস্থ কোন চিড়িয়াখানা দেখার ফললাভ করা যাইতে পারে। সমস্ত তৃণ শস্য উদ্ভিদাদির, মনুষ্যদেহেরও পৃথিবীর সমস্ত শ্বেত, পীত, লোহিত এবং কৃষ্ণকায় মনুষ্যের চিত্র থাকিতে পারে এবং তাহা দেখিয়া বালকেরা পর্য্যন্ত যায়গায় বসিয়া তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারে। সমস্ত দেশের, অন্ততঃপক্ষে নিজের জেলার, থানার এবং গ্রামের মানচিত্র রাখা আবশ্যক। এই গ্রন্থাগারে নিকটবর্ত্তী সকল স্থানের কৃতী, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও পরোপকারী নরনারীর আলোকচিত্র রক্ষিত হইতে পারে এবং তাহা দেখিয়া অধস্তন পুরুষেরা পূর্ব্বপুরুষদিগের দর্শনলাভ করিতে পারে। অতি অল্পদিন হইল বৈতরণীর কুলপুরোহিত আমার যশোহর ভবনে আগমন করিয়াছিলেন। তাহাদের রক্ষিত উড়িষ্যাভাষায় লিখিত পুঁথি হইতে এই গ্রামের কত পুরাতন সংবাদ পাইলাম। পুথি দেখিতে দেখিতে দেখিলাম ৺হরিবল্লভ মজুমদারের সহধর্ম্মিনী ৺বৈষ্ণবদাস মজুমদারের মাতা পুরীদর্শনপথে বৈতরণীতে গিয়াছিলেন এবং বৈতরণীর পাণ্ডা সে কথা পুঁথিতে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

৺হরিবল্লভ মজুমদার আমার ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ পূর্ব্বপুরুষ অর্থাৎ পিতামহের প্রপিতামহ—৺হরিবল্লভ মজুমদার, ৺বৈষ্ণবদাস মজুমদার, ৺দর্পনারায়ণ মজুমদার, ৺হরিশ্চন্দ্র মজুমদার, ৺তারাপ্রসন্ন মজুমদার ও শ্রীযদুনাথ মজুমদার। এই আড়াইশত বৎসরের পূর্ব্বে লিখিত হরিবল্লভের সহধর্ম্মিণী চন্দ্রমুখীর নাম শ্রবণে প্রবেশ করায় আমি যে কেবল চন্দ্রমুখীর দর্শন পাইলাম তাহা নহে, তাঁহার সহিত সেই সময় কত অতীত ঘটনা যে স্মৃতিপথে জাগরূক হইল তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে পুরীদর্শন বড় সহজসাধ্য ছিল না। সেই সময় তীর্থযাত্রার পরকাল যাত্রার ন্যায় গণ্য হইত। ঐকান্তিকী ভক্তি না থাকিলে তখন কেহ তীর্থ দর্শনে বহির্গত হইত না। আজকাল অনেকে

পক্ষে তীর্থদর্শন কেবল বিলাসিতার পরিচায়কমাত্র। কিন্তু, তৎকালীয় তীর্থ দর্শন ঘোর কঠোর তপস্যাসাধ্য ছিল। চন্দ্রমুখীর নাম শুনিয়াই তাঁহার পুণ্য পবিত্র চন্দ্রাননের দর্শনলাভ করিলাম, আপনাকে ধন্য মনে করিলাম। চন্দ্রমুখীর সহিত কে কে তীর্থযাত্রা করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই নাম উহাতে ছিল। লোহাগড়া গ্রাম হইতে এ পর্য্যন্ত যত লোক বৈতরণী দর্শনে গিয়াছেন তাহাতে সকলেরই নাম উল্লেখ আছে। এপর্য্যন্ত সকলের নাম আমি নকল করিয়া লইয়াছি। তাহার দ্বারা এই গ্রামের অনেক লুপ্ত বংশেরও পরিচয় পাওয়া যায়। আপনারা যদি এই গ্রামের এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের ইতিহাস সংগৃহীত করিয়া রাখেন তাহা হইলে উহা বেশ উপাদেয় বস্তু হইবে। অধস্তন পুরুষেরা উহা পাঠ করিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিবে। এই গ্রামের বহু পুরাতন কীর্ত্তি লোপ হইয়া গিয়াছে, এখনও কিছু কিছু আছে। সকলের সহযোগ ও সহানুভূতির দ্বারা ইহা সংগৃহীত হইতে পারিবে। এইরূপ বহুবিধ সহজসাধ্য কাজ সম্পন্ন করিয়া এই পুস্তকালয় অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারে। দেশ হইতে কথকতা উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে প্রাচীনেরা রামায়ণ, মহাভারত গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন এবং পল্লীর নরনারীরা তাহার শ্রবণে আনন্দ উপভোগ করিত। বর্ত্তমানে রামায়ণও মহাভারত সেকেলে পুস্তকের মধ্যে গণ্য হইয়াছে, কেহ পড়েও না, কেহ শোনেও না। প্রাচীনকালের ভাল জিনিষগুলি রাখিতে হইবে। নাটক, নভেল পড়ার কোন দোষ নাই, কিন্তু যে সমস্ত গ্রন্থপাঠে মানুষের অধঃপতন হইবার সম্ভাবনা, সাধারণ পুস্তকালয়ে সে সব পুস্তকরাখা কর্ত্তব্য নহে। এই জন্যই পুস্তকনির্ব্বাচন প্রত্যেক গ্রন্থালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের একটী বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজ। দেবদেব মহাদেব হলাহল জীর্ণ করিতে পারিলেও সকলের পক্ষে উহা সম্ভব নহে।

বহুজনের হিতের জন্য যাহার যত্ন ও চেষ্টা থাকে তাহার কল্যাণ কামনা করা সর্ব্বসাধারণের অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীমান্ ভুবনমোহন তাহার স্বর্গীয় পিতৃদেব রামনারায়ণের স্মৃতিরক্ষার্থে বহুধনে এই পুস্তকালয় সংস্থাপিত করিয়াছে। আমি আমার নিজের পক্ষে ও আপনাদের পক্ষ হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি যে সে সুস্থচিত্ত ও সুস্থকায় থাকিয়া দীর্ঘজীবি হইয়া এই পুস্তকালয়ের সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদন করিতে সমর্থ হউক। ভগবান্ তাহাকে সর্ব্ববিষয়ে সুখী করিয়া পরহিতে নিয়োজিত করুন, এই প্রার্থনা করি। শিবমস্তু, শুভমস্তু, শিবসঙ্কল্পমস্তু। আপনারা সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে বলুন—শিবমস্তু, শুভমস্তু, শিবসঙ্কল্পমস্তু। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ!! ওঁ শান্তিঃ!!!

শিক্ষা বৈফল্য।

লেখক—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল বিদ্যানিধি।

কতই ত পড়িলে, পঞ্চমবর্ষ হইতে দ্বাবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অষ্টাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া কত কষ্ট করিয়া বাঙ্গাল ইংরাজী বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, পাটীগণিত, শুভঙ্করী, জ্যামিতি, পরিমিতি য়্যালজাবরা, ত্রিকোণমিতি, ইকনমিক্স, লজিক, ফিলজফি বিজ্ঞান আইন সবই ত পড়িলে, পড়িয়া কতক বুঝিলে আর যাহা না বুঝিলে তাহাও ত কোনও প্রকারে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, কিন্তু তাহাতে কি ফলোদয় হইল তাহা অনুধাবন করিয়াছ কি? তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বটে কিন্তু তাহাতে বিশ্বকার্য্যালয়ের পরীক্ষায় কি সাহায্য পাইলে? বিশ্বকার্য্যালয়ে প্রবেশ করিয়াই তুমি বুঝিতে পারিলে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও তুমি বিশ্বকার্য্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণীরও উপযুক্ত হও নাই, বিদ্যালয়ে যে বিদ্যা শিখিয়াছ তাহা কার্য্যালয়ের কার্য্য শিখিবার পরিপন্থী না হইলেও সহায়ক ত মোটেই নয়, তখন তুমি বুঝিলে তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্যকরী হয় নাই, তোমার শিক্ষা নিষ্ফলা হইয়াছে। বিশ্বকার্য্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তোমার জীবিকার সংস্থান হইবে না। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন তুমি দেখিলে যে বিশ্বকার্য্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া দূরে থাকুক তুমি তাহার নিম্নতম শ্রেণীর ছাত্র হইবারও যোগ্য হও নাই, তখন বুঝিলে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্যক্ষেত্রে তোমার কোনও সহায়তা করিল না, ঐ শিক্ষা তোমার জীবিকা সমস্যার সমাধানে অক্ষম। জীবিকা অর্জ্জন করিতে না পারিলে আর তোমার শরীর রক্ষা হইবে কিরূপে, কিরূপেই বা তোমার অস্তিত্ব থাকিবে, আর কিরূপেই বা তুমি ধর্ম্মসাধন করিবে?

প্রাণিজগতে মানবই ঈশ্বরের সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ এবং ধর্ম্মসাধনেই মানবের মানবত্ব। সৃষ্ট জীব নিবহের মধ্যে একমাত্র মানবই ধর্ম্মসাধন দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিরহস্য ভেদকরতঃ তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিতে পারে এবং এইজন্যই প্রাণিজগতে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব। প্রাণধারণ ত সকলেই করিয়া আছে, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ এমন কি তরুলতারও প্রাণ আছে কিন্তু ইহারা

সকলেই কি জীবিত? "তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ। সজীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি"—যে মননের দ্বারা জীবন ধারণ করে সেই প্রকৃত পক্ষে জীবিত। এই মনন শক্তি মানব ভিন্ন অন্য কোনও প্রাণীতে সম্ভব হয় না, এই মননের দ্বারাই মানব সৃষ্টি কর্ত্তার সৃষ্টির রহস্য ভেদ করিতে পারে। মনন শক্তির বীজ অনুন্মিষ অবস্থায় মানব মাত্রেই আছে। ঊষরে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হয় না। উর্ব্বর ভূমিতে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং বৃক্ষাকারে উহার পূর্ণ বিকাশ হয়। মনন বৃক্ষের পূর্ণ বিকাশই ধর্ম্ম সাধন এবং মুক্তির কারণ তত্ত্বজ্ঞানময় সৃষ্টি রহস্য ভেদন ঐ মনন বৃক্ষেরই ফল। মানব মাত্রেরই তোমার আমার সকলেরই মুক্তিই চরম আকাঙ্ক্ষা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কে আর বদ্ধ থাকিতে চায়? কিন্তু ধর্ম্মসাধন না হইলে ত মুক্তি হইবে না, তোমার চরম আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ হইবে না! তবেই বুঝিতে পারিলে যে মুক্তিকে লক্ষ্য করিতে হইলে মুক্তির কারণ ধর্ম্মসাধনকে তোমার জীবনের লক্ষ্য করিতে হইবে। আবার ধর্ম্মসাধনের দিকে লক্ষ্য করিতে হইলে তোমার শরীর রক্ষা বিষয়ে যত্নবান্ হইতে হইবে। "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম-সাধনম্" শরীর রক্ষা না হইলে ধর্ম্মসাধনের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না সুতরাং শরীর রক্ষাকেই তোমার ধর্ম্মসাধনের নিম্নস্তরের লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আবার জীবিকার সংস্থান না হইলেও ত শরীর রক্ষা হয় না সুতরাং তোমার শরীর রক্ষার নিম্নস্তরের লক্ষ্যই জীবিকার সংস্থান এবং এই জীবিকার সংস্থানই তোমার জীবনের প্রথম লক্ষ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যখন তোমার জীবিকা সমস্যার সমাধান করিতে পারিল না, তোমার জীবনের প্রথম লক্ষ্যই ব্যর্থ হইল তখন তুমি তোমার শিক্ষার নিস্ফলতা বুঝিতে পারিলে, কিন্তু অষ্টাদশবর্ষ ব্যাপিয়া কত কষ্ট করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিস্ফল পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়া তোমার শরীর মন ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে আর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্ব-কার্য্যালয়ের পরীক্ষা দিবার উৎসাহ ও উদ্যম তোমার নাই। এই অষ্টাদশবর্ষ ব্যাপিয়া তুমি যে পরিশ্রম করিয়াছ তাহাতে তোমার কোনও ইষ্টসাধন না হইয়া প্রভূত অনিষ্ট সাধনই হইয়াছে। তুমি ঊষরে বীজ নিক্ষেপ করিয়াছ সে বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই বীজই নষ্ট হইয়াছে; তুমি ভস্মে ঘৃতাহুতি দিয়াছ, অগ্নিও প্রজ্বলিত হয় নাই ঘৃতও নষ্ট হইয়াছে; তোমার শিক্ষা নিস্ফলা হইয়াছে যেহেতু শিক্ষা তোমার জীবিকাসমস্যার সমাধান

করিতে পারে নাই পরন্তু তোমার প্রভূত উদ্যম ও উৎসাহ পণ্ড করিয়াছে। প্রারম্ভে কার্য্যকরী শিক্ষা না পাওয়ায় জীবনের অপরাহ্ণে তুমি জীবিকাসমস্যার সমাধানে হতাশ হইয়া পড়িয়াছ। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কুশিক্ষা না হইলেও অশিক্ষা হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং সেই অশিক্ষা পাইয়াই তুমি জীবিকা নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়া আছ। জীবিকাসংস্থানই তোমার জীবনের প্রথম লক্ষ্য বা গন্তব্য স্থল। ঐ গন্তব্যস্থলের দিকে দৃষ্টি না করিয়াই তুমি পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলে, তুমি দিক্ নিরূপণ করিয়া লও নাই, তোমার গন্তব্যস্থল যে দিকে তুমি সে দিকে না যাইয়া অন্য দিকে চলিয়াছিলে, তাই অষ্টাদশবর্ষ ব্যাপিয়া পথ চলিয়া তুমি যে স্থান হইতে যাত্রা করিয়াছিলে সেই স্থানেই ফিরিয়া, আসিয়াছ, গন্তব্যস্থলে ত যাইতে পারই নাই পরন্তু পথশ্রমে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছ—"তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।" তুমি ত ডুবিয়াছ! বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ত্রুটী কোথায় তাহার আলোচনা করিয়া ঐ শিক্ষাকে কার্য্যকরী শিক্ষায় পরিণত করিতে ঐ অশিক্ষাকে সুশিক্ষার পরিবর্ত্তিত করিতে না পারিলে তোমার ন্যায় তোমার পরবর্ত্তী সকলকেও ডুবিতে হইবে। এ অশিক্ষার প্রবাহ চলিতে থাকিলে অচিরেই সমগ্র জাতি ডুবিবে ধর্ম্ম লোপ হইবে, দেশ উৎসন্ন হইয়া যাইবে। আমরা এই অশিক্ষার আলোচনায়ই প্রবৃত্ত হইব এবং কেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিও জীবিকাসমস্যার সমাধানে অভিভূত হইয়া তাহার কারণ নির্ণয় করিয়া প্রতীকারের উপায় নির্দ্দেশ করিব।

বর্ত্তমানে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রসাদে যে শিক্ষাপ্রদান করা হয়, ঐ শিক্ষাকে তিনটী স্তরে বিভক্ত করা যায় (১) 'প্রাইমারী এডুকেশন' বা প্রাথমিক শিক্ষা (২) 'সেকেণ্ডারী এডুকেশন' বা মধ্য শিক্ষা (৩) 'হাইয়ার এডুকেশন' বা উচ্চ শিক্ষা। গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ প্রাথমিক মান হইতে প্রবেশিকা মান পর্য্যন্ত যে শিক্ষা মধ্য ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে দেওয়া হয় তাহা মধ্য শিক্ষা, ও প্রবেশিকা হইতে কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শ্রেণী সমূহের যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা উচ্চশিক্ষা নামে অভিহিত করা যায়। কেহ কেহ কলেজের বি এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাকে উচ্চশিক্ষা বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণী সমূহের শিক্ষাকে চরম শিক্ষা বলিতে ইচ্ছা করেন কিন্তু কলেজের শিক্ষা

ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণী সমূহের শিক্ষা এই উভয়কে ভিন্নপ্রকৃতিক বলা যায় না এই জন্যই উভয় শিক্ষাকে একই স্তরের অন্তর্ভুক্ত করাই সমীচীন।

বর্ত্তমান যুগে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না এরূপ লোক অতি বিরল কিন্তু অবস্থাভেদে যে শিক্ষার তারতম্য হওয়া উচিত তাহা সম্যক্ অবধারণ না করিয়াই প্রত্যেক ব্যক্তিই গতানুগতিক ভাবে তাঁহার বালককে প্রাথমিক শিক্ষা, মধ্য শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার বিভিন্নস্তর অতিক্রম করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অবস্থা নির্বিবিশেষে সকল বালককেই উচ্চ শিক্ষার পথে প্রধাবিত হইবার সুযোগ দেওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করা আবশ্যক। আধ্যাত্মিকতার যুগে জ্ঞানার্জ্জন করাই বিদ্যাভ্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান জড়বাদের যুগে অর্থোপার্জ্জনই বিদ্যাভ্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। বিদ্যাশিক্ষা না করিলে বালক তাহার জীবিকার সংস্থান করিতে পারিবে না এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই প্রত্যেক মধ্যবিত্ত ও অল্পবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিই তাঁহার বালককে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হয়েন তাঁহার নিকট জ্ঞানার্জ্জন বিদ্যাশিক্ষার গৌণাতিগৌণ উদ্দেশ্য বলিয়াই পরিকল্পিত হয়; কেবল মুষ্টিমেয় সম্পৎশালী ব্যক্তিরাই জ্ঞানার্জ্জনকে তাঁহাদের বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া স্থির করেন। অল্পবিত্ত বা দরিদ্র ব্যক্তিরা বালকদিগকে উচ্চশিক্ষা দিবার ইচ্ছা করিলেও তাঁহাদিগের অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবন্ধনই বালকদিগকে অনিচ্ছাসত্বেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয় কিন্তু মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরাই স্ব স্ব অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহাদের বালকদিগকে উচ্চ-শিক্ষা দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের চেষ্টাও সফল হইতে দেখা যায়। বহুবিত্ত বা সম্পৎশালী ব্যক্তিরা তাঁহাদিগের বালকদিগের সম্মুখে উচ্চশিক্ষার আদর্শ স্থাপন করিতে পারেন যেহেতু বালকেরা ঐ শিক্ষা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবে এরূপ কল্পনাও তাঁহারা করেন না কিন্তু যে সকল অল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তির অন্যচিন্তা হইতে অন্নচিন্তাই সমধিক প্রবল এবং যাঁহারা অর্থোপার্জ্জন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের বালকদিগকে উচ্চশিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত করা উচিত কিনা এবং বালকদিগকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিলেও তাঁহাদের অর্থোপার্জ্জনরূপ মুখ্যউদ্দেশ্য সাধিত হয় কিনা তাহা সম্যক্ আলোচ্য।

অধ্যাত্মযুগে বিদ্যার্থিগণ জ্ঞানের জন্যই বিদ্যাভ্যাস করিতেন এবং শিক্ষার সমাপ্তি কোথায় তাহা তাঁহারা জানিতেন না। যাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা করিতেন

তাঁহাদিগকে অন্নচিন্তায় বিব্রত হইতে হইত না বলিয়া তাঁহার আমৃত্যু বিদ্যা-শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানের সাধনায় তৎপর থাকিতেন। সে যুগ আর নাই, আজকাল জড়বাদের যুগে বিদ্যা অর্থকরী বলিয়া গৃহীত হইতেছে। অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ আনয়ন করিবার জন্যই ছাত্রদিগকে স্কুল কলেজ প্রভৃতিতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে দেওয়া হয় এবং ঐ স্কুল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার সমাপন করিয়া জীবিকা সমস্যার সমাধান কল্পে তাহাদিগকে যে কোনও উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের জন্য ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে হয়। জ্ঞানের জন্য বিদ্যাভ্যাস করা আজকাল পৌরাণিক কথা হইয়া পড়িয়াছে। আজকালও যে বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা জ্ঞানের উন্মেষ হয় না একথা বলিতেছি না, কিন্তু জ্ঞানই যে বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে না এবং বহুবিত্ত ব্যক্তির পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানকরী বলিয়া অভিহিত হইলেও মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত ব্যক্তির নিকট বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য যে অর্থাগমের উপায় নির্দ্ধারণ করা ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না তাহাই আমার বক্তব্য। এক্ষণে দেখিতে হইবে বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষা দ্বারা অর্থাগমের কি উপায় নির্দ্ধারিত আছে।

আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে ছাত্রের যে শিক্ষা হয় ঐ শিক্ষা দ্বারা তাহার 'সার্ভিস' বা চাকুরীবৃত্তি অবলম্বন ভিন্ন অন্য কোনও সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা জন্মে না। যে ব্যক্তির যেরূপ অর্থবল আছে তিনি তদনুরূপ তাঁহার বালককে প্রাথমিক, মধ্য বা উচ্চ শিক্ষা দিবার পরই অর্থোপার্জ্জন করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বলেন এবং বালকও তাহার শিক্ষানুরূপ স্কুল কলেজে বা কোনও আফিসে নির্দ্দিষ্ট বেতনে চাকুরী স্বীকার করিয়া জীবিকার সংস্থান করিতে থাকেন। এই চাকুরী বা দাসত্ববৃত্তি দ্বারা কিরূপ অর্থাগম বা লক্ষ্মী লাভ হয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি। তদর্দ্ধং রাজ সেবায়াং"—অর্থাৎ বাণিজ্যেই পূর্ণ লক্ষ্মীলাভ কৃষি কর্ম্মে বাণিজ্যের অর্দ্ধ এবং রাজ সেবায় কৃষি কর্ম্মের ও অর্দ্ধ লক্ষ্মীলাভ হইয়া থাকে। রাজসেবা শব্দের দ্বারা কেবল গবর্ণমেণ্টের সেবা বা দাসত্ব নহে সার্ভিস্ বা দাসত্ব মাত্রই লক্ষিত হইতেছে। তাহা হইলে দেখা যায় যে দাসত্ববৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া বালকেরা পূর্ণ লক্ষ্মীর অর্দ্ধাংশের ও অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত পাইতে পারে অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ হইতে তাহারা তাহাদের অবলম্বিত বৃত্তিদ্বারাই বারিত। তথাপি দাসত্ববৃত্তি ভিন্ন জীবিকার অন্য কোনও অবলম্বন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার এমনই

মাহাত্ম্য যে শিক্ষাপ্রাপ্তির পর প্রত্যেক ছাত্রকেই তাহার জীবিকাজ্জনে উপায়ের তিন ভাগ প্রথমেই ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্ট একভাগ লইয়া জীবিকা নির্বাহের নিষ্ফল প্রয়াস করিতে হইতেছে। আবার 'সার্ভিস্' বা চাকুরীর সংখ্যাও ত অগণিত নহে, প্রতি বৎসরে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকলেরই 'সার্ভিস্' লাভ হইতে পারে না সুতরাং যাহাদের 'সার্ভিস্' লাভ না হইল তাহারা ত এক চতুর্থাংশ লক্ষ্মীলাভ হইতেও বঞ্চিত হইল। জীবিকা-অর্জ্জন বা লক্ষ্মী লাভই বর্ত্তমান যুগে বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য অথচ বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ জীবিকা অর্জ্জন বা লক্ষ্মীলাভের জন্য বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্ম এই দুইটী যথাক্রমে উত্তম ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিবার উপযোগী বিদ্যা শিক্ষা দিতে অবহেলা করিয়া ছাত্রদিগকে চাকুরী বা দাসত্বরূপ অধম পন্থা অবলম্বন করিবার উপযোগী শিক্ষা দিতেছে। আবার দাসত্বরূপ অধম পন্থা অবলম্বন করিয়া একচতুর্থাংশ লক্ষ্মীলাভ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্রের ভাগ্যে ঘটিতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা না থাকায় চাকুরী বা দাসত্ববৃত্তিই অধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তির একমাত্র কার্য্যক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছে এবং বহুসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তিকেই জীবিকাসমস্যার সমাধানে বিহ্বল হইতে হইতেছে।

যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষাও বহুসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তির অর্থাগমের কোনও সুযোগই আনয়ন করিতেছেনা তখন আর ঐরূপ উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি? অর্থোপার্জ্জনই যাহাদের শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাদের জ্ঞানকরী উচ্চশিক্ষার দিকে প্রধাবিত না হইয়া কার্য্যকরী শিক্ষা অবলম্বন করাই নিতান্ত আবশ্যক। প্রাথমিক শিক্ষা সকলেরই অবশ্য প্রয়োজনীয় যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষা দ্বারা সাধারণ জ্ঞানের উন্মেষ না হইলে কোনও কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পাদন করা যায় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্ণপরিচয় ধারাপাত প্রভৃতি পড়িয়া একটু লিখিতে পড়িতে ও হিসাব সংরক্ষণ করিতে শিক্ষা করা আবশ্যক। মধ্য শিক্ষার স্তরে মধ্য ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে বর্ত্তমান সাধারণ শ্রেণীর সহিত বিবিধ কার্য্যকরী শিক্ষার শাখা শ্রেণী সমূহ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।* যে ছাত্রদিগকে ভবিষ্যতে জীবিকাসংস্থানের জন্য আকুল হইতে হইবে না অর্থাৎ যে বহুবিত্ত শ্রেণীর ছাত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে না তাহারা মধ্য

ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সাধারণ শ্রেণী সমূহে অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে যেহেতু জ্ঞানার্জ্জনই তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার লক্ষ্য; কিন্তু যাহাদিগের 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' যে ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করিয়া উক্ত শিক্ষা দ্বারাই উদরান্নের সংস্থান করিতে হইবে তাহারা যাহাতে গতানুগতিক ন্যায়ে বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার দিকে প্রধাবিত হইয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-বৈকল্যে নিষ্পেষিত না হয় এবং যাহাতে তাহারা স্ব স্ব শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির অনুকূল মধ্য ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পূর্ব্বোক্ত কার্য্যকরী শিক্ষার শাখা শ্রেণী সমূহে অধ্যয়ন করিতে যায় তজ্জন্য আমাদের বদ্ধপরিকর হওরা উচিত। বিদ্যালয়ে কার্য্যকরী শিক্ষার শাখা শ্রেণী সমূহের প্রতিষ্ঠান হইলেই যে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে তাহা নহে, এ বিষয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কঠোর শাসন রাখিতে হইবে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর কোনও ছাত্র যখন মধ্য শিক্ষার স্তরে উপনীত হইবে তখন মধ্য ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যেক ছাত্রের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সমূহ বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া ছাত্র-দিগকে অবস্থা ভেদে জ্ঞানকরী শিক্ষার শ্রেণীতে বা কার্য্যকরী শিক্ষার উপযুক্ত শাখা শ্রেণীতে প্রবেশ ও অধ্যয়নের অধিকার দিবেন এবং কোনও ছাত্রই যদৃচ্ছাক্রমে বিদ্যালয়ের জ্ঞানকরী বা কার্য্যকরী শিক্ষার যে কোনও শ্রেণীতে প্রবেশ ও অধ্যয়নের অধিকার পাইবে না। উপরোক্ত শাসন বিধিবদ্ধ হইলেই বর্ত্তমান শিক্ষা বৈকল্যের প্রতীকার হইবে ও নূতন প্রণালীর শিক্ষাই শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রের জীবিকা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। একই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের ও যেরূপ প্রকৃতিগত পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সুবিজ্ঞ চিকিৎসক অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভেষজের ব্যবস্থা রোগ প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণ করেন তেমনই ছাত্রদিগেরও অর্থাগমের সৌকর্য্য বিধান করিবার জন্য তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অবস্থাভেদে তাহাদিগকে কার্য্যকরী শিক্ষা বা বৃত্তি শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন শাখায় শিক্ষিত করা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একান্ত কর্ত্তব্য।

যে কোনও বৃত্তিশিক্ষার পূর্ব্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান অবশ্য আহরণীয়, এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তি শিক্ষা বা কার্য্যকরী শিক্ষার শাখা শ্রেণী সমূহের প্রতিষ্ঠানের কোনও আবশ্যকতা নাই। মধ্য শিক্ষার স্তরেই মধ্য ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে জ্ঞানকরী শিক্ষার বর্ত্তমান

সাধারণ শ্রেণী সমূহের সহিত কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি শিক্ষার শাখা শ্রেণী সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনের পর প্রত্যেক অর্থার্থী ছাত্রকে স্ব স্ব শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মধ্য শিক্ষার স্তরের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, প্রভৃতি কার্য্যকরী শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন শাখা শ্রেণীতে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। সাধারণতঃ কৃষক বালকের কৃষি শাখায় কুম্ভকার বালকের মৃৎশিল্প শাখার, সূত্রধর বালকের কাষ্ঠ শিল্প শাখায়, বণিক্ পুত্রের বাণিজ্য শাখায় এইরূপ জাতি ও বর্ণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বালকের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় শিক্ষ লাভ করিবার যোগ্যতা দৃষ্ট হইবে কিন্তু তাই বলিয়া জাতিবর্ণ গত পার্থক্যই ছাত্রদিগের বৃত্তিনিয়ামক হইবে এরূপ কোনও অনুশাসন ব্যবস্থাপিত করা উচিত নহে। কোনও কৃষক বা কুম্ভকার বা সূত্রধর বা বণিক্ শ্রেণীর ব্যক্তি যদি প্রভূত সম্পৎশালী হয়েন এবং তাঁহার উদরভরণ চিন্তার অভাব বশতঃ তিনি তাঁহার বালককে জ্ঞানকরী সাধারণ শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে ইচ্ছা করেন অথবা কোনও শ্রেণীর ব্যক্তি তাঁহার বালকের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকে তাহার জাতিবর্ণ গত বৃত্তি হইতে স্বতন্ত্র কোনও বৃত্তি অবলম্বন করাইবার ইচ্ছা করেন ও বালককে তদুপযোগী শিক্ষায় প্রণোদিত করেন তাহাতে আপত্তির কারণ কিছু নাই। সকল ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক বালকের অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সমূহের উৎকর্ষাপকর্ষ পরীক্ষা করতঃ তাহার যোগ্যতা নির্ণয় করিয়া বিদ্যালয়ের জ্ঞানকরী শিক্ষা বা কার্য্যকরী বৃত্তি শিক্ষার শাখা শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার দিয়া তদুপযোগী বিষয়ে তাহার শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

মধ্য শিক্ষার স্তরে যেরূপ জ্ঞানকরী শিক্ষার সাধারণ শ্রেণী সমূহের সহিত বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষার শাখাশ্রেণী প্রতিষ্ঠাপিত হইবে উচ্চশিক্ষার স্তরেও সেইরূপ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ ঐ বৃত্তিশিক্ষার উৎকর্ষ সাধণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে সকল ছাত্র আর্থিক অভাবের তাড়নায় প্রপীড়িত নহে এবং অর্থোপার্জ্জনের চিন্তায় সমাকুল হইয়া যাহাদিগকে মধ্যশিক্ষার স্তরেই শিক্ষার সমাপন করিতে হয় না তাহাদিগের মধ্য শিক্ষার স্তরের শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শ্রেণীর সহিত যান্ত্রিক কৃষি শিল্প বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তিশিক্ষার উচ্চতর শাখা শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা

করিতে হইবে। ঐ সকল যান্ত্রিক কৃষি শিল্প প্রভৃতির শ্রেণীতে যে শিক্ষা প্রদান করা হইবে তাহাতে রসায়ণ পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রের কার্য্যকারিতা ও কার্যক্ষেত্রে তাহাদের প্রয়োগ কৌশল প্রতিপাদিত হইবে। এইরূপ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তিশিক্ষার উচ্চতর শাখা শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা করিলে ও উক্ত শ্রেণীতে রসায়নাদি বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রয়োগ বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলে বিজ্ঞানের গবেষণা ও গবেষণা-মূলক সিদ্ধান্তগুলির নীরসতা দূরীভূত হইবে উহাদের সরসতা উপলব্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গবেষণা পরায়ণ ছাত্রদিগের জীবিকা সমস্যার সমাধানের উপায় নির্দ্ধারিত হইবে, বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা বৈকল্য অপসারিত হইবে। অশিক্ষা সুশিক্ষায় পরিণত হইবে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যও সাধিত হইবে এবং শিক্ষিত ব্যক্তির জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণেরও সুযোগ আসিবে।

বানর মন্দির।

লেখক—শ্রীকুমার বিক্রম মজুমদার।

আমার পূজনীয় পিতৃদেব যখন শিমলায় Legislative Assemblyর কার্য্য-নিমিত্ত যাইতেন, তখন শিমলা শৈলের উপরে এই বানর মন্দিরে অনেক সময় যাইতেন। এই মন্দিরে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তাহার সহিত আমার পিতার আলাপ হইত, তিনি উহাকে ভক্তি করিতেন সন্ন্যাসীও তাহাকে ভালবাসিতেন। ক্রমে ক্রমে আমার পিতার সহিত Legislative Assemblyর আরও অনেক Member সেই মন্দিরে যাতয়াত করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে সকলেই ভক্তি করিতে লাগিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী আপন কার্য্যে রত থাকিতেন ও সকলের সহিত কথা কম বলিতেন। একদিন অন্যান্য Members আমার পিতাকে বলিলেন, আপনি সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করুন আমরা সকলে উহার নিকট হইতে কিছু উপদেশ লইব। পিতা তাঁহাকে উহাদের কামনা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। বলিলেন আমি মূর্খ কি উপদেশ দিব। আমি

কিছুই জানি না। কেবল গুরুর উপদেশ মানিয়া চলি। তাহা হইলেও তাহার ভক্তবৃন্দ ছাড়িলেন না। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন। এক বড় সাধু ছিলেন। ভোজনের নিমিত্ত তাহার নিকট অনেক লোক আসিত। রোজ অনেক লোকের সমাগম হইত। একদিন তাহার নিকট একজন সাধু আসিল, এ লোকটা বেশী খাইত। লোকটা কিছু পাগল প্রকৃতি। সকলেই ইহাকে ভোজন করাইত; ক্রমে ইহার নাম হইল পেট-সন্ন্যাসী। এ বেশী খাইত—আর কোথায় চলিয়া যাইত, কেহ জানিত না। একদিন অধিক বেলা হইয়াছে চতুর্দ্দিক নীরব, এমন সময় সে আসিয়া সেই বড় সন্ন্যাসীর সহিত দেখা দিল। সাধু জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি চাও? সে বলিল আমি আপনার নিকট আজ দীক্ষা লইব। বড় সাধু ইহা শুনিয়া চটিয়া উঠিল, তিনি তখন মলত্যাগ করিয়া হস্তধৌত করিতেছিলেন; ভয়ানক চটিয়া বলিলেন "এই লোটাসে তোমার শির তোড় দেঙ্গা।" পেট-সন্ন্যাসী এই বাক্য শুনিয়া আর কোন কথা বলিল না; সে সেস্থান ত্যাগ করিল। বহুদিন পরে সে ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই সাধুর সহিত দেখা দিল, এবং বলিল গুরুজী নারায়ণের সহিত আমার দেখা হইয়াছে। বড় সাধু বড় আশ্চর্য্য হইলেন এবং বলিলেন "তুমি দূর হও ও মিথ্যা কথা।" তখন সে বলিল না মহাশয় আপনি " লোটাসে তোমার শির তোড় দেঙ্গা" যে মন্ত্র দিয়াছেন, সেই মন্ত্রের দ্বারাই নারায়ণকে প্রাপ্ত হইয়াছি। তখন তিনি বলিলেন তুমি ত প্রাপ্ত হইয়াছ আমাকে দেখাইতে পারিবে তাহা হইলে বিশ্বাস করিব। পেট সন্ন্যাসী বলিল ঠিক পারিব। তখন সে নারায়ণকে স্মরণ করিতে লাগিল। নারায়ণ আসিলেন কিন্তু বড় সাধু দেখিতে পাইলেন না। তখন পেট-সন্ন্যাসী রাগিয়া বলিলেন "নারায়ণ তোমার লোটাসে শির তোড় দেঙ্গা"। নারায়ণ তখন কি করিবেন বড় সাধুর সহিত দেখা দিলেন। তাইত বলিয়া থাকে "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূরে"। গল্প শেষ হইয়া গেল। বানর মন্দিরের বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এ গল্প বলিলেন। ইহার অর্থ গুরু বড় সাধু অনেক সময় যাহা জানেন না, বুঝেন না, শিষ্য নিম্ন কোন ব্যক্তি তাহা বুঝেন।

হিন্দু-সংগঠন ও শুদ্ধি।

লেখক—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

হিন্দু বলিলে কাহাদিগকে বুঝায় ইহা আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। প্রধানতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্তর্গত যাঁহারা অর্থাৎ সোজা কথা বলিলে বলা যায় যাঁহারা জাতিভেদ মানেন; প্রতিমাপূজা ও যাগযজ্ঞ করেন; ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, পুরাণ, স্মৃতির অনুসরণে জীবন-যাপন কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগকেই আমরা হিন্দু অভিধা দিয়া থাকি। কিন্তু ইহারা সংখ্যায় অধিক হইলেও ভারতবর্ষে এই হিন্দু-গণ্ডীর মধ্য হইতেই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ধর্ম্মগত সামান্য বা স্থলবিশেষে বিশেষ মত পার্থক্যে পৃথক্‌কৃত হইয়া শিখ, আর্য্যসমাজী, ব্রাহ্ম (অধিকাংশ ব্রাহ্ম হিন্দুনামে পরিচয় দেন) প্রভৃতি নামে বহির্গত হইয়া হিন্দু নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে সনাতনপন্থী—বর্ণাশ্রমধর্ম্মী ও শিখ, আর্য্যসমাজী ব্রাহ্ম প্রভৃতির সমবায়েই একটী বিরাট্ হিন্দুজাতির সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইতেছে। অনেকেই হয়ত জানেন, শিখেরা প্রতিমা পূজার বিরোধী নহে—আমাদের কালীমন্দিরে ভক্তিভরে তাঁহারা প্রবেশ করেন, পূজা প্রদান করেন। একমাত্র "গ্রন্থসাহেব" তাঁহাদের শ্রদ্ধার বস্তু হইলেও ভগবান তাঁহাদের একমাত্র উপাস্য হইলেও বর্ণাশ্রমীহিন্দুদের ক্রিয়া কলাপের প্রতি উহারা বিদ্বেষ পোষণ করেন না বরং অধুনা সমধিক শ্রদ্ধাই প্রদর্শন করিয়া থাকেন—ইহাদের মধ্যেও জাতিভেদ নাই—সম্প্রদায় ভেদ আছে। এককালে শিখধর্ম্ম মুসলমান প্রভৃতি বিধর্ম্মীগণকেও নিজ অঙ্কে স্থান দান করিতে অকুণ্ঠিত ছিল। দয়ানন্দ প্রবর্ত্তিত আর্য্যসমাজী প্রতিমাপূজা করেন না—পুরাণাদি মানেন না—এক বেদকে শিরোধার্য্য করেন—যজ্ঞাদি করিয়া থাকেন—জাতিভেদকে আমল দেন না—সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীকে স্ব সমাজে 'শুদ্ধি' প্রথা দ্বারা গ্রহণকরতঃ হিন্দুর জন-সংখ্যা-বর্দ্ধনে সর্ব্বদা চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মেরা যাগযজ্ঞও করেন না—দেব দেবীও মানেন না। স্মৃতি পুরাণেরও ধার ধারেন না—নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন—বেদ বেদান্ত তাঁহাদের সঙ্কলিত ধর্ম্মগ্রন্থের মূল উৎস। ব্রাহ্মেরাও জাতিভেদ মানেন না, অন্যধর্ম্মা-

বহুস্ত্রীকে ব্রাহ্ম করিতে পারেন। চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মেও জাতিভেদ
ছিলনা—এক সময়ে মুসলমানও প্রেমের টানে অনুপ্রাণিত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের
প্রশস্তবক্ষে স্থানলাভ করিয়াছিল; যদিও সময়ের পরিবর্ত্তনে ও প্রেমসিন্ধুর
স্রোত রুদ্ধ হওয়ায় আজ প্রশস্ত বক্ষঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এই চৈতন্য
সম্প্রদায়ীরা বর্ণাশ্রমীদের স্মৃত্যুক্ত দশকর্ম্মের অধীন নহেন—ইহাদের বিধি-
ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। এইরূপ স্বল্পাধিক মত বৈষম্য বিদ্যমান থাকিলেও ইহারা
প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই বিরাট হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত; এ বিষয়ে কোন
সন্দেহের অবকাশ নাই। নানা অবান্তর ভেদ সত্ত্বেও যাঁহারা বেদ বা
বেদমূলক ধর্ম্মশাস্ত্র মানেন—অনুশাসিত হন গোমাংস ভক্ষন করেন না।
তাঁহারাই হিন্দু—বর্ত্তমানে হিন্দুর অন্য লক্ষণ নির্দ্দেশ নিষ্ফল। শুধু হিন্দু-
ধর্ম্মে নয়—মত বৈষম্যের হেতু বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া প্রায় সকল
ধর্ম্মেই দেখা যায়। মুসলমান ধর্ম্মে সুন্নি শিয়া নামে দুইটী প্রধান সম্প্র-
দায় আছে। সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যেও জুম্মার নামাজ লইয়া মতভেদে দল-
ভেদের অস্তিত্ব প্রকটিত হইয়াছে। খৃষ্টানের মধ্যেও রোমান ক্যাথলিক
প্রোটেষ্টাণ্ট গ্রীক প্রভৃতি নামে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের বিদ্যমানতা দৃষ্ট
হইতেছে। এমন কোন ধর্ম্ম নাই যাহার অভ্যন্তরে মতভেদ সৃষ্টি করতঃ
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে নাই। এইরূপ সম্প্রদায় ভেদ হওয়াই
স্বাভাবিক—যেহেতু মানুষ ত কলের পুতুল নয়, মননশীলের নিত্য পরি-
বর্ত্তনের মধ্য দিয়া সত্যরাজ্যে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টাই মনুষ্যত্ব। মুসল-
মান খ্রীষ্টান যদি সাম্প্রদায়িক অনৈক্য সত্ত্বেও মুসলমান ও খৃষ্টান জাতির
সাধারণ স্বার্থ রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে; অখণ্ডরূপে পরিণত হইতে পারে;
ধর্ম্ম ও জাতির অপমানকে প্রত্যেকের অপমানজনক বোধ করিতে পারে;
জাতিধর্ম্মের সম্মান রক্ষার্থে প্রাণপাত করিতে পারে, আত্মহারা হইতে পারে;
তবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হিন্দু, বিধর্ম্মী কর্ত্তৃক হিন্দুর ধর্ম্মগত অধিকার বিলুপ্ত
হইবার সম্ভাবনা ঘটিলে যে কোন সম্প্রদায় ভুক্ত হিন্দু অত্যাচারিত হইলে
কেননা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রতীকার করিতে সক্ষম হইবে? শিয়া সুন্নিকে
মসজিদের সম্মান রক্ষার্থ সাহায্য করিলে তাহাকে ত সুন্নি ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে
হয় না। তুমি বর্ণাশ্রমী; আর্য্য সমাজির ধর্ম্মগত অধিকার পথে কেহ কণ্টক
স্বরূপ দণ্ডায়মান হইলে তুমি, আমার হিন্দু ভ্রাতার অধিকার ক্ষুন্ন হইতেছে,
ইহা বিরাট হিন্দু সমাজেরই ক্ষুন্নতা মনে করিয়া তাহার বেদনার অংশভাগী

হইয়া পূর্ণোৎসাহে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কণ্টক উৎপাটিত করিয়া পথ পরিষ্কার করিবার সহায়তা কর—ইহাই তোমার কাছে হিন্দু সমাজ চায়। ইহাতে তোমার বর্ণাশ্রমিত্ব নষ্ট হইবার কোন ভয় নাই। তুমি যাহা আছ, তাহাই থাকিবে। শত মত পার্থক্য সত্ত্বেও বিরাট হিন্দু-সমাজ এই-টুকু চায়, যেন হিন্দু বলিয়াই প্রত্যেক হিন্দুর সুখে, দুঃখে, সম্মানে, নির্য্যাতনে তোমার সহানুভূতি থাকে। এক পরিবারে সকলের মত একরূপ হয় না। তবু পরিবারের কোন একজনের মান অপমানে, সুখে দুঃখে যেমন আমরা অভিভূত না হইয়া পারিনা মতানৈক্যের কথা তখন মনেও আসেনা; যে কোন সম্প্রদায়ের ভুক্ত যে কোন হিন্দুর সম্বন্ধেও আমাদের মনোভাব তদ্রূপ পোষণ ও ক্রম বর্দ্ধমান করিয়া তুলিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্য সংসাধন নিমিত্তই হিন্দু সংগঠনের প্রয়োজন। শিখ, জৈন, আর্য্য-সমাজী, ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণব প্রভৃতি যত বিভিন্ন হিন্দু-সমাজ আছে, তাহা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাশ্রয়ী সমাজের সহিত যোগ করিয়া এক বিরাট পরিপুষ্ট হিন্দু-শরীর গড়িয়া তুলিতে হইবে। মত বৈষম্য থাকিলেও প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ সমাজই যে বিপুল হিন্দুদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ এইরূপ বোধ প্রতি সমাজের প্রতি ব্যক্তির অন্তরে সঞ্চারিতকরতঃ বিরাট দেহের প্রতি মমতা উৎপাদন করাই হিন্দু সংগঠনের প্রধান কার্য্য। এই কার্য্য সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই জগতের সম্মুখে হিন্দু একটী মহতী শক্তিশালিনী জাতিরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য হইবে। হস্ত, পদ, মুখ, নাসিকা চক্ষু কর্ণ একদেহে অবস্থিত হইয়া যেমন একরূপ কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছেন বিভিন্ন কর্ত্তব্যে নিয়োজিত থাকিয়া দেহের সজীবতা রক্ষা করিতেছে; সেইরূপ বিভিন্ন আচার--সম্পন্ন, মত সমন্বিত হিন্দু-শাখাগুলিও স্ব স্ব সমাজের বিশ্বাসানুযায়ী ধর্ম্মকর্ম্ম আচরণ করিয়া বিরাটদেহের কোন অপচয় করিবে না বরং নানাভাব বৈচিত্র্যে বিরাট দেহের শোভাবর্দ্ধন ও স্বাধীনতা স্বচ্ছন্দতার সহায়ক হইয়া বিরাট হিন্দু-শরীরকে দুর্জ্জয় কালের আক্রমণ হইতে অক্ষত রাখিতে সমর্থ হইবে।

ইচ্ছা মাত্রেই হিন্দু-সংগঠন সম্ভব হইবে না। শুধু বক্তৃতা দ্বারা বা প্রবন্ধ নিবন্ধের শক্তিতেও হিন্দু-সংগঠন সাফল্য মণ্ডিত হওয়ার আশা নাই। সত্যকার হিন্দুসংগঠন করিতে হইলে, চাই অকৃত্রিম আন্তরিকতা, চাই শারীরিক ও মানসিক বল, সর্ব্বোপরি চাই স্বধর্ম্মে অনুরক্তি। উক্ত গুণ কয়টীর অভাবেই আজ হিন্দুর শোচনীয় অবস্থা। তাই আজ সে একতা শূন্য, বিধর্ম্মীর নিকট

ঘৃণা, অবহেলিত ও অত্যাচারিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। তাহার রমণীকুল লাঞ্ছিতা ধর্ষিত হইতেছেন। তাহার উপাস্য দেবদেবীর মূর্ত্তি বিধর্ম্মী কর্ত্তৃক চূর্ণীকৃত ও পবিত্র মন্দির অপবিত্র হইতেছে। সে অবিচার অত্যাচারে বাধা উৎপাদন করিতে পারিতেছেনা। দুর্বৃত্তদলের উপযুক্ত শাস্তি দানে সে অপারগ হইতেছে। ছিন্নভিন্ন প্রেমশূন্য বিভিন্ন সমাজ বা সমাজান্তর্গত শ্রেণীগুলিও পরস্পর সাহায্যদানে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছে। বিরাট হিন্দু সমাজ, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্বন্ধ জীবন্ত করিয়া রাখিতে পারে নাই। তাই এক অঙ্গ, অন্যাঙ্গের বেদনায় সাড়াদিতে ভুলিয়া গিয়াছে। আর্য্য সমাজীর বিপদে বর্ণাশ্রমী সহানুভূতিহীন পক্ষান্তরে বর্ণাশ্রমীর সঙ্কট সময়ে আর্য্যসমাজ শিখ জৈন প্রভৃতির মনোভাবও তদ্রূপ। এমন কি বর্ণাশ্রমীর অন্তর্গত বিভিন্ন জাতিগুলিও পরস্পরের অপমান লঙ্ঘনায় অচঞ্চল। হিন্দু সমাজের জীবন্মৃত অবস্থা তিরোহিত করিয়া সর্ব্বাবয়বে এমন এক চেতনার সঞ্চার করিতে হইবে; যাহাতে কোন এক অঙ্গের আঘাতে সমগ্র দেহ যাতনা অনুভব করিবে।

হিন্দুর সর্ব্বাবয়বে চেতনা আনিতে হইলে মুশলমান মৌলবীদের মত চাই কতগুলি ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু-প্রচারক। তাঁহারা অকপট মনে, নির্ভীক প্রাণে হিন্দু-সংগঠনের সহায়তা করিবেন। স্বধর্ম্মের অভ্যুদয়ের জন্য আত্মদান করিতে কৃত সংকল্প হইবেন। স্বধর্ম্ম নিষ্ঠায় স্বগণ্ডীর হিন্দু সন্তানগণকে নিষ্ঠাবান্ করিয়া তুলিবেন অন্য সম্প্রদায়ী হিন্দুর প্রতি তাঁহাদের মমত্ব বুদ্ধি জাগরিত করিবেন। সমগ্রদেহের স্বার্থ অনুভব করিবার শিক্ষা দিবেন। গ্রামে গ্রামে বা পাঁচসাত গ্রাম একত্র করিয়া এক একটী শরীর চর্চ্চার ও ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপনকরতঃ হিন্দু-সন্তানবৃন্দকে বলবান ধর্ম্মপ্রাণ ও নীতিমান করিয়া গড়িবেন। এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলেই অনতিবিলম্বে হিন্দুর অভ্যুদয় সাধিত হইবে। হিন্দুর মানমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সচেতন সবল হিন্দুর প্রতিকূলাচরণ করিতে তখন সকলেই সঙ্কুচিত না হইয়া পারিবে না।

হে হিন্দুর বর্ণাশ্রমী সম্প্রদায়ের মুখস্বরূপ ব্রাহ্মণ! আর কতকাল তোমরা নীরব থাকিবে? হিন্দুকে সজীব করিবার ভার ত তোমাদের শিরেই ন্যস্ত। তোমাদের দায়িত্ব তোমরা কেন বিস্মৃত হইতেছ? দেখিতেছ না তোমাদের কর্ত্তব্য অকারণে হিন্দু সমাজ ছিন্ন ভিন্ন বিদ্রোহপূর্ণ! তোমাদের

পূর্ব্ব পুরুষের ত্যাগ ও চরিত্রমাহাত্ম্য ও ধর্ম্ম-প্রাণতার জন্য আজও হিন্দু গৌরবান্বিত। তাঁহাদের অবস্তন পুরুষ তোমরা হিন্দুর এ দুর্দ্দিনে সাংখ্যের পুরুষের মত তোমাদিগকে নির্লিপ্ত দেখিতেছি কেন? তোমাদের অধ্যয়ন কি শুধু ন্যায়ের তর্কে ও স্মৃতির ব্যবস্থায়ই পর্য্যবসিত হইবে? বিধর্ম্মী কর্তৃক হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম বিপন্ন—স্বাধিকার চূর্ণ হইতেছে—কলঙ্কের কথা, মাতৃকুলের লাঞ্ছনার অবধি নাই—পিশাচকুলের দৌরাত্ম্যে তাঁহারা সদা সন্ত্রস্ত। এখনও তোমরা কি ভাবিতেছ? তোমাদের ঔদাসীন্য কি তোমাদিগকে অসার প্রতিপন্ন করিতেছেনা? এখনও সময় আছে। আলস্য ও ঔদাস্য পরিহার করিয়া একবার ঋষির ন্যায় হুঙ্কার দিয়া দাঁড়াও—স্বকর্ত্তব্যে মনোনিবেশ কর। হিন্দুকে জাগাও সঙ্ঘবদ্ধ কর হিন্দুর স্বার্থ রক্ষায় জীবনপাত করিবার শিক্ষা দাও। আজও হিন্দু সমাজ (বর্ণাশ্রমী হিন্দু সমাজ) তোমাকে মানে সে তোমার আদেশে তোমার ধর্ম্মপ্রাণতায় আত্মরক্ষার লাভ করিবে। অত্যাচারীর প্রত্যুত্তর সে দিতে পারিবে। তোমরা কি প্রতিবেশী মুশলমানকে দেখিতেছনা, তাহারা কিরূপ সংঘবদ্ধ? তাহারা ধর্ম্মের জন্য কিনা করিতে পারে? অধিকাংশ নিরক্ষর মুশলমানকে ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিল কে? ধর্ম্মোন্মত্ত মৌলবীগণ নহে কি? ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমাদের কর্ত্তব্য মৌলবীগণের কর্ত্তব্যের তুল্য। ধর্ম্মগত স্বাধিকার রক্ষার জন্য তাহারা যেমন প্রচার করিতেছে, স্বধর্ম্মীকে উত্তেজিত করিতেছে; তোমাদেরও সেইরূপ করা আবশ্যক।

আমাদের এরূপ বলার যেন কেহ বিকৃত অর্থ না করেন। ধর্ম্মোন্মত্ত মৌলবীগণের অসংযত বক্তৃতায় যদ্রূপ কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইয়া নিরক্ষর মুশলমানগণ হিন্দুর মনে অকারণ বেদনা দান করিতেছে—গোবধ করিয়া হিন্দুমন্দির অপবিত্র করিতেছে, হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্মে অযথা বিঘ্নোৎপাদন করিয়া প্রতিবেশীর কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতেছে, আমরা হিন্দু পুরোহিত সম্প্রদায়কে তদ্রূপ নিন্দিত উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিতে বলিনা; যাহার ফলে অশিক্ষিত হিন্দুগণ মুশলমানের পবিত্র মসজিদ শূকরের রক্তে অপবিত্র করিতে পারে। গায় পড়িয়া তাঁহাদের নমাজের সময় বিরক্ত করিতে ইচ্ছুক হয়, পূর্ব্বের সৎভাব নির্ব্বোধের ন্যায় পরিত্যাগ করিতে দ্বিধাশূন্য হইয়া আত্মঘাতী হইতে পারে। হিন্দু প্রচারক হিন্দু সন্তানগণকে সংঘবদ্ধ করিবেন বলবান ও নীতিমান করিবেন; যেন তাহারা মানুষের মত আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হয়। তিনি কখনও অধর্ম্মের জন্য উন্মাদনা প্রদান করিবেনা। অন্যধর্ম্মাবলম্বীকে উপদ্রুত

ও বিব্রত করিয়া তুলিবার জন্য আগ্রহ দেখাইবেন না বরং আত্মরক্ষার শক্তি সঞ্চয় করতঃ যাহাতে বিধর্ম্মী দেশবাসীর সহিত সম্প্রীতিতে বাস করা পারা যায় তাহার উপদেশ করিবেন। হিন্দু সাধারণের কর্ত্তব্য যাহাতে হিন্দু সংগঠনের উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া কার্য্যতঃ হিন্দু-সংগঠন করিতে পারেন, তদনুরূপ অধ্যবসায় প্রয়োগ করা। হিন্দু সংগঠনের শুভ সঙ্কল্প যদি সফল হয়; তবে জগত সসম্ভ্রমে চাহিয়া দেখিবে, হিন্দু কি বিরাট! হিন্দু কি শক্তিধর! হিন্দু কি উদার ও মহান! তখন হিন্দুর ললাট হইতে কাপুরুষত্বের দুর্নাম দূর হইয়া যাইবে। সবল হিন্দুকে জাগ্রত সিংহকে কেহই বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করিবে না। অধিকার খর্ব্ব করা থাক, সকলেই হিন্দুর অধিকার রক্ষা করিয়া চলিতেই ব্যগ্র হইবে। ভগবান করুন, হিন্দুসংগঠন সাফল্য মণ্ডিত হউক—হিন্দু আর একবার মানুষের মত দাড়াইয়া বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করুক।

হিন্দু সংগঠন আলোচনা করিতে বসিয়া শুদ্ধি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নহে। বর্ত্তমানে শুদ্ধি প্রথা একেবারে উপেক্ষনীয় নহে উহা হিন্দুসমাজের জন-সংখ্যা অপচয়ে নিবারণের সহায়তা করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ সুতরাং শুদ্ধি আন্দোলনকে বিশ্বাসের চক্ষে দর্শন কখনও কর্ত্তব্য নহে। অবশ্য একথা সহস্রবার স্বীকার্য্য যে আর্য্যসমাজীদের ন্যায় অবাধ শুদ্ধিপদ্ধতি বর্ণাশ্রমী হিন্দুসমাজে চলিতে পারে না চলা সমীচিন নহে। কিন্তু বর্ণাশ্রমী হিন্দুদের যে সকল সন্তান ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মুসলমান খ্রীষ্টান হইয়াছে; তাহারা যদি পুনরায় যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া স্বধর্ম্মে স্বসমাজে ফিরিয়া আসিতে চাহে; তবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা কখনও বিধেয় নহে—চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহা সুবিচারও নহে। যে সকল রমণী বিধর্ম্মী দুরাত্মাগণ কর্ত্তৃক অপহৃতা লাঞ্ছিতা হইয়া মুসলমান খ্রীষ্টানের অন্নপানীয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন বলপূর্ব্বক বা প্রলোভনে যাহাদিগকে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছে; আমরা কি তাঁহাদিগকে স্ব সমাজে ফিরিয়া আসিবার আকুল বাসনা সত্বেও গ্রহণে অসম্মত হইব। ইহাদিগকে শুদ্ধি সাহায্যে দ্বারা শুদ্ধ করিয়া বর্ণাশ্রমীদের সমাজে গ্রহণ করাই যুক্তি সঙ্গত ও সহৃদয়তার কার্য্য। শুদ্ধিপ্রথার সীমাবদ্ধ পূর্ব্বোক্ত অংশই বর্ণাশ্রমী গ্রহণ করিতে পারেন এবং আত্ম সমাজের অপচয় নিবারণ করিতে পারেন। আর্য্য-সমাজীরা যেমন মুসলমানাদি

যে কোন বিধর্ম্মীকে শুদ্ধি প্রথা দ্বারা হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার জাতিভেদ হীন বিশালতাকে স্থান দিতে পারেন—আপন করিয়া তুলিতে পারেন; বর্ণাশ্রমীদের তদ্রূপ করিবার শক্তি ও সুবিধা নাই। জাতিভেদই ইহার কারণ। মুসলমান খৃষ্টানকে শুদ্ধ করিয়া হিন্দু করা সহজ হইতে পারে পরন্তু তাহাদিগকে বর্ণাশ্রমীরা কোন বর্ণের অন্তর্গত করিয়া কোন জাতিতে স্থান দিবে। অতি বড় নিম্নস্তরের জাতিও তাহাদিগকে গ্রহণ সম্মত হইবেনা; কাজেই বর্ণাশ্রমীহিন্দুগণের বিধর্ম্মীগণকে স্বধর্ম্মে গ্রহণের সঙ্কল্প না করাই শোভন। শুদ্ধি কার্য্যের ভার ও অধিকার আর্য্যসমাজীদের উপরেই ন্যস্ত থাকুক। বর্ণাশ্রমীরা অবাধ শুদ্ধিকে সমর্থন করতঃ স্ব সমাজের আয়তন বর্দ্ধিত করিতে অপারগ হইলেও তাঁহারা কখনও আর্য্য-সমাজীদের শুদ্ধিকার্য্যে অন্তরায় হইবেন না—দূর ভবিষ্যতে আর্য্য-সমাজীদের কার্য্যফলে হিন্দুর কল্যাণ সাধিত হইবে; এইরূপ বিশ্বাস যেন অন্তরের নিভৃত কোণে স্থান প্রদান করেন। বর্ণাশ্রমীদের মনোভাব এই-রূপ হইলেই পরস্পরের প্রীতি—প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকিবে—হিন্দু সংগঠনের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থা আসিবে না। হিন্দু উত্তরোত্তর রুগ্নাবস্থা পরিহার করতঃ স্বাস্থ্যলাভে সমর্থ হইবে। স্ব স্ব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট বজায় রাখিয়া নানা মত বৈষম্য ও আচার পার্থক্য সত্ত্বেও অন্য সম্প্রদায়ের হিন্দুর প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন হওয়া ও ভ্রাতৃভাব পোষণ করা সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর এই সশ্রদ্ধ ভ্রাতৃভাবই হিন্দুকে এক বিরাট মূর্ত্তি দান করিয়া মহিমায় ও গরিমায় জগতকে চমৎকৃত করিবে। প্রত্যেক হিন্দু সন্তান সেই মহিমাময়ী গঠনের মূর্ত্তি সহায়তা কর—ধন্য হও।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্ট্রীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩৩শ বর্ষ, ৩৩শ খণ্ড
৭ম সংখ্যা।

কার্ত্তিক।

১৩৩৩ সাল।
১৮৪৮ শকাব্দাঃ

দেবত্ব।

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্ত-ভূষণ ভক্তি-রঞ্জন।

দীনবন্ধুর কৃপায় দেবত্ব প্রকাশিত করিয়া আত্ম-প্রসাদ-লাভে সন্তুষ্ট হইয়াছি কারণ, যে কনিষ্ঠ পুত্র ধ্রুবকুমারের পিতৃভক্তির কথা লিখিয়াছি সে আর ইহজগতে নাই। তাহার বিয়োগে শোক প্রকাশ করি না, দুঃখ ও করি না, কারণ তাহা হইলে লীলাময়ের বিচারে দোষ দেওয়া হইবে। যিনি চতুর্দ্দশ ভুবনকে বালকের হস্তস্থিত কন্দুকবৎ নাচাইতেছেন তাঁহার বিচারে কখনও দোষ থাকিতে পারে না। মানব অপূর্ণ সে দোষশূন্য হয় না।

প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং
পরাঙ্মুখী হি বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ ॥

কুমার সম্ভবে। ৩। ২৮

কিম্বা—

Drut no perfection is so absolute
That some impurity doth not pollute.
Shakspeare Lucreece

কিন্তু ভগবান সম্পূর্ণ।

আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহাতে কোন দোষ দেখিতে পাই না তজ্জন্য পাশ্চাত্য অমর কবি কহিয়াছেন——

"Love looks not with the eyes, but with the mind,
And therefore's wing'd cupid painted blind."
Shakspeare Mid summer night's dream,
Act I scene I

আমি জড়দেহকে ভালবাসি শরীর ত দ্বিতীয় নরক---

মাংসাসৃক্‌পূযবিন্মূত্র স্নায়ু মজ্জাস্থি সংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভবিতাপি সঃ॥
বিষ্ণুপুরাণে ১ম অংশে ১৭। ৬৩।

অন্যত্র—

কোবাস্তি ঘোরো নরকঃ স্বদেহঃ।
মণিরত্নমালায়াং।

অন্যত্র—

অস্থি স্থূণং স্নায়ুযুতং মাংস-শোণিত-লেপনম্।
বর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধি পূর্ণং মূত্র-পুরীষয়োঃ॥
জরা শোক সমাবিষ্টং রোগায়তন-মাতুরম্।
রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ॥
মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ৩২৯। ৪২-৪৩।
মনু সংহিতায়াং ৬। ৭৬-৭৭।
সাংখ্য-দর্শনে ৩। ৭৫ সূত্র ভাষ্য।

অন্যত্র---

মেদোঽস্থি মাংস-মজ্জা-সৃক্ সঙ্ঘাতেঽস্মিন্ ত্বগাবৃতে।

শরীরে বাস্তিকা-শোভা সদা বীভৎস দর্শনে ॥

নাগানন্দে ৫ম অঙ্কে।

অন্যত্র—

ন স্বীকরোষি হে মূঢ়। কাষ্ঠ পুত্তলকং শুচিং।
অমেধ্য ঘটিতং যন্ত্রং কস্মাদ্রক্ষসি পূতিকম্'।
ইমং-চর্ম্মপুটং তাবৎ স্ব বুদ্ধ্যৈব পৃথক্ কুরু।
অস্থি পঞ্জরতো মাংসং প্রজ্ঞা-শস্ত্রেণ মোচয় ॥
অস্থীন্যপি পৃথক কৃত্বা পশ্যমজ্জা নমস্ততঃ।
কিমত্র সারমস্তীতি স্বয়মেব বিচারয় ॥
এবমন্বিষ্য যত্নেন ন দৃষ্টং সারমত্র তে।
অধুনা বদ কস্মাৎ ত্বং কায়মদ্যাপি রক্ষসি।

বোধিচর্য্যাবতার-পঞ্জিকায়াং ৫। ৬১-৬৪।

এ অমেধ্য শরীরকে পুত্র কন্যা স্ত্রীকে ভালবাসিব, আর চিন্ময়-দেহ ভগবানকে ভাল বাসিব না? সুতরাং করুণাময় ভগবান যাহা করেন তাহা জীবের মঙ্গলের জন্য করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু কহিয়াছিলেন—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা—
-মদর্শনা মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

শ্রীচরিতামৃতে অন্ত্যলীলায়াং ২০ পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রভু ভক্তভাবে যেরূপ ভগবানকে ভাল বাসিয়াছিলেন, সেইরূপ ভগবানকে ভালবাস, তাহা হইলে তাঁহার কোন দোষই দেখিতে পাইবে না। তবে কথা এই যে দুঃখী লোকের সেবায় আমার টাকায় না কুলাইলে ধ্রুব মাসে মাসে ৪০। ৫০ টাকা পাঠাইয়া দিত। তাহাতে সে একবার লিখিয়াছিল---'বাবা আমার কি বেশী টাকা আছে যে আপনার সাধ আহ্লাদ পূর্ণ করিব?' সে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া দোকান করিয়াছিল তাহা বাড়াইতে ইচ্ছা করিয়াছিল তজ্জন্য ৪০। ৫০ টাকার অধিক পাঠাইতে না পারিয়া দুঃখ করিয়া পত্র দিয়াছিল। পেন্‌শনের অধিক টাকা খরচ করা লীলাময়ের ইচ্ছা থাকে নাই আমার সে কর্ম্ম থাকে নাই। আমার যাহা প্রাপ্য ভগবান আমাকে তাহাই দিয়াছেন, যাহা প্রাপ্য নহে, তাহা কি তিনি কাহা-

রও কাড়িয়া দিবেন ?

"————কৃতং যস্তবতাং পুরা।
তৎ কোঽপ হর্ত্তুং শক্লোতি দাতুং কশ্চাকৃতং ত্বয়া॥"

বিষ্ণুপুরাণে ১। ১১। ১৭।

তজ্জন্য কহিয়াছেন————

"যস্য যাবৎ স তেনৈব স্বেন তুষ্যতি বুদ্ধিমান্"।

ঐ ১। ১১। ২১।

ভগবানের অবিচার কিছুই নাই সুতরাং তাঁহার বৈষম্য বা অকৃপা থাকিতে পারে না—

"বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যেন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি॥"

বেদান্তদর্শনে ২। ১। ৩৩।

তিনি কর্ম্মানুসারে ফল দিয়া থাকেন—

"ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নদৃনাদিত্বাদুপপদ্যতে বাপ্যুপলভ্যতে চ।

ঐ ২। ১। ৩৫।

আমার কর্ম্ম থাকে নাই, তাই লীলাময় তাহাকে টানিয়া লইলেন। ইহা সেই লীলাময়ের লীলা—

"লোক বত্তু লীলা কৈবল্যম্।"

ঐ ২। ১। ৩৩।

জ্যেষ্ঠ পুত্র ভীষ্মদেব এই গ্রামের ও অন্যগ্রামের কতকগুলি লোক লইয়া গিয়া জীবিকা দিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই (বৈশাখ সংখ্যায়) উক্ত হইয়াছে। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাকান্তও পরদুঃখে কাতর। একদিন শীতকালে একটী বৈষ্ণববালক আমার নিকট ঔষধ লইতে আসিয়াছিল, তাহা যেরূপ শীতে বস্ত্র থাকে নাই দেখিয়া তাহার গায়ের ৮৲ টাকা মূল্যের কোট খুলিয়া দিয়া তাহাকে বলিল "তুই গায়ে দে" নিজে গেঞ্জি গায়ে দিয়া রহিল। তখন তাহার ৮ বৎসর বয়স। একদিন পুষ্করণীর তীরে দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিতেছিল—আমায় কহিয়াছিল দাদামশাই। জলে ত পড়বে না ? এ জ্ঞান অনেক বড় লোকের ও দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ জলে শৌচ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কিন্তু তাহা পাপ। অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন 'যদি কল্য জয়দ্রথকে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে বধ না করি তাহা হইলে যে ব্যক্তি জলে মূত্র, শ্লেষ্মা ও পুরীষ ত্যাগ করে, তাহার পাপ গ্রহণ

করিব—

অপ্সু শ্লেষ্ম পুরীষং বা মূত্রং বা মুঞ্চতাং গতিঃ।
তাং গচ্ছেয়ং গতিং ঘোরাং ন চেদ্ধন্যাং জয়দ্রথম্॥

মহাভারতে দ্রোণ পর্ব্বণি ৭১। ৩০

অন্যত্র—

ন ফালকৃষ্টে ন জলে ন চিত্যাং ন চ পর্ব্বতে।
ন জীর্ণ দেবায়তনে ন বল্মীকে কদাচন॥

মনুসংহিতায়াং ৪। ৪৬।

অন্যত্র-

নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা ষ্ঠীবনং বা সমুৎসৃজেৎ।
অমেধ্যলিপ্তমন্যদ্বা লোহিতং বা বিষাণি বা॥

ঐ ৪। ৫৬।

আরও রাধাকান্ত বিশ্বপ্রেমিক; যদি কেহ কাহাকেও প্রহার করে, তাহা হইলে সে কাঁদে (যদিও পরদুঃখ দেখিয়া কাঁদা আমারও স্বভাব) যদি কেহ বাড়ীতে আসে তাহা হইলে রাধাকান্ত জিজ্ঞাসা করে "হেঁগা তুমি আমার কে হও?" তাহা শুনিয়া নবাগতের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে। রাধাকান্ত ও মৎস্য দেশে (ময়মনসিংহে) বাস করিয়া তাহার পিতার ন্যায় নিরামিষাশী। ইহাই আমার আনন্দ। অনেক ব্রাহ্মণ শ্রীভাগবত ব্যবসায়ী, বৈষ্ণবগণও মৎস্য ত্যাগ করিতে পারেন না! পুয ও রক্ত তাঁহাদের এত প্রিয়!

বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিপত্তি। §

অনুবাদক—শ্রীসুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, বিদ্যানিধি।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীতে অক্সফোর্ডের একজন বিজ্ঞ অধ্যাপক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন---প্রবন্ধের মর্ম্ম, "বুদ্ধের জীবনী একটী উপকথা ও বুদ্ধের অস্তিত্ব ও কাল্পনিক।"

বুদ্ধের অস্তিত্ব যে কাল্পনিক নহে তাহা আজকাল পাশ্চত্য পণ্ডিতদিগের সর্ব্ববাদিসম্মত। আজকাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বুদ্ধের পৌর্ব্বকালিক অনেক বস্তু ও ব্যক্তির প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না, কিন্তু বুদ্ধের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা সন্দিহান নহেন। আবার, কালক্রমে অযোধ্যা, দিল্লী, মথুরা প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে যে অদ্ভুত অদ্ভুত পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়া ভারতীয় সভ্যতার অতি প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিবে না এবং নিখিল জগৎকে স্তম্ভিত করিবে না তাহা কে বলিতে পারে?

ভারতে বৌদ্ধযুগের আলোচনা করা যেরূপ আবশ্যক বৌদ্ধযুগের পৌর্ব্বকালিক ইতিহাস আলোচনা করা তদ্রূপ, এমন কি, ততোধিক আবশ্যক, যেহেতু বৌদ্ধযুগের পৌর্ব্বকালিক ইতিহাস আলোচনা দ্বারাই বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান ও তাহার প্রকৃত তত্ত্ব প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। যে সকল মহাপুরুষ জগৎকে মৌলিক ও হিতকর কিঞ্চিৎ প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকই তাঁহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি যে মহত্ত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার পারিপার্শ্বিক অবস্থারই অনুরূপ ছিল; এরূপ ক্ষেত্রে বুদ্ধ যে তাঁহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীন ছিলেন না, তাহা মনে করা ভ্রান্তি মূলক। বুদ্ধের পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোচনা করিতে গেলেই তাঁহার পৌর্ব্বকালিক যুগের আলোচনা করিতে হইবে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তখন দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা ভারতীয় সমাজের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার

---

§ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল মহাবোধি সোসাইটীতে হিন্দু-পত্রিকা'র সম্পাদক রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর সি, আই, ই, প্রদত্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।

করিয়াছিল। তৎকালে ষড়দর্শন ছাড়াও আরও অন্যূন ষাট্‌টী দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং ঐ দর্শনগুলির প্রত্যেকেরই স্বাতন্ত্র্য ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর দার্শনিকদিগের মধ্যে লোকায়ত সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরাই সম্পূর্ণ চরমপন্থী ছিলেন। তাঁহাদের মত এই "স্বর্গও নাই, মুক্তিও নাই, পরলোক ও নাই এবং দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেলেই মনুষ্যের সব শেষ হইয়া গেল।" তাঁহারা বলেন,--"চতুর ধর্ম্ম যাজকগণ অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার জন্যই কতকগুলি ধর্ম্মকৃত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন এবং বেদ বিধায়কগণ ভণ্ড ধূর্ত্ত ও দানব প্রকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন।"

বুদ্ধের আবির্ভাব কালে মহাবীর একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। বিষয়বাসনা জয় করাই ঐ সম্প্রদায়ের লক্ষ্য ছিল। যেমন মহাবীর জিন বা জয়ী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও তাঁহার সম্প্রদায় জৈন নামে অভিহিত হইয়াছিল, তেমনই সিদ্ধার্থ বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানে আলোকিত বা জাগরিত আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন ও তাঁহার সম্প্রদায় বৌদ্ধ নামে অভিহিত হইল। জৈন ও বৌদ্ধ এই উভয় সম্প্রদায়ের নীতিগত ও তত্ত্বগত সৌসাদৃশ্য ছিল। তৎকালে রাজন্যবর্গ ও সম্পৎশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এবং অদ্যাপি জৈনধর্ম্ম ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে।

বুদ্ধের সময়ে যদিও ভারতের গৃহে গৃহে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইত, উদ্গাতৃগণ সামগান করিতেন, ঋত্বিগগণ ঋক্ মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতেন ও অধ্বর্য্যুগণ বেদীর সম্মুখে উৎসৃষ্ট জীব বলি দিতেন তথাপি শিক্ষিতশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ এই সকল ব্যাপারের বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেন না। যাঁহারা ধর্ম্মযাজকগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন এরূপ অনেক সম্পৎশালী ব্যক্তিদিগের নিকটও বেদের কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা গৌণ বলিয়া পরিগণিত হইত এবং তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান মনীষিগণ উপনিষৎ বা জ্ঞানকাণ্ডের দিকেই আকৃষ্ট হইতেন। ভগবদ্ গীতায় যেরূপ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি অনাদর পরিলক্ষিত হইত উপনিষৎ সমূহেও কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি তাদৃশ অনাদর ও অমর্য্যাদার ভাব পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল এবং উপনিষদের ভাষায় ব্যক্ত হইল—"চতুর্ব্বেদ ও বেদাঙ্গগুলি অপকৃষ্ট পরন্তু যে বিজ্ঞানের সাহায্যে অক্ষর, অব্যয়কে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই প্রকৃষ্ট।"

বুদ্ধ একজন ক্ষত্রিয় রাজকুমার ছিলেন; তিনি যে তাৎকালিক দর্শন শাস্ত্রের তত্ত্বগুলি কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাহাতে সন্দেহ

নাই। কিন্তু তাঁহার ইহাই বিশেষ ছিল যে, যেখানে উপনিষদের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ঋষিগণ কেবল তাঁহাদিগের উচ্চশ্রেণীর শিষ্য মণ্ডলীর নিকটই উপনিষদের অভিনব ধর্ম্ম প্রচার করিতেন এবং ভগবদ্‌গীতার মত তাঁহারাও "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্" অর্থাৎ সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না—এইরূপ উপদেশ দিতেন। যেখানে তাঁহারা উপনিষদের নূতন ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা অজ্ঞ নিম্নস্তরের ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মবুদ্ধির ভেদ জন্মাইতে সাহসী হইতেন না সেখানে বুদ্ধ অসীম সাহসের সহিত কি উচ্চস্তরের কি নিম্নস্তরের সকল শ্রেণীর লোকের নিকটই তাঁহার ধর্ম্মের তথ্যগুলি নিঃসঙ্কোচে প্রচার করিতেন।

আলবারুণির সময়ে ভারতের অবস্থা যদ্রূপ ছিল, বুদ্ধের সময়েও প্রায় তদ্রূপই ছিল। তৎকালে অঙ্ক, জ্যোতিষ, চিকিৎসা দর্শন, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি হিন্দু-শাস্ত্রের সকল বিভাগেই মহার্ঘরত্নের সহিত অকিঞ্চিৎকর ভস্ম-রাশি ও উজ্জ্বলমণির সহিত তেজোহীন তুচ্ছ প্রস্তররাশি একত্র দেখিতে পাওয়া যাইত; এই ভস্মস্তূপ হইতে মুক্ত রত্নরাজি ও তুচ্ছ প্রস্তর স্তূপ হইতে বিচ্ছিন্ন মণি নিবহকে আদর করিয়া ভস্ম ও প্রস্তরস্তূপকে উপেক্ষা করিতে শিক্ষা দেওয়াই বুদ্ধের জীবনের ব্রত হইয়াছিল।

বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে ভারতে ভৈক্ষ্য বা সন্ন্যাসাশ্রমের প্রসার ছিল না। তখন ভারতে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রম প্রবর্ত্তিত ছিল; ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বা ছাত্রজীবন মনুষ্যকে সংসারে প্রবেশের উপযুক্ত করিয়া দিত, গার্হস্থ্যাশ্রম বা গৃহস্থজীবনে তাহাকে সংসারের কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতে হইত, বানপ্রস্থাশ্রম বা গ্রাম নগরের বাহিরে বনাশ্রিতের জীবনে তাহাকে বনে বাস করিয়া শাস্ত্রালোচনা ধ্যান ধারণা, মৌলিকগবেষণা, অধ্যাপনা প্রভৃতিতে দিন যাপন করিতে হইত। এবং সন্ন্যাসাশ্রম বা ভিক্ষু-জীবনে তাহাকে ভিক্ষোপযোগী ও গৃহশূন্য হইয়া ব্রহ্মচিন্তায় তৎপর থাকিতে হইত। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমের এরূপ ক্রম-সন্নিবেশ ছিল যে কোনও ব্যক্তিই এই ক্রম লঙ্ঘন করিতে পারিতেন না অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিয়া কেহ গার্হস্থ্যাশ্রমে যাইতে পারিতেন না, দ্বিতীয়াবস্থায় গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন না করিয়া কেহ বাণপ্রস্থা-শ্রমে যাইতে পারিতেন না এবং তৃতীয়াবস্থায় বাণ-প্রস্থাশ্রম লঙ্ঘন করিয়া কাহারও সন্ন্যাসাশ্রমে যাইবার ব্যবস্থা ছিল না। আমাদের মুনি ঋষি দিগের

সকলকেই তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রমে যাইবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্য ও দ্বিতীয়তঃ গার্হস্থ্য অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। চতুর্থাশ্রমাবলম্বী বা সন্ন্যাসী খুব কমই দেখা যাইত, প্রায়শঃ তৃতীয়াশ্রম বা বানপ্রস্থেই জীবনের শেষ হইতে দেখা যাইত; তাহার কারণ এই যে, মনুষ্য যতই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করুক না কেন, বয়ঃক্রমের একটি নির্দ্দিষ্ট স্তরে উপনীত হইয়া সংসারের সদসৎ বিচার করিবার প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ না করা পর্য্যন্ত তাহার জড়-জগতের বিষয়বাসনা ও ইন্দ্রিয়লালসার ঐকান্তিকনিবৃত্তি হইতে প্রায়শঃ দেখা যায় না।

বুদ্ধ এই চতুরাশ্রমের ক্রমবন্ধন—এই পুরাতন প্রচলিত প্রথা ভাঙ্গিতে সাহসী হইলেন এবং "ভিক্ষু" আখ্যা দিয়া এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন করিলেন। বুদ্ধ বয়ঃক্রমনির্ব্বিশেষে ও জ্ঞানের তারতম্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সকলকেই এই সম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকার দিলেন। এই সম্প্রদায়-গঠনে বুদ্ধের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল এবং জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট তাঁহার অভিনব ধর্ম্ম-প্রচার করার উদ্দেশ্য এই ভিক্ষুসম্প্রদায়-গঠন দ্বারা বহুলপরিমাণে সাধিত হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়-গঠন হইতেই ভারতে গৈরিকবাসধারী পুণ্যজনের প্রাচুর্য্য দেখা যাইতে লাগিল। এই পুণ্যজনগণ দ্বারে দ্বারে আপামর সাধারণের নিকট ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলেন এবং বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে যে সত্যের প্রচার কেবল মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেই সত্য সকলের নিকটই প্রচার করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ অনিচ্ছা-সত্বেও যে সন্ন্যাসিনীসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ঐ সন্ন্যাসিনীসম্প্রদায় দ্বারাও তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিলক্ষণ সাহায্য হইয়াছিল।

যতদিন বুদ্ধ জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার প্রতিষ্ঠানেরও শক্তি ছিল; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার গঠিত সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রিত করিবার যোগ্য কোনও শক্তিমান্ পরিচালক না থাকায় উক্ত প্রতিষ্ঠান ক্রমশঃ হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল এবং ভিক্ষুসম্প্রদায় নানাবিধ কলুষের আধার হইয়া পড়িল। যুবা ভিক্ষু ও যুবতী সন্ন্যাসিনীদিগের ইন্দ্রিয়-স্ফূর্ত্তি ও ভোগবাসনা তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল, সুতরাং তাঁহাদের সম্প্রদায় লোকতঃ ঘৃণ্য ও জঘন্য হইয়া পড়িল। এইজন্যই বলি, জননী, ভগিনী, জায়া, দুহিতা প্রভৃতি সমগ্র স্ত্রীজাতিকে নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ে ন্যায্য অধিকার-প্রদানের পক্ষপাতিত্ব আমার বিলক্ষণ আছে, কিন্তু কোনও স্ত্রী বা পুরুষ

একটী নির্দ্দিষ্ট বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যের প্রকৃতিগত ইন্দ্রিয়-লালসা অতিক্রম করিতে সমর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও আমি কোনও পবিত্র সম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকার দিবার পক্ষপাতী নহি। বুদ্ধের তিরোভাবের পর বৌদ্ধসম্প্রদায় কলুষিত হইলেও বুদ্ধের মহৎ উপদেশ সমুহ কোনও প্রকারে নষ্ট হয় নাই। এক্ষণে সেই উপদেশসমূহ যাহাতে আমাদের উপকার সাধনা করিতে পারে তদ্বিষয়ে আমাদের কিরূপ চেষ্টা করা আবশ্যক তাহাই বিবেচনার বিষয়।

একটী নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা বুদ্ধের আদৌ ছিল না, এবং যাহা বৌদ্ধধর্ম্ম-নামে প্রচারিত হইয়াছিল তাহাও বুদ্ধের স্বকপোলকল্পিত নহে। তিনি সনাতন-ধর্ম্ম বা নিত্য ধর্ম্মই প্রচার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপদেশ উপনিষদের নিদেশাবলীর কোনও প্রকারেই পরিপন্থী ছিল না। জীবহিংসাদি যে সকল কুপ্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় আর্য্যধর্ম্ম কলঙ্কিত হইয়াছিল, ঐ সকল কুপ্রথার দিকে তিনি সর্ব্বদা ভ্রুকুটী করিতেন। ঐ সকল কুপ্রথার মধ্যে পশুঘাত বা জীবহিংসার নিন্দাচ্ছলেই লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বঙ্গের বিজয়ী কবি জয়দেব প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥

যে সকল ভাবের অনুপ্রাণনায় বুদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে প্রণোদিত হইয়াছিলেন, তাহা এস্থলে কিয়দংশে বিবৃত করিতেছি। জাতিভ্রষ্ট বা পতিতের স্বরূপজিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বুদ্ধ বলিয়াছিলেন,—

"(১) যাহারা ভণ্ড ও প্রবঞ্চক তাহারা পতিত।

(২) জীবের প্রতি দয়া যাহাদের নাই তাহারা পতিত।

(৩) যাহারা গ্রাম ও নগর অবরোধ করে বা তাহার ধ্বংস-সাধন করে তাহারা পতিত;

(৪) তস্কর, বঞ্চনাশীল, অধর্ম্মপরায়ণ, মিথ্যাবাদী, পরদারোপসেবী, লম্পট—ইহারা পতিত,

(৫) যাহারা পিতামাতার ভরণ পোষণ করে না তাহারা পতিত।

(৬) কপট শিক্ষক, শঠ উপদেষ্টা, অনৃতপ্রচারক, অকৃতজ্ঞ—এবম্বিধ ব্যক্তিরাও পতিত।"

বুদ্ধ বলিতেন,—পাতিত্য বা ব্রাহ্মণত্ব কাহারও জন্মগত হইতে পারে না; কর্ম্মদ্বারাই লোকের ব্রাহ্মণত্ব-লাভ হয়, কর্ম্ম দ্বারাই তাহার পাতিত্য ঘটে। মতঙ্গ মুনির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বুদ্ধ বলিতেন—"মতঙ্গ-নামে প্রসিদ্ধ শ্বপাকজাতীয় একজন চণ্ডাল ছিলেন, তিনি সুমহৎ যশঃ লাভ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ সকলেই তাহার সেবা করিতেন।'

উরগবগ্‌গের বালসুত্তে লিখিত আছে—'কোন ব্যক্তি পতিতকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই যে সে পতিত হইবে অথবা ব্রহ্মকুলে জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়াই যে সে ব্রাহ্মণ হইবে তাহা নহে। যে পাতিত্যজনক কার্য্য করিবে সে-ই পতিত হইবে এবং যে ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করিবে সে-ই ব্রাহ্মণ হইবে।"

বুদ্ধ যে জীব-হত্যার তীব্র নিন্দা করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি অন্তঃকরণের নীচত্ব ও কুক্রিয়াসক্তিকে মৎস্যাশন অপেক্ষাও অধিকতর দূষণীয় মনে করিতেন। 'আমগন্ধ সূত্তে' উল্লিখিত আছে—"জীবনাশ, হত্যা, ছেদন, বন্ধন, চৌর্য্য, অনৃতভাষণ, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, কুৎসিত বিষয়ের অধ্যয়ন, পরস্ত্রীগমন – এইগুলিই 'আমগন্ধ', মাংসাশন "আমগন্ধ নহে।" অসংযততা, মত্ততা, প্রবঞ্চনা, হিংসা, কুৎসা, মিথ্যা আচরণ, মুদ্রা-জাল করা প্রভৃতিই আমগন্ধ, মাংসাশন আমগন্ধ নহে।

ব্রাহ্মণধম্মিক সূত্রে বুদ্ধ প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন ঋষিগণ, পালিভাষায় যাঁহাদিগকে 'ইষায়ো' এবং সংস্কৃতভাষায় যাঁহাদিগকে 'ঋষয়ঃ' বলা হইত তাঁহারা সংযতেন্দ্রিয় ও প্রায়শ্চিত্তপরায়ণ ছিলেন। সমগ্র দেশের অধিবাসীরাই তাঁহাদিগের পূজা করিত ও তাঁহাদিগের অভাব মোচন করিত। ঐ ঋষিগণ অপ্রতিহতগতি ছিলেন এবং কাহারও দ্বারে দণ্ডায়মান হইলে কেহ তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিতে পারিত না। তাঁহারা সাধুতা, পুণ্য, ন্যায়, কোমলতা, তপস্যা, মৃদুতা, দয়া ও সহিষ্ণুতার অনুশীলন করিতেন। তাঁহারা তণ্ডুল, ঘৃত, তৈল ও বস্ত্রাদি আহরণ করিয়া তদ্দারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন; তাঁহারা গোহত্যা করিতেন না। তাঁহা-দিগের মতে, মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য বান্ধবের ন্যায় গো সকল আমাদের পরম বন্ধু, তাহাদিগের দ্বারা আমাদের ভেষজ প্রস্তুত হয় ও তাহারা আমাদিগকে আহার্য্য, শক্তি, সুরূপ ও সুখ প্রদান করে। রাজন্য-বর্গের সমৃদ্ধি ও স্ত্রীভূষণ দর্শনে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত

হইল; তাঁহারা ইক্ষ্বাকুর নিকট উপনীত হইয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ধন সম্পৎ ব্রাহ্মণদিগকে উৎসর্গ করিয়া দিবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন; তখন রাজা অশ্বমেধ, রাজপেয় ও অন্যান্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন এবং গোবধ করিবার আদেশ দিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিলে সকলেরই সম্যক্ প্রতীতি হইবে যে বুদ্ধ তাঁহার শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে সততই অতীতের উচ্চ আদর্শ উপস্থাপিত করিতেন এবং সকলকে সৎকার্য্যে নিরত থাকিতে, কুকর্ম্ম হইতে বিরত হইতে, পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে ও ইতরপ্রাণীদিগের প্রতিও দয়াপরবশ ও অনুকম্পাপরায়ণ হইতে প্রণোদিত করিতেন।

সর্ব্ব পাপস্স অকরণম্
কুসলস্স উপসম্পদা,
স চিত্ত পরিয়োদপনম্
এতং বুধ্ধানুসাসনম্ ॥

অস্যার্থঃ—সর্ব্বপ্রকার পাপকর্ম্ম হইতে বিরত থাকা, সর্ব্বপ্রকার পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা ও শুদ্ধভাবের ভাবনা করা ইহার বুদ্ধের অনুশাসন।

(ক্রমশঃ)

ভক্তি-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

ত্রয়োবিংশতি গুরু প্রজাপতি। প্রজাপতি বিবিধবর্ণে চিত্রিত পক্ষপুটের সাহায্যে লোকালয়ে ভ্রমণ করতঃ মানবের মনোরঞ্জন করে। মানবও সেইরূপ নিজ গুণ দ্বারা সবার প্রীতি সাধন করিবে। চতুর্বিংশতি গুরু পতঙ্গ। সে পুষ্পরসপানাশায় কমলিনী-মধ্যে প্রবেশ করে, এবং তন্ময়াসক্ত হইয়া তাহাতেই

অবস্থিতি করে ও সন্ধ্যায় পদ্মিনী-দলপুটে বদ্ধ থাকে এবং পরে মাতঙ্গাদি কর্ত্তৃক সেই পদ্মিনী ভক্ষিত হইলে যেমন জীবন হারায়, সেইরূপ মানব, অজ্ঞতা-নিবন্ধন বিষয়রসে অত্যন্ত আসক্ত থাকিয়া মহাপ্রভাবশালী কালকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ প্রভৃতি এক একটী ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া জীবন হারায়; অসাবধান মনুষ্য, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা সেই রূপ রসাদি নিয়ত ভোগ করিতে থাকিলে সে বিনষ্ট হইবেনা কেন? মনুষ্যের যে যে বস্তু প্রিয়তম, তাহাই আবার অত্যন্ত দুঃখের হেতু; স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, ধন প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। যিনি ইহা জানিতে পারেন, তিনিই সুখী হইতে পারেন। মনঃপীড়াই যাহার শেষ ফল, উৎপত্তি-বিনাশ যাহার ধর্ম্ম, সেই শরীর দ্বারাই আবার তত্ত্বানুসন্ধান হইয়া থাকে। তথাপি শরীর পরকীয় মনে করিয়া বিচরণ করিবে। যেমন অনেক সপত্নী গৃহস্বামীকে শীর্ণ করিয়া ফেলে, সেইরূপ পুরুষকে জিহ্বা, ত্বক্, শ্রোত্র, নাসিকা চক্ষু, শিশ্ন, বিভিন্নদিকে আকর্ষণকরে। ভগবান্ পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া সেই সব শরীরে সন্তুষ্ট না হইয়া ব্রহ্মদর্শনের উপযোগী মনুষ্যদেহ সৃষ্টি করিলেন। বহুজন্মের পর এই মনুষ্যজন্ম, ইহা সুদুর্লভ। যদিও ইহা অনিত্য, তথাপি, দেহ-ধ্বংস হইতে না হইতে শ্রেয়োলাভের জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। স্বপ্নাবস্থায় বিষয়-দর্শনকারীর বা চিন্তাকারীর মনোরথ নানাত্ব বিধায় যেমন অর্থশূন্য, সেইরূপ বিষয় সকলে ইন্দ্রিয়জনিত সম্বন্ধ-বশতঃ আত্মবুদ্ধিও অর্থশূন্য। অতএব কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবৎ-পরায়ণই হইবে। ভগবৎপরায়ণ গুরুর আরাধনা করিবে, অসূয়া করিবেনা। আলস্য পরিত্যাগ করিবে। বধ্যস্থানে নীয়মান বধ্যের ন্যায় যখন অপ্রিয় মৃত্যু প্রত্যেকের নিকট অবস্থান করিতেছে, তখন কোন্ পুরুষার্থ পুরুষকে সুখী করিতে পারে? দৃষ্ট ইহলোকের ন্যায় স্বর্গও বিঘ্নবহুল এবং বিনশ্বর। কর্ম্মের ফল মাত্রেই পর্য্যন্তপরিতাপী। কেবল ভগবদুদ্দেশক কর্ম্মই বন্ধ-চ্ছেদের কারণ। পণ্ডিতগণরূপ অনুধ্যান অসি দ্বারা কর্ম্মবন্ধন ছেদন করেন। ভগবৎকৃপা ব্যতীত জীবের ভবসিন্ধুপারের অন্য গতি নাই। ভক্ত ব্যতীত অভক্তের প্রতি তাঁহার কৃপা বর্ষিত হয় না। ভক্ত তাঁহার প্রাণ, তিনিও ভক্তের প্রাণতুল্য। তাঁহার কৃপা হইলে আর কিছুই অপ্রাপ্য থাকেনা। তিনি তদ্গতপ্রাণ ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন। ভক্তের ভাবনা তাঁহারই, ভক্তের আর কিছু ভাবিবার নাই। সকল আশ্রমেরই সারতত্ত্ব চিত্ত-শুদ্ধি এবং তজ্জন্য ভগবানে রতি। ইহা না হইলে, সমস্তই নিষ্প্রয়োজন।

যিনি সকল প্রাণীর প্রতি কৃপালু, অহিংস্রক, ক্ষমাবান্, সত্যনিষ্ঠ, নির্দ্দোষ, সমদর্শী; সর্ব্বোপকারী, কামনা-বিজয়ী, জিতেন্দ্রিয়, কোমলচিত্ত, সদাচার, সঙ্গ-হীন, নিরীহ, মিতভোজী, জিতচিত্ত, স্বধর্ম্মনিরত, হরিপরায়ণ, চিন্তাশীল, নির্ব্বিকার, ধীর, ষড়্‌গুণবিজয়ী, অমানী, মানদ, যুক্তি-পরায়ণ, অপ্রতারক, কারুণিক তিনি সাধু-শ্রেষ্ঠ। যিনি গুণ দোষ জ্ঞাত হইয়া বেদাদিষ্ট কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবানেরই আরাধনা করেন তিনি ভক্ত-শ্রেষ্ঠ। আর ভগবান্ যাহা যেমন যেরূপ—ইহা পুনঃ পুনঃ জানিয়া একান্তমনে যিনি ভগবানের সেবা করেন তিনি ভক্ত-শ্রেষ্ঠ। ভগবানের প্রতিমাদি-দর্শন, ভগবদ্‌ভক্তের দর্শন, স্পর্শন, অর্চ্চন, পরিচর্য্যা, স্তুতি ও মনোহর গুণকীর্ত্তন ভগবৎ-কথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা, ভগবানে সমস্ত লব্ধ বস্তু সমর্পণ, দাস্যভাবে আত্ম-নিবেদন, ভগবজ্জন্ম-কর্ম্ম-কীর্ত্তন, তদীয় পর্ব্বাদির অনুমোদন, গীত বাদিত্র, গৃহে উৎসব, মন্দিরাদি-সংমার্জ্জন, অভিমানত্যাগ, আচরিত ধর্ম্মকর্ম্মের কীর্ত্তন না করা—এই সকল ভক্তির লক্ষণ। সূর্য্য, গাভী বিপ্র, অগ্নি, বৈষ্ণব, হৃদয়, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা ও সমুদয় প্রাণী আমার পূজার আধার। বেদবিদ্যা দ্বারা সূর্য্যে, ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে, আতিথ্য দ্বারা ব্রাহ্মণে, তৃণাদি দ্বারা গো-সমূহে, মিত্রের ন্যায় সম্মাননা দ্বারা বৈষ্ণবে, ধ্যান দ্বারা হৃদয়াকাশে, প্রাণ-দৃষ্টি দ্বারা বায়ুতে, জল দ্বারা জলে, গোপনীয় মন্ত্র দ্বারা পৃথিবীতে ভগ-বানের আরাধনা করিবে। নানাবিধ ভোগদ্বারা আত্মাতে আত্মরূপী ভগ-বানের পূজা করিবে। সৎসঙ্গ জন্য ভক্তিযোগ ব্যতীত সংসার-তরণের আর অন্য উপায় নাই। ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা। এ জগতে ক্ষণকাল সজ্জন-সঙ্গও ভবার্ণব-পারের নৌকা-স্বরূপ হয়। দস্যু রত্নাকর ইহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্পর্শমণির সংস্পর্শে লোহা সোণা হইয়া যায়। সাধুসঙ্গ কখনও বিফল হয় না। তবে প্রকৃত সাধুব্যক্তি চিনিয়া লওয়া সুকঠিন। বিষয়াসক্ত পামরেরা উন্মত্ত-বোধে সাধুদিগকে উপেক্ষা করে।

সর্ব্ব-সঙ্গনির্বর্ত্তক এক সাধুসঙ্গ যেমন ভগবান্‌কে বশীভূত করে, যোগ, ধ্যান, তপস্যা, দান কোন কর্ম্মই তেমন ভগবান্‌কে বশীভূত করেনা। দৈত্য, রাক্ষস, পক্ষী, মৃগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর এবং বিশেষ বিশেষ যুগে মনুষ্য-লোকের মধ্যে রজস্তমঃপ্রকৃতি বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী ও অন্ত্যজগণ; বৃত্র ও প্রহ্লাদাদি এবং বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ,

সুগ্রীব, হনুমান্ জাম্ববান, গজ, গৃধ্র, জটায়ু, তুলাধার, ব্যাধ, কুব্জা, ব্রজ-গোপিকাগণ ও যজ্ঞপত্নীসকল অনেকেই সৎসঙ্গ-হেতু ভগবৎস্থান লাভ করিয়াছে। তাহারা শ্রুতি পাঠ করে নাই, মহত্তম ব্যক্তিদের উপাসনাও করে নাই, ব্রতাচরণ করে নাই, তপস্যাও করে নাই। কেবল সৎসঙ্গ বশতঃ ভগবৎসঙ্গ লাভ করিয়াছে। গোপীগণ, যমলার্জ্জুনাদি নগগণ, মৃগগণ, কালীয়াদি নাগগণ, এবং অন্যান্য মূঢ়বুদ্ধিগণ কেবল প্রীতি দ্বারাই কৃতার্থ হইয়া স্বচ্ছন্দে অনায়াসে ভগবান্‌কে পাইয়াছে। যত্ন থাকিলেও যোগ, যাগ, ব্রত, তপস্যা, দান, বেদাধ্যয়নাদি দ্বারা ভগবান্‌কে পাইতে পারে না। অক্রূর বলরামের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গেলে দৃঢ়তর প্রেমবশে ভগবানে দৃঢ়তর অনুরক্তহৃদয় গোপীগণ, তীব্র মনোব্যথায় অন্য কিছুই সুখের কারণ বলিয়া মনে করেন নাই। জগতে ভগবান্ অপেক্ষা প্রিয়তম কিছুই হইতে পারেনা। বিশেষতঃ যে আনন্দসিন্ধুর আস্বাদ পায়, সে অন্য কোন বস্তু তদপেক্ষা সুখকর মনে করেনা। সুতরাং কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীগণের অন্য বস্তু প্রীতিকর বোধ হইবে কেন? যিনি জীবনাধিক প্রিয় তাঁহার বিরহ কে সহ্য করিতে পারে? নিখিলভুবনজীবন যে ভগবান্, তাঁহার সহিত প্রেম করা বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফল। তাহাই যাহারা দূষ্য মনে করেন, তাঁহারা কিরূপ ভ্রান্ত তাহাই ভাবিয়া দেখুন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণ যে সকল রাত্রি নিমেষার্দ্ধবৎ বোধ করিয়াছিলেন, ভগবদ্‌বিরহে সেই সকল রাত্রি তাহাদের পক্ষে কল্পসদৃশ বোধ হইয়াছিল। তাঁহাদের মন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকায় নিজ দেহাদির প্রতিও তাঁহাদের জ্ঞান ছিল না। যদিও তাঁহারা ভগবৎস্বরূপ জ্ঞাত ছিলেননা, তথাপি জার-বুদ্ধিতে ভগবৎসঙ্গ হেতু পরব্রহ্মেই লীন হইয়াছিলেন। যে, যে ভাবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হউক না কেন, তাহাতেই তাহার কামনা পূর্ণ হইবে। ভগবদ্দর্শন ও ভক্তদর্শন কখনও নিষ্ফল হয় না। যাহারা ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করে, তাহারা যে সুখ প্রাপ্ত হয়, বিষয়াসক্তচিত্ত ব্যক্তিরা সে সুখ কোথায় পাইবে? যিনি শান্ত দান্ত, সমদর্শী, সন্তুষ্টচিত্ত, তাঁহার সব দিক্ সুখময়। যিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মপদও তুচ্ছ বোধ করেন। নিষ্কিঞ্চন, ভগবানে অনুরক্তচিত্ত, শান্ত, নিরভিমান, নিখিল-জন-বৎসল, অকামস্পৃষ্টচিত্ত ভগবদ্ভক্তেরা যে সুখ অনুভব করেন, তাহা তাঁহারাই জানেন, অন্যে তাহা জানিতে অক্ষম। কারণ, যাঁহারা কিছুরই

অপেক্ষা করেন না, তাঁহারাই উহা প্রাপ্ত হন। ভগবানের অজিতেন্দ্রিয় ভক্ত বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াও ক্ষমতাশালী ভক্তি-প্রভাবে বিষয় সমূহে অভিভূত হন না। যেমন অত্যন্ত সমৃদ্ধশিখ অগ্নি কাষ্ঠ সমূহকে দগ্ধ করে, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তি সমস্ত পাপ নষ্ট করে। ভগবান্‌কে পাইবার উপায় ভক্তির মত আর কিছুই নাই। সাধুগণ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভক্তি দ্বারা আত্মার ঈশ্বর ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভগবদ্‌ভক্তি মনুষ্যের জাতিদোষও নষ্ট করে। ভক্তি ব্যতীত কিছুতেই চিত্ত শুদ্ধ হয় না। যিনি ভগবানের নামে উন্মত্ত হইয়া, নৃত্য, গীত, ক্রন্দন, উচ্চৈঃস্বরে নাম-গান করেন, তাঁহার স্পর্শে পৃথিবী পবিত্র হয়। যেমন স্বর্ণ অগ্নিসংযোগে মল ত্যাগ করিয়া নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, আত্মা, ভগবদ্ ভক্তিযোগে প্রাকৃতগুণমুক্ত হইয়া স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। যেমন অঞ্জন চক্ষুতে দিলে সূক্ষ্মবস্তুদর্শন হয়, সেইরূপ, ভগবদ্‌গুণ-কীর্ত্তন ও শ্রবণ দ্বারা সূক্ষ্মবস্তুদর্শ লাভ হয়। বিষয়-চিন্তায় মন বিষয়েই আসক্ত হয়, আর ভগবচ্চিন্তায় ভগবানেই মন আসক্ত হয়। ধীর ব্যক্তি-গণ, স্ত্রীগণের এবং স্ত্রীসঙ্গিব্যক্তিগণের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে উপবেশন করিয়া একান্তমনে ভগবচ্চিন্তা করিবেন। রমণীসঙ্গ হইতে যত ক্লেশ উৎপন্ন হয়, অন্য সঙ্গ হইতে সেরূপ ক্লেশ উৎপন্ন হয় না। রজোগুণোৎপন্ন কাম চিত্তবৃত্তিকে অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত করে, সুতরাং চিত্ত অভিনিবিষ্ট হয় না। যে চিত্ত দিয়া ভগবদারাধনা হইবে, তাহা ক্ষিপ্ত বানরের ন্যায় হইলে, তাহা দ্বারা লক্ষ্য বস্তু ধরা যায় না। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ অবৈধ বিষয়-ভোগ নিষেধ করিয়াছেন। তবে, ভোগ ব্যতীত বাসনার নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং আত্মবশ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগান্তে নিবৃত্ত হইবে। বিষয়-ভোগ-স্পৃহা জীবের স্বাভাবিক। তাহা নিবারণ করা যায় না। তবে, উচ্ছৃঙ্খলভাবে পশুবৎ আহার-বিহারই অধঃপতনের কারণ। সুখ, দুঃখ, পশুত্ব, দেবত্ব, সমস্তই জ্ঞান ও অজ্ঞানমূলক। প্রাণিগণ নিজেই নিজ ভাগ্য গঠন করে, তজ্জন্য ঈশ্বর দায়ী নহেন। মানব শতায়ু হইলেও সারাজীবন বিষয়-ভোগে রত থাকিয়া অপরোক্ষজ্ঞানে বঞ্চিত থাকে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-জনিত-সুখাতিরিক্ত সুখ থাকিতে পারে—ইহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারে না। শাস্ত্র বা সাধুকথিত নিঃশ্রেয়সকর পথের কথা তাহারা উন্মত্তের বাক্য বলিয়া মনে করে। তাহাদের বক্তব্য এই যে, সর্ব্বশক্তিমান্ দয়াময় ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে, এ জগৎ দুঃখময় কেন? জগতে এত বৈষম্য কেন? এই প্রশ্নের মীমাংসা

করিতে হইলে, জীবের অদৃষ্ট অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। বিভু ফলদাতা নহেন, নিয়ন্তা মাত্র। তাহা না মানিলে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব-দোষ এবং যথেচ্ছাচারিত্ব-দোষ দুষ্পরিহার্য্য হইয়া উঠে। অদৃষ্ট মানিতে হইলে, তাহার আশ্রয়রূপে নিত্য অবিনাশী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যাঁহারা অদৃষ্ট মানেন না, তাঁহারা বলেন, শরীর ধারণ করিলেই সুখ ও দুঃখ হইবেই, উহা প্রাকৃতিক নিয়ম। তাঁহারা কারণ-নির্দ্দেশে অসমর্থ। তাঁহারা এটুকু বুঝেন না যে, প্রকৃতি ভগবানেরই শক্তি। প্রাকৃতিক নিয়মও যাহা, ভগবৎকৃত বিধানও তাহাই; নাম-ভেদ মাত্র। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভগবানেরই বিচিত্র বিকাশ স্বরূপ। সেই লীলাময় কখনও এই বিশ্ব ভাঙ্গেন, কখনও সৃজন করেন। কেন করেন? এ কেন-র উত্তর কেহই দিতে পারে না। এইরূপই বরাবর চলিতেছে ও চলিবে।

(ক্রমশঃ)

দান্তে।

(প্রবন্ধ)

লেখক—শ্রীমতিলাল দাশ এম্, এ, বি, এল্।

বাংলা-সাহিত্যে আজ বিশ্ব-সাহিত্যের ভাবপ্লাবনের তরঙ্গধারার শেষ আঘাত লাগিয়াছে। বিশ্বের এই ভাবপ্লাবনকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ কূপমণ্ডুকতা ত্যাগ না করিলে কোন সাহিত্যই সত্যভাবে প্রস্ফুট হইয়া ওঠে না। যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য রক্ষার্থ বিদেশী হাওয়ার স্পর্শদোষ বাঁচাইয়া চলিতে চাহেন, তাঁহারা জানেন না যে সাহিত্যের সারবস্তু চিরন্তন। জগতের ভাবধারার গতায়াতের মধ্যেই, বিভিন্ন সত্যের ও তথ্যের সংঘর্ষেই সাহিত্য-কুসুম আলোকে পুলকে প্রকাশিত হইয়া ওঠে। ইতিহাসও ঠিক্ এইকথা বলিতেছে। ইংরাজী সাহিত্যের রোমান্টিকযুগ তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত

গরিমময় বিজয়শ্রীর উপকরণ ফরাসী বিপ্লব ও জার্ম্মাণদর্শন হইতে লইয়া আপনার লাবণ্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্য আজ পুস্তক সম্পদে এত সমৃদ্ধ, তাহার কারণ সে পৃথিবীকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করিবার আগ্রহে বাহির হইয়াছে। "বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি" তাহার কাম্য নয়, সে মানুষের মাঝে বাঁচিতে চাহে। তাই পৃথিবীর যেখানে যে রত্নকণা খনির নিবিড় তিমিরগর্ভে গুপ্ত থাকুক, অদম্য উৎসাহে সে তাহা আপনার ধনভাণ্ডারে সং-গ্রহ করিয়া আনিবে। বাংলা সাহিত্যও যদি গরীয়ান্ ও মহীয়ান্ হইতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকেও বিশ্ব-সাহিত্যের মণি-দীপমালা আনিয়া গৃহ সাজাইতে হইবে। আজ আমরা এমন একজন কবির কাব্য ও জীবন আলোচনা করিব যাহার মধ্যদিয়া য়ুরোপীয় ইতিহাসের মধ্যযুগ মূর্ত্ত হইয়া আমাদের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে।

য়ুরোপীয় ইতিহাসে পাশ্চাত্য-সভ্যতার ক্রম বিকাশকে তিনটী যুগে বিভক্ত করা হইয়াছে:—তিমির-যুগ, মধ্য-যুগ ও বর্ত্তমান যুগ। খৃষ্টীয় পঞ্চম হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তিমিরযুগ, একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মধ্যযুগ, পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বর্ত্তমানযুগ চলিতেছে। এই মধ্যযুগের আধ-আলো আধ-ছয়াভরা রহস্য যবনিকার তলে প্রাণশক্তির যে সজীব নাট্যলীলা চলিয়াছিল, দান্তের কাব্যরাজীর মধ্য দিয়া অজও তাহার স্পন্দন আমরা অনুভব করিতে পারি। মধ্যযুগের ধর্ম্মপ্রাণতা, রাষ্ট্র ও নীতি, ভাব ও কল্পনা, আশা ও উল্লাস, কর্ম্ম ও কীর্ত্তি, ছায়াচিত্রের মত আমাদের চক্ষের সম্মুখে আনিয়া, দান্তে অদৃশ্য যাদুকরের মত অলৌকিক কুহকে আমাদের চিত্তকে স্তম্ভিত করিয়া দেন। ইতালীর চিরসংঘর্ষশীল বিভিন্ন রাষ্ট্রধারাকে এক মহাসাম্রাজ্যের ছত্রছায়ার তলে সমবেত করিবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন বলিয়াই, ক্ষীণতেজ পোপের ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা, লোভ ও দুরাকাঙ্ক্ষাকে নিবারণ করিয়া শক্তিমান ধর্ম্মরাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়াই, দান্তে যে আজ আমাদের নিকট অমর, তাহা নহে, তিনি মানুষের জন্য ভাবিয়াছিলেন, মানুষের জন্য কাঁদিয়াছিলেন, মানুষকে সৎপথে আনিবার জন্য চিন্তা করিয়াছিলেন—এই মানবপ্রীতিই তাঁহাকে বিশ্ব কবির আসনে বসাইয়াছে। শেলী, যে সব কবির কাব্যে তাহাদের যুগের সমস্ত ক্রিয়া চিন্তা, সমস্ত কল্পনা প্রতিফলিত হইয়াছে ও ভবিষ্যত যুগকেও অনুরঞ্জিত করিয়াছে তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া হোমরকে প্রথম ও দান্তেকে দ্বিতীয়স্থান দিয়াছেন; কিন্তু মধ্যযুগের বিশদ চিত্রকর বলিয়া তাঁহার স্থান অদ্বিতীয়

হইলেও তাহার কাব্য দান্তের নিজের সুখ দুঃখ ভয় ভাবনাকে কাব্যের চিরন্তন লোকে অমরকল্পনা-বলে, শাশ্বতস্থান দিয়াছে। সেই সাহিত্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট যাহার মধ্য-দিয়া কবির অনুভূতিগুলি হৃদয়ের রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া ওঠে। দান্তের কাব্যে দান্তের নিজের ছবি যন্ত্র-ধৃত প্রতিকৃতির মত আপন স্বরূপ অবিকল প্রকাশ করিয়াছে।

দান্তের বাণী হা কেবল তার যুগের জন্য নহে, তাহা চিরকালের। কবি যখন আপন দেশকে, আপন ভাবকে সম্পূর্ণতায় ফুটাইয়া তুলেন, তখনই তাহা দেশকালের অতীত হইয়া বিশ্বের হইয়া ওঠে। সমসাময়িক জনপ্রাণে তাহা হয়ত সাময়িক ক্ষুদ্রতায় ঢাকা পড়ে, কিন্তু সময়ে তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আপনি মানুষকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। 'বোকাচিও'র নিকট দান্তের মহাকাব্য অসূয়াপ্রণোদিত ব্যঙ্গকাব্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মৃত্যুর সাতশত বৎসর পরেও দান্তের কাব্য নব অর্থ-গৌরবে, নব বসন্তশ্রী লইয়া আমাদের যাত্রাপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শাশ্বত-কাব্যের স্বরূপই এই— সে যুগে যুগে আপনাকে যুগাত্মার সহিত মিশাইয়া লয়। তরু যেমন প্রতিবৎসর বসন্তে নব-কিশলয়ে মণ্ডিত হইয়া ওঠে, জীবন্তকাব্যও তেমনি মানুষের চলন্ত জীবনের আনন্দে ও হাস্যে আপনাকে জাগাইয়া তুলে। বর্ত্তমান জগতের অভাব ও দারিদ্র্যের পেষণ হইতে যদি মুক্তিলাভ করিয়া শান্তিরসাস্পদ ধীর জীবনের মাঝে ফিরিতে চাহি, তাহা হইলে দান্তের কাব্যরাশি সে বিষয়ে আমাদিগকে সহায়তা করিবে।

ভারতবর্ষ যখন মুসলমান্‌শাসনে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, হিন্দু-সভ্যতার ও হিন্দু গৌরবের শেষ রশ্মিরাজী বিদায়ের দুঃখে মলিন হইয়া উঠিয়াছে, তখন খৃষ্টীয় ১২৬৫ সালে ইতালীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় পুষ্পসমৃদ্ধ ফ্লোরেন্স-নগর দান্তের জন্মে ধন্য হয়। বাংলা-সাহিত্য তখন সবে মাত্র আবির্ভাবের স্বপ্ন-বিভোর। ইতালীয় সাহিত্যও সদ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দান্তের জীবন উপন্যাসের ন্যায় রোমাঞ্চকর। নয় বৎসর বয়সেই লাবণ্যললামভূতা বিয়াত্রিচের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সেই অল্পবয়সেই মকরকেতন তাহার হৃদয়তন্ত্রী নবীন ঝঙ্কারে বাজাইয়া তুলিল। ইহার নয় বৎসর পরে দান্তে বিয়াত্রিচের নামে যে সব কবিতা লেখেন তাহা ব্যাখ্যা ও টীকার সহিত গ্রথিত করিয়া নব-জীবন বা ভিটা নুওভা নামক প্রেমের কাব্য-রচনা করেন। এই অশরীরি প্রেমের সুখস্পর্শে তাহার প্রথম জীবন ধন্য হইয়া উঠিল। বিয়াত্রিচের জীবনে

ও তাহার প্রতি দান্তের প্রণয়-কথা নানারহস্যে জড়িত। কেহ কেহ বিয়াত্রিচের অস্তিত্বই অস্বীকার করেন, কিন্তু ভিটা নুওভা ও ডিভিনিয়া কমেডিয়া নামক কাব্যদ্বয়ে বিয়াত্রিচের বর্ণনায় যে ভাবোচ্ছাস, প্রণয়াবেগ ও ব্যক্তিত্ব ফুটিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, বিয়াত্রিচ শুধু ছায়াময়ী ছিলনা, কায়ময়ীই ছিল। মধ্যযুগের মানুষ, বর্ত্তমান মানুষের চেয়ে কল্পনা, রূপক, উপমা বেশী ভালবাসিত। বিজ্ঞানের মাপকাঠি দিয়া তাহারা কাব্য-মাধুর্য্যের পরখ করিত না। তাই পুরাণ, গল্প, অবাস্তব বর্ণনা, উৎপ্রেক্ষা তাহাদের কাছে আনন্দপ্রদ বলিয়াই মনে হইত। দান্তে সর্ব্বত্র কল্পনা ও বাস্তব এক সাথে জড়াইয়া যে মায়া-মন্দির গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার সত্য ও কল্পনার অনুপাত একরূপ অসম্ভব, কিন্তু সত্য যে আছে তাহার সন্দেহ নাই। বিয়াত্রিচ অপরের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া ১২৯০ খৃষ্টাব্দে ২৪ বৎসর বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিয়াত্রিচের মরণের পর, দান্তে কিছুদিন যৌবনের প্রলোভনে পড়িয়া কিছুকাল উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেন বলিয়া মনে হয়। ডিভিনিয়া কমেডিয়ার প্রথম সর্গে যে ঘন অরণ্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই পতনের পরিচায়ক।

এই সময়েই তাঁহার রাজনীতির সহিত সংস্রব আরম্ভ হয়। ফ্লোরেন্সনগরে তখন গণতন্ত্রশাসনপ্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু গৃহবিবাদে রাষ্ট্রনীতি নিত্য নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। গণতন্ত্রপ্রথায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রধানতঃ বণিগ্‌দিগের হস্তে ছিল, এইজন্য অভিজাতবর্গের সহিত বণিক্‌সম্প্রদায়ের প্রায়ই কলহ হইত। ইহার সহিত পারিবারিক বিরোধের সম্মিলনে নাগরিক-জীবন আরও অশান্তিময় হইয়া ওঠিত। এই পারিবারিক বিরোধ দুইদলে বিভক্ত হয়। দান্তে যে পক্ষ সমর্থন করেন, সে পক্ষ হারিয়া যায়। ফরাসী রাজ চার্লস ও পোপের দূত তাঁহার বিপক্ষগণের সহায়তা করেন বলিয়াই দান্তে তাঁহাদিগের উপর সুতীব্র বিদ্রূপকষাঘাত করিয়াছেন। ১৩০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার উপর নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রয়োগ করা হয়। নির্ব্বাসনের পর তিনি নগর হইতে নগরে, পল্লী হইতে পল্লীতে লক্ষ্যহীন পর্য্যাটকের বেশে ইতালীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন। কিছুকাল পরে তিনি ভেরোনায় গমন করেন। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে লুপ্ত-গৌরব বিরাট্ রোমসাম্রাজ্যের সম্রাট্ মর্য্যাদাধিকারী লাক্সেমবার্গের দ্বিতীয় হেনরী ইটালীতে অভিষিক্ত হইবার জন্য আগমন করেন। তখন দান্তে প্রনষ্ট সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের আশায় মাতিয়া ওঠেন। তিনি সম্রাট্‌কে তাঁহার পদমর্য্যাদার যোগ্য কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিয়া একটী চিঠী লেখেন। ঐ চিঠীতে তিনি

সম্রাট্‌কে তাঁহার জন্মভূমি ফ্লোরেন্স নগর আক্রমণ করিতে বলেন। কিন্তু তাহা সফল হয় না। ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সরাষ্ট্র তাঁহাকে কয়েকটী অপমানজনক সর্ত্তে ক্ষমা করিতে চায়, কিন্তু আত্ম-মর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন দান্তে সেই অবমাননার বিনিময়ে জন্মভূমির প্রিয়তম আকর্ষণ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হননা।

দান্তের শেষ জীবন ভেরোনায় অতিবাহিত হয়। এই ভেরোনার অধিপতি ক্যান গ্রাণ্ডি ডেলাস্কেলাই তাঁহার কাব্যকথিত রোমসাম্রাজ্যের উদ্ধারকর্ত্তা ইহাই অনেকে অনুমান করেন। ১৩২০ খৃষ্টাব্দে ইনফার্ণো বা নরক, পার্গেটরিও বা সংশোধক-নরক লেখা হয়। ইহার শেষ অংশ তাঁহার জীবিতকালে প্রকাশিত হয় না। দান্তে তাঁহার এই অমর কাব্য শুদ্ধ ল্যাটিনভাষায় না লিখিয়া ইতালীয়ভাষায় লেখেন, এজন্য তাঁহার সমসাময়িক অনেকে ভর্ৎসনা করিয়া ল্যাটিনভাষায় কোনও মহাকাব্য রচনা করিতে বলেন। কিন্তু, দান্তে পণ্ডিত-বর্গের অবজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া, ইতালীয় ভাষাতেই তাঁহার সুদূরপ্রসারি কল্পনার সুপক্ক ফলসমূহ প্রকাশ করিয়া মাতৃ-ভাষার শোভা বৃদ্ধি করেন। গ্রন্থ যাহাতে আপামর সাধারণ বুঝিতে পারে, পড়িতে পারে, অনুভব করিতে পারে, ইহাও তাহার অন্যতম কারণ। সাহিত্য পাঠককে উপেক্ষা করিতে পারে না। কবি যদি তাহার সৌন্দর্য্যানুভূতি নিজেই উপভোগ করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে শব্দাড়ম্বরের কোনই প্রয়োজন ছিল না, কারণ অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কবি তাঁহার ধী-শক্তির দ্বারা, তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতির পরিচায়ক একটী রূপ, একটী চিত্র অঙ্কিত করেন, যেরূপ,—যেচিত্র পাঠকের মনেও কবির অনুভূতি জাগাইয়া তুলে। শিল্প যখন পরিপূর্ণভাবে দৃষ্টপূর্ব্ব অনুভূতি পাঠকের হৃদয়ে উদ্রেক করিতে পারে, তখনই তাহা মহান শিল্প বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। বাংলাসাহিত্যে আজ যাঁহারা সাধারণ বাঙ্গালীকে ত্যাগ করিয়া শুদ্ধতার সাহিত্য গড়িতে চাহিতেছেন, তাঁহারা দান্তের এই বাণী অনুধাবন করিয়া দেখিবেন।

১৩২১ খৃষ্টাব্দে ৫৬ বৎসর বয়সে কর্ম্মক্লান্ত দান্তে তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাঞ্ছিত অমরধামে বিয়েত্রিচের সহিত সম্মিলিত হন। নির্ব্বাসিত দান্তের সমস্ত দেহমন কাঁদিয়া কাঁদিয়া পুড়িয়া ছাই হইল, কিন্তু তাঁহার মহাকাব্যের অলৌকিক গরিমায় মুগ্ধ হইয়া ফ্লোরেন্স তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া কবিসম্রাটের বিজয়মুকুট পরাইবে, তাঁহার এই চির পোষিত আশা সফল হইল না। ফ্লোরেন্স তাঁহাকে বিজয়-মুকুট না পরাইলেও বিশ্ব তাঁহাকে ডাকিয়া

লইয়া বিশ্বকবির আসনে বসাইয়াছে। ঘর যাহাকে তাড়াইল, পর তাহাকে কোল দিল। সপ্তশতাব্দীর শেষেও দান্তের বিচিত্র জীবন ও কাব্য গৌরবহীন না হইয়া দিন দিন ঔজ্জ্বল্যে ও সৌন্দর্য্যে মহিমময় হইয়া উঠিতেছে।

(৩)

দান্তের প্রথম কাব্য 'নব-জীবন'। সুওভা কথায় 'তরুণ ও নূতন' এই দুই অর্থই প্রকাশ পায়। 'নব-জীবন' কাব্যের মধ্যেও এই দ্ব্যর্থ পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহাতে কবি তাঁহার তরুণ জীবনের প্রণয়বেদন প্রাণের রক্তে ফুটাইয়াছেন। প্রণয়ের স্বপ্ন-মেদুর অভিসার, আবেগ ও উচ্ছ্বাস, নৈরাশ্য ও ব্যথা, সুগভীর দুঃখ ও বক্ষঃস্পন্দন ভাষার লালিত্যে গদ্য ও পদ্যের সমবায়ে এক বিচিত্র বস্তু গড়িয়া তুলিয়াছে। আবার পুষ্পপেলব এই অনুভূতি তাঁহাকে শুধু বাহিরের সৌন্দর্য্যে ভুলাইয়া রাখে নাই, অন্তরের কল্পলোকে যে প্রেম স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্য বিপুল হইয়া ওঠে সেই প্রেমের স্পর্শে তাঁহার চিত্তে নবজীবনের আবির্ভাব হইয়াছে।

দান্তে নয় সংখ্যার মধ্যে নিগূঢ় অর্থ দেখিতেন। তাই বিয়াত্রিচের সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয়—তখন দান্তে নয় বৎসর প্রায় পার হন, আর বিয়াত্রিচ নয় বৎসরে পড়েন! বিয়াত্রিচের দর্শনে সুরসপ্তকবদ্ধ বীণা যেমন বাতাসে কাঁপিয়া ওঠে, তেমনি তাঁহার সারা দেহ প্রণয়ের ছন্দে কাঁপিয়া উঠিল।

দান্তে নিজে বলিতেছেন—"সেই সময় হইতে প্রেম আমার হৃদয়ের রাজা হইল।" বিয়াত্রিচ দেববালার ন্যায় মোহিনী মূর্ত্তিতে অনুক্ষণ তাহার সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। ইহার ঠিক্ নয় বৎসর পরে বিয়াত্রিচ দান্তেকে প্রথম অভিনন্দন করায় দান্তে অপার আনন্দরসে মগ্ন হইলেন। রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন কামদেব সশরীরে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন-আলোক বর্ত্তিকার দীপ্তিতে ঘর উদ্ভাসিত হইল, বক্ষে রক্তরঞ্জিত বস্ত্রাবৃত বিয়াত্রিচ নিদ্রামগ্ন। কামদেব অগ্নিবর্ণ তাঁহার হৃদয় লইয়া বিয়াত্রিচকে খাওয়াইলেন। তাহারপর অশ্রুসজল নেত্রে কামদেব তিরোহিত হইলেন। দান্তে এই স্বপ্ন বিবৃত করিয়া যে সনেট লিখেন, তাহাই তাঁহার বর্ত্তমান কবিতার মধ্যে প্রথম। এই সনেট পড়িয়া তিন চার জন কবি সনেটে জিজ্ঞাসিত স্বপ্নের তাৎপর্য্য কবিতায় ব্যাখ্যা করেন। ইহার মধ্যে গিডো ক্যাভালক্যান্টির সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়।

নব-জীবনের সহিত আমাদের পরিচিত বৈষ্ণবসাহিত্যের সুললিত প্রেম-লীলার তুলনা চলে। তবে বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহিণী রাধার ছবিটাই আমাদের নিকট বেশী করিয়া প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু এ যেন বিরহী যক্ষ, তবুও যক্ষের সান্ত্বনা ছিল, আষাঢ়ের মেদুর জলদ জাল তাহার বিরহের সমস্ত বেদনার প্রকাশ মাথায় করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু এ প্রণয় কেহ জানিল না, কেহ বুঝিল না। অপ্রকাশের এই সুবিরাট শোকার্ত্ত কারুণ্য নবজীবনের প্রতি ছত্রকে মরমীপ্রাণের দরদের জিনিষ করিয়া তুলিয়াছে।

সেই রাত্রের পর বিয়াত্রিচের চিন্তায় কবির দেহ কৃশ ও মলিন হইতে লাগিল। বিরহীর ক্ষীণতা বন্ধুগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কবির তাই লুকো-চুরি খেলা খেলিতে হইল। কবি যেন বিয়াত্রিচের সঙ্গিনী অপর কোনও কুমারীর প্রেমে পড়িয়াছেন—এই ভাব দেখাইতে লাগিলেন। এই প্রেমের উদ্দেশ্যেই তিনি একটী কবিতা লেখেন। তাহাতে ৬০ জন কুমারীর কথা ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নবমস্থানেই দান্তের মানসী প্রিয়ার স্থান পড়িল। কিছুদিন পরে কুমারী অন্যত্র গমন করায় দান্তে একটী কবিতা লেখেন। বাচনিক অর্থে সেই কুমারীর উদ্দেশ্যে লেখা বোধ হইলেও নিগূঢ় অর্থ কবির বিয়াত্রিচের প্রতি সুগভীর প্রণয় প্রকাশ করিতেছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ কবিতায় বিয়াত্রিচ তাঁহার কোন সখীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছেন এই জন্যই সেই মৃত্যু ধন্য ও বরেণ্য কবি এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

"কা'র তরে শোক করি,　　কেহত জানেনা আহা,
বসে বসে রচি শুধু প্রণয় অঞ্জলি।'

ইহার পর কয়েক দিনের জন্য প্রবাসযাত্রাকালে পথিমধ্যে কামদেব তাঁহাকে অন্য কোন নারীর প্রতি প্রণয় করিতে বলিয়া তাঁহার দেহের সহিত মিলাইয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া সেই নারীর প্রতি প্রণয়ভাণ করায় দান্তের নামে কুৎসা রটিল। তাহার ফলে বিয়াত্রিচ তাঁহাকে অভিবাদন করা বন্ধ করিলেন।

বিয়াত্রিচের সুকোমল করপল্লবের অভিবাদন দান্তের নিকট স্বর্গীয় মাধুরী পূর্ণ ছিল। কবির নিজের কথায় তখন তাঁহার নিকট বিশ্বজগৎ একান্ত আপন হইয়া যাইত, পরিপূর্ণ প্রেমের বন্যায় তাঁহার হৃদয় এরূপ ভরপূর হইত যে তিনি সেই মুহূর্ত্তে মর্ম্মান্তিক শত্রুকেও ক্ষমা করিতে পারিতেন। তাহার

অভিবাদনে প্রেম কবির হৃদয় স্বর্গের সোনালি আলোয় অনুরঞ্জিত করিত—মুক্তির মধুর আনন্দ চারিদিকে সৌন্দর্য্যের পারিজাত ফুটাইয়া তুলিত। কবি ভাবাবেশে চৈতন্য হারাইয়া ফেলিতেন। তাই দুঃখে তাঁহার প্রাণ ভরিয়া গেল আবার স্বপ্নে প্রণয়দেবতা দেখা দিয়া ভাণ ত্যাগ করিতে বলিলেন ও কয়েকটী প্রেমের কবিতা লিখিতে উপদেশ দিলেন। কবি তাঁহার গানকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার প্রিয়ার নিকট যাইতে বলিলেন, কারণ প্রণয়ীর মর্ম্মযাতনা ও সুগভীর প্রণয় ব্যক্ত করিয়া গান প্রিয়াকে করুণ হইতে অনুরোধ করিবে। কিন্তু কবির চিত্ত আবার সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিল। কখনও মনে হইল—প্রেম শিবময় কখনও মনে হইল অশিব, কখনও সুন্দর। তাহার উপর তাহার প্রণয়িণী যে অদ্বিতীয়া। সংশয়াকুল চিত্তে তিনি করুণার শরণাপন্ন হইলেন। কোনও বন্ধু ইহার কিছুদিন পরে সুন্দরীসমাগম দেখাইবার জন্য তাহাকে কোনও বিবাহ সভায় লইয়া যান। এই সভায় বিয়াত্রিচের সহিত সাইমন ডি বার্ডির বিবাহ হয়। বিয়াত্রিচকে দেখিয়া কবি প্রণয়ের মাদকতায় সংজ্ঞাহীনের মত হইয়া পড়েন। তাহাতে বিয়াত্রিচ তাহার সঙ্গিনীগণ কৌতুক করায় তিনি অষ্টম কবিতাটী লেখেন। বিয়াত্রিচ যখন সম্মুখে আসে, তখন প্রেম কবির হৃদয় হইতে অন্য সকল ভাব তাড়াইয়া একাধিপত্য করিতে চায়—প্রেম সমস্ত প্রবৃত্তির সংঘর্ষ থামাইয়া অনিমেষ নয়নে বিয়াত্রিচের পানে তাকাইতে চায়।

কবির মনে হইল—"যে তাহাকে চায় না, তাহার জন্য এত ব্যাকুলতা কেন?' কিন্তু ব্যাকুলতা যে যায় না—তাই কবি মরণকে আহ্বান করিলেন। দশম কবিতায় কবি বিরহের অরুন্তুদ পীড়া, প্রণয়িণীর কথা আলোচনায় তৃপ্তি, দর্শন-পিপাসা অথচ দর্শনে চৈতন্যহীনতা প্রেমের এই চারি দশার বর্ণনা করিয়াছেন।

এই গোপন-প্রেম এক্ষণে অনেকের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। একদিন কয়েকজন মহিলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই ব্যর্থ প্রেমের ফল কি?" কবি বলিলেন তাহার প্রেম প্রেয়সীর অভিনন্দন কামনা করে, তাহাতেই তাঁহার স্বর্গসুখ, অন্য কামনা নাই। দ্বাদশ কবিতায় কবি তাঁহার আদর্শ জনাইয়াছেন। সুকোমল হৃদয় আর প্রণয় একই জিনিষ। বিবেক-হীন আত্মা যেমন মনুষ্যসংজ্ঞাহীন, প্রেমহীন মানুষও তেমনি। প্রেম হৃদয়রাজ্যের রাজা। গুণবতী নারীর সৌন্দর্য্যে নরের চক্ষে বাসনা জাগিয়ে তোলে, সেই বাসনা হৃদয়ে যাইয়া বাসা বাঁধে, তখন প্রেম নিরুপায় হইয়া

জাগিয়া ওঠে ও নারীর প্রাণেও মিলনাকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলে। বিয়াত্রিচের নয়নও কুরঙ্গের মত প্রলোভিত করে, তার হাস্য যাদুমাখা, সমস্ত ধরণীকে সে সৌন্দর্য্যে নিমগ্ন করে। ইহার কিছুদিন পরেই বিয়াত্রিচের পিতা ফল্কো পর্টিনারির মৃত্যুতে শোকসাগরে নিমগ্ন হয়। তাহার হৃদয়-বিদারক শোকের কাহিনী অন্য নারীর মুখে শুনিয়া চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ কবিতা দু'টী লিখেন। রোগ শয্যায় মানসিক দৌর্ব্বল্যে কবি স্বপ্ন দেখিলেন, মৃত্যু আসিয়া তাহার প্রণয়পাত্রীর সুষমা হরণ করিয়া লইল। মৃত্যু তাই কবির নিকট প্রিয়তম হইয়া উঠিল। কিন্তু কবি এতক্ষণ যে প্রেমের কথা বলিয়াছেন তাহা ও শারীরিক, আধ্যাত্মিক প্রেম কই? কবি বলিতেছেন "বিয়াত্রিচ যখন সাধারণের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিত, লোকে তখন তাহাকে স্বর্গের দেবী বলিয়া মনে করিত। তাহার দর্শনে অন্তরে পরম শান্তি জাগিত স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য তার চারিদিকে যে আভা সৃজন করিত তাহার জ্যোতিতে পার্শ্ববর্ত্তী সকলেই পবিত্র হইত। বিংশ কবিতায় কবি মুক্তকণ্ঠে তাহার উপর প্রেমের প্রভাব বর্ণণ করিতেছেন। প্রেম তাহার সমস্ত হৃদয় ছাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসে আপনার হৃদয় বেদনা প্রকাশ করিতেছে কবি প্রণয়িণীর কাছে আপনাকে জ্ঞাত করিবার আগ্রহে ব্যাকুল।

(ক্রমশঃ)

ক্ষাত্র-ধর্ম্ম।

লেখক—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার, ভকিল।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে যে প্রতি জাতির মধ্যেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিটী বিভাগ দৃষ্ট হয়; এই বিভাগ গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী বিভাগ। হিন্দুশাস্ত্রে মনুষ্যের তিনটী গুণের উল্লেখ আছে যথা সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যেই পারিলক্ষিত হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক গুণ সৎবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত, রাজসিক গুণ রাজবুদ্ধি বা অন্যের

উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার বুদ্ধি বা অহঙ্কার দ্বারা প্রণোদিত, দুষ্ক্রিয়া দ্বারা প্রণোদিত গুণই তামসিক গুণ বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকে। যাহার ভিতর এই তিন গুণের মধ্যে যে কোন গুণের প্রধান্য লক্ষিত হয় তাহাকে সেই গুণ সম্পন্ন; বলা যায় কিন্তু কোন এক গুণের প্রাধান্য থাকে বলিয়া যে অন্য গুণ সেই ব্যক্তির ভিতর থাকে না এরূপ সম্ভবপর নহে। এই তিন গুণ মনুষ্যের আহার-বিহার ও কার্য্যাবলীর উপর নির্ভর করে। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহার সম্বন্ধে যথেষ্ট উক্ত হইয়াছে। সাত্ত্বিক আহার সম্পান্ন ব্যক্তিই যে সাত্ত্বিক গুণের আকর হইবে এমন কোন কথা নাই, কারণ গুণগুলি মানসিক বৃত্তি। মৎস্য মাংস মদ্য প্রভৃতি রাজসিক বা তামসিক আহার বর্জ্জিত হইলেই যে নিরামিশী ব্যক্তির হৃদয়ে সাত্ত্বিক গুণের প্রাধান্য আসিবে এমন কোন যুক্তি নাই। যে ব্যক্তি আহারে বিহারে চিন্তায় সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন তিনিই সাত্ত্বিক গুণের অধিকারী। সুতরাং রাজসিক আহার দ্বারা যে সাত্ত্বিক গুণের অধিকারী হওয়া অসম্ভব তাহা নহে। প্রত্যেক লোকের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিভিন্ন; এই প্রকৃত প্রবৃত্তি বা propensity দ্বারাই মানুষ পরিচালিত হইয়া কার্য্য করে। এই প্রকৃতি বা প্রবৃত্তিকে সৎপথে চালাইতে পারিলে, আহার বিহার বা চিন্তার ধারায় সামঞ্জস্য রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলে তবে সাত্ত্বিক গুণ অর্জ্জন করা যায় অন্যথায় কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া দুর্দ্দমনীয় অশ্বের ন্যায় তাহাকে কুপথে চালিত করিলে তামসিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইলে যে সমস্ত খাদ্য দ্বারা তাহার দমন সম্ভবপর সেই সমস্ত খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়; এই কারণেই খাদ্যাখাদ্যের বিচার। অন্যথায় খাদ্যাখাদ্যের দ্বারা শরীর পালন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না। মদ্য মাংস শরীরকে উত্তেজনা প্রদান করে। মন উত্তেজিত হইলে মনুষ্য সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হয়না এবং প্রবৃত্তি দমনে সক্ষম না হওয়ায় সদসৎ বিচারে অক্ষম হইয়া নানারূপ পাপকার্য্যে ব্রতী হয়। কিন্তু কেহ যদি কোন উত্তেজনা পূর্ণ আহার গ্রহণ করে এবং সেই আহার তাহার শরীরের পক্ষে উপযোগী হয় এবং ঐ ব্যক্তি যদি সামঞ্জস্য রাখিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে তাহাকে সাত্ত্বিক গুণ সম্পান্ন না বলিবার কোন কারণ নাই।

ব্যক্তি সম্বন্ধে যাহা সত্য ব্যক্তির সমষ্টি দ্বারা গঠিত সমাজ সম্বন্ধে এবং জাতি সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। উপরে যে চারিটী বর্ণ বিভাগের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাও এই সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের মধ্যে সাত্বিক, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে রাজসিক, বৈশ্যের মধ্যে সাত্বিক রাজসিক এবং শূদ্রের মধ্যে তামসিক গুণের প্রাবল্য থাকা দেখিয়াই ঐ চারিটী বিভাগ করা হইয়াছে। গুণানুযায়ী বৃত্তি যে গঠিত হইয়াছে তদ্বারা কেবলমাত্র ইহা সূচিত হইতেছে না যে ব্রাহ্মণের মধ্যে কেবলমাত্র সাত্বিক গুণ ভিন্ন অন্য গুণ কিম্বা ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বা শূদ্রের বৃত্তি আদৌ থাকিবে না; এবং অন্য তিন বর্ণের বেলায়ও সেই কথা বলা যাইতে পারে। গুণ বা বৃত্তির আধিক্য হেতু এই বিভাগ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণের মধ্যেও ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের ভাব বা বৃত্তি থাকা প্রয়োজন এবং তাহার অভাবে সমাজে যে ক্ষতি হওয়া অনিবার্য্য তাহাও সত্য। উদাহরণ স্বরূপ হিন্দু-রাজত্বের অবনতির কথা বলা যাইতে পারে। উপরি উক্ত চারিটী বিভাগ যখন হিন্দু জাতির মজ্জাগত হইয়াছিল তইন প্রত্যেক জাতি তাহার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার স্বীয় বৃত্তি ভিন্ন অন্য বৃত্তির পরিচালন যে তাহার কর্ত্তব্য সে তাহা বিস্মরণ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ অধ্যয়ণ, যজন, যাজন লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বৃত্তিকে ঘৃণা করিতেন শূদ্র বৃত্তির ত কথাই নাই ফলে তাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া দুর্ব্বল, ধনোপার্জ্জনে বিমুখ হইয়া দরিদ্র এবং অন্য জাতির উপর সেবার জন্যে নির্ভরশীল হইয়া পরাধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তদ্রূপ ক্ষত্রিয় জাতি যুদ্ধ বিদ্যা লইয়া জীবন কাটাইতেন তাহারা দেশ শাসন অন্তর্শক্র বা বহির্শক্রর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা প্রভৃতি কার্য্য লইয়া থাকিতেন ফলে তাহারা অহঙ্কারী. দুর্দ্ধর্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল চিন্তায় বিরত ছিলেন এবং নিজেদের বাহুবলকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া এতদূর উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে কোন যুদ্ধে এই ক্ষত্রিয় জাতি পরাজিত হইলে দেশ রক্ষার জন্য অন্য জাতির সহায়তা লাভের আর দ্বিতীয় পন্থা ছিল না এবং কেবল মাত্র ক্ষত্রিয় জাতিই যুদ্ধ বিদ্যা বিশারদ হওয়ায় তাহারা স্বতঃই উচ্চ মূল্যে তাহাদের এই বিদ্যা বিক্রয় করিতে উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যুদ্ধ বিদ্যা ক্ষত্রিয় জাতির এক চেটিয়

ব্যবসায় বা Monopoly হওয়ায় তাহাদের উপর রাজশক্তিকে নির্ভর করিতে হইত তাহারা যুদ্ধের অবসর কালে অন্য কার্য্য না থাকায় আলস্য-পরায়ণ হইয়া পড়িত এবং দেশের অন্য তিন জাতি যুদ্ধবিদ্যা হইতে দূরে থাকায় বা এই বিদ্যায় অভ্যস্ত না থাকায় ক্ষত্রিয়দিগের অতিরিক্ত ক্ষমতার জন্য ইহাদিগকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিত এবং যাহাতে ইহাদের গৌরবের হানি হয় সর্ব্বদা তাহার কামনা করিত। ক্ষত্রিয়গণের ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য বৃত্তি অভ্যস্ত না থাকায় বা ঐ ঐ বৃত্তিকে তাহারা ঘৃণার চক্ষে দেখায় যুদ্ধের অবসানে যখন দেশে শান্তি বিরাজ করিত তখন তাহারা ধনোপার্জ্জনে অক্ষম হওয়ায় গৃহবিবাদে প্রবৃত্ত হইত ফলে দেশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িত এই গৃহ বিবাদই হিন্দু জাতির পতনের মূলীভূত কারণ। কবি যথার্থ বলিয়াছেন—

একতায় হিন্দুগণ
সুখে ছিল সর্ব্বজন
সে ভাব থাকিত যদি
পার হয়ে সিন্ধুনদী
আসিতে কি পারিত যবন।

ক্রমশঃ

MINISTRY OR NO MINISTRY

Rai Jadunath Majumdar's Speech.

The following is the full text of Rai Bahadur Jadunath Mazumdar's speech at the Bengal Legislative Council, on 17th January 1927 :—

"I am sorry for these countrymen of ours who are autside the House, as well as for those Hon'ble members in the House who feel aggrieved at not having yet got full responsible government for India. Sir, it was my humble self who, as far back as Sep-

tember, 1921, moved a resolution for the earlier appointment of a Statutory Commission in the Legislative Assembly, That Commission did not come, but for whose fault? Not for any fault on the part of those who wanted responsible government by co-operation, but on account of the non-co-operation movement which was inaugurated at the time of the visit on His Royal Highness the Prince of Wales,' shortly after the resolution had been moved by my humble self and accepted by the Government of India. The boycott of the visit of the Prince of Wales created a change of feeling in England towards India and the resolution had no effect on the British Cabinet.

Sir, it is said that Ministers are on no use, but those who make such complaints labour under the misapprehension that full responsibie government had already been conferred on us. They forget that full responsible government has not yet been conferred Parliament never proposed full responsible government all at once for India nor did it confer the same ; no are the Ministers here yet in the same position as the Ministers in the House of Commons. (Cries of "shame" "shame") Yes, quite, shame to those who are standing in the way of the attainment of responsible government by refusing Ministers' salaries.

Now, sir, what is the complaint? It is that the Ministers have got no reapowers what powers do they want. Have even the members of the Executive Council got greater powers than they? Can they do anything they like. They cannot : and the Ministers are exactly in the same position in regard to transferred departments as the Exe cutive Councillors.

"EXTREMELY ABSURD."

Now, sir, what is the position of the Ministers? The Ministers are entrusted with same departments—very important ones—which are called nation building departments—industries agriculture, education, local self-government and so on. Certain fund are provided for those departments, Are those members who are

opposed to the appointment of Ministers also opposed to the appointment of Ministers also opposed to the grants for those de partments ? No, they are not. They will vote for the supplies of those departments, but when the question of the appointment of Ministers, who are to administer those departments comes up, they say we shall not vote their salaries' This isto say the least very awkward, illogical and extremely absurd. You will vote supplies for the transferred departments but refuse the salaries of Ministers for administering them ! Is there any consistency in this ? Is it proper that you should not vote Ministers' salaries and thus allow these nation-building departments to be administered by those who, in your heart of hearts, you think, should not ? Is it not a very absurd position for the members opposite to take up ?

The absurdity of the position is that you are running the municipalites district boards and union boards a Chairman and so on. Why, are the not under Government ? Don't you know that all municipalities and district boards can be suspended by the fiat of Government without reference to the Council or anybody else ? Obviously that position you can accept whereas you find difficulty in accepting the position of a Minister, because he holds office at the pleasure of the Governor. That is only a convention, and even the Executive Councillors hold office at the pleasure of the King-Emperor and not at the pleasure of the people. No Governor will send away his Ministers for no reason that will be utterly absurd. You say that the Ministers cannot work properly : I know Sir, that bad workmen always quarrel with their tools. I the Ministers really want to work, and if they are efficient men at the same time, they can do substantial work in the way of nation building.

Those who want to work the Reforms should be allowed to do so ever with the limited resources at their disposal but instead of doing that, you are allowing the Hon'ble Mr. Donald and other members of the bureaucracy to do that work and thereby stunting the growth of the nation-building departments.

You say "the Ministers have no powers and can do nothing." But look to the performances of the first Ministry—was not the Calcutta Municipal Act an act of the first Minister and is not the Mayor of Calcutta leading the opposition now ?

Then let us come to the Ministers of the second period—Ministers whom you drove out—who gave you the Islamia College ?

It all depends upon the personnel of the Ministry to work out the Reforms successfully; if they are capable men they can even with this limitation of funds do much and can certainly solve many of Bengal's problems.

Sir, I know the tactics that were employed by the Swaraj party during the last three years; it is no good using Deshbandhu's name for whom they as well as I cherish the greates respect, but had that great man been alive now he would have advised you to accept the Ministry. If you are to attain equality of status with other free states in the British Commanwealth of Nations which is the idea of your political ambition, you mus work the reformed constitution for all it is worth. It is no good saying so we can't attain our end" before even trying to work it.

TWO WAYS.

I think sir, there are two ways of attaining our object, firstly by convincing the Government of your aptitude and ability to administer the transferred departments and, secondly by wresting powers from the hands of the British Governmeut. But as you cannot drive away the British by force and you have confessed to it more than once, the best thing you can do is to persuade them, reason with them, and exert your soul-force upon them, so that gradually, step by step they may transfer more and more of their powers to popular control and thus you may attain provincial autonomy, the summit and goal of your ambition

Now, what are the department transferred to the Ministers? I find that they are quite large in number, viz, Local Self Government, Medical Department, Public Health, Education, Public Works, Agriculture, Industries, Civil Veterinary, Fishery, Co-oerative Societies, Registration, Religious Eudowments, Stationery, Stores, etc.

And what are the reserved subjects? They are merely Law and Justice, Revenue, Irrigation, Police etc,

A GREAT SHAME.

But geat patriots of the country as you are, you have refused to make use of the money allotted to transferred departments to be administered by your own Ministers and are asking those whom you consider your enemies to administer them? That is a great shame. What do we find in the other parts of India? All the other provinces of India have with one voice accepted the Ministry and have made rapid stride in the nation-building departments. Look at the Punjab, Have they not accepted it? Look at Madras and other provinces, they have all accepted Ministry, It was disgraceful for this premier province to have followed the example of the backward Central Provinces during the last session. Taking Bengal as a whole, have not our Mussalman countrymen who constitute more than half the population demanded in one oice the formation of the Ministry?

To the shame and disgrace of Bengal she is still sitting on the fence and sulking and trying by dubious methods and tactics to attain self-government which is our heart's desire, and which cannot be attained by a short cut against precipitious walls of stone but only by a long and winding path, tortuous though it may be. And it is the only way, circumstanced as we are, to reach the summit of autonomy,

In conclusion I beg to say that these dubious methods and tactics are condemned not only by the whole country but also by the members of the bureaucracy, many of whom are our sincere well-wishers and want to work the Reforms for our good. I appeal therefore to you, members of the Swarajya party who are all patriots and have made considerable sacrifice for the country to cheerfully work the Reforms and pave the path for responsible government in the fulness of time."

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৫ সালের ২০ আইন্ মতে রেজেষ্টীকৃত)

হিন্দু-পত্রিকা।

৩৩শ বর্ষ, ৩২শ খণ্ড
৮ম ও ৯ম সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ ও পৌষ

১৩৩৩ সাল।
১৮৪৮ শকাব্দাঃ

অতৃপ্ত-বাসনা।

লেখক—শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ান তত্ত্বনিধি সরস্বতী কাব্যভূষণ কাব্যতীর্থ।

হে ভক্তের ভগবান্ সাকার কি নিরাকার
নাহি বুঝি কিবা যায় কিবা লাভ বুঝিবার!
সরিৎ আপনা হারা
ছুটিছে উছল ধারা
কোন্ চারি সীমানায় মিলিয়াছে পারাবার
সে কি খুঁজে ঘুরে মরে পৃথিবীর চারিধার?

(২)

কতরূপ নিরখিল দু' আঁখি জীবন ধরে
কত যে রূপের ফাঁদ পেতেছ হে সৃষ্টিভরে

মানবের কুসুমের
ধরণীর আকাশের
কত রূপে মজিলেম কইরে নয়ন প্রীতি!
খুঁজে কি অচেনারূপ আঁখি কাঁদে এ কি নীতি!

(৩)

কত গান শুনিল হে এ জীবনে দু'টি শ্রুতি
তোমার সৃষ্টির মাঝে চিরদিন চিররাতি!
প্রিয়মুখে শিশুমুখে
পিকমুখে সিন্ধু-বুকে
কত সুরে মাড়াইল কইরে শ্রবণ প্রীতি!
খুঁজে কি বাঁশীর সুর গুমরিছে শ্রুতি নিতি!

(৪)

কত গন্ধে দিল স্পন্দ মন্দ মন্দ গন্ধবহ
কি আর বলিব ওহে নাসিকায় অহরহঃ
কুসুমের স্নিগ্ধবাস
দেয় প্রাণে কি আভাস!
কত ঘ্রাণে মজাইল কইরে নাসিকা প্রীতি!
খুঁজে কি অজানাগন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয় কাঁদে নিতি!

(৫)

কত রসে রসিলহে রসনারে এ জীবনে
কত রসে ভরিতেছ সৃষ্টি-পাত্র ক্ষণে ক্ষণে!
প্রিয়মুখে প্রিয়চুমা
লেহ্য পেয় নাহি সীমা;
কইরে রসনা প্রীতি কার মুখে চুমা দিতে
কার নাম মুখে নিতে খোঁজে কারে চারি ভিতে!

(৬)

কত কি পরশে অঙ্গ অধীর করিল তার
বলিয়া হবেনা শেষ তুলনা জোটেনা যায়!
কত সুখ-পরশন
কত প্রিয় আলিঙ্গন

কত স্পর্শে মজাইল না জুড়ায় অঙ্গত্বক্ !
কার স্পর্শ খুজে মরে সবি যেন অনর্থক্ ।

(৭)

হে দয়িত, আখি শ্রুতি নাসাত্বক্-রসনায়
কি লাগিয়া দিয়াছ গো এ অসীম বাসনায় ?
মনে যদি ছিল হায়
লুকাইবে অজানায়
কিবা লাভ এ কুহকে একিরে চাতুরী হায় !
সাকার কি নিরাকার নাহি বুঝি আমি তায় ।

(৮)

এস এস হে সুন্দর স্নিগ্ধবাসে বাঁশীতানে
মুখে মুখে বুকে বুক ধর দৃঢ় আলিঙ্গনে।
অতৃপ্ত পিপাসা মোর
তোমাতেই হোক ভোর
জুড়ে বস মোরে ঘেরে বস এ নিখিলে আসি,
তোমাতে সফল হোক্ তব দেওয়া তৃষারাশি !

দান্তে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লেখক—শ্রীমতিলাল দাশ এম্, এ, বি, এল।

নবম মাসের নবম দিনে বিয়াত্রিচ অমরধামের যাত্রী হওয়ায় দান্তে বলিতেছেন এই রহস্যের সহিত নবগ্রহ সংযুক্ত আছে। বিয়াত্রিচের জন্মকা এই নবগ্রহ শুভ লগ্নে সম্মিলিত ছিল। আবার তিনকে তিন দিয়া গুণিলে নয় হয়, অতএব নয়ের বর্গমূল তিন, আবার পৃথিবীর সম

কারণের মূলই ত্রিদেব। খৃষ্টধর্ম্মের ত্রিদেবের সহিত বিয়াত্রিচের তাই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

বিয়াত্রিচের গমনে সমস্ত ফ্লোরেন্স নিরানন্দ ও মলিন হইয়া উঠিল। কবির অশ্রুপ্রবাহ বাধা মানিল না, অশ্রান্ত বহিতে লাগিল। বিয়াত্রিচ চলিয়া গিয়াছে, শীতের দুরন্ত প্রতাপে নয়, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড নিঃশ্বাসে নয়, কমনীয়তার মাধুর্য্যে যে গিয়াছে তাহাকে পাইয়া ভগবজ্জ্যোতি দ্বিগুণিত হইয়াছে। কবির শোক অনির্ব্বাণ ভাবে জ্বলিতেছে, কিন্তু তবু কবি বিয়াত্রিচের স্বর্গীয় প্রভাব অন্তরে অনুভব করিতেছেন।

দ্বাবিংশ কবিতায় কবি জনৈক বন্ধুর নিকট হৃদয়ের গোপনীয় মর্ম্মকথা কহিতেছেন। মৃত্যু কবির বাঞ্ছিতকে লইয়াছে সে যেমন তেমন বঁধূ নয়!

"প্রেমের আলোকে যার দেবতারা ছিল খুসী
লোকাতীত তাঁদের হৃদয়ে
আনিত পুলক সে যে অপূর্ব্ব বিস্ময়ে।"

বিয়াত্রিচের বার্ষিক মৃত্যুবাসরে কবি তাহার অফুরন্ত প্রেমের বেদনা গভীর করিয়া অনুভব করিলেন। তাঁহার দুঃখে অন্য কোন কুমারী সমবেদনা প্রকাশ করায় কবি মনে করিলেন যে সেই নারীর মধ্যেও সত্যকার প্রেম বিরাজমান। কবি এই নারীর মুখে বিষণ্ণ পাণ্ডুর আভা দেখিয়া বিয়াত্রিচের সহিত তাহার তুলনা করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কবির হৃদয় ইহার পানে আর্দ্র হইয়া উঠিল, তাই বাসনাকে দমন করিবার জন্য তাঁহার অন্তরে যে দ্বন্দ্ব চলিল, তাহার চিত্র কবি তিনটী কবিতায় অঙ্কিত করিলেন।

কবির ধর্ম্মবুদ্ধি আসিয়া কামনাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। কবি তখন স্বপ্ন দেখিলেন বিয়াত্রিচ আরক্ত-বসনে তাহার নিকট উপস্থিত। কবির কামনা দূরীভূত হইল, আবার বিয়াত্রিচের স্বর্গীয় মূর্ত্তি কবির অন্তরে বাহিরে ঝলকিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে তীর্থযাত্রী কয়েক জন লোককে যাইতে দেখিয়া দান্তের মনে হইল ইহারা ত তাহার বঁধূর বার্ত্তা জানে না। কবি তাই বলিলেন "ওগো তীর্থ-যাত্রী! তোমার বাসস্থান কতদূরে যে তুমি আমাদের দুঃখে অনুকম্পা না দেখাইয়া আপন মনে চলিয়াছ। তুমিত ত জান না যে এ নগরী যাহাকে হারাইয়াছে, তাহার নাম উচ্চারণমাত্র ঐশ্বরিক প্রভায় সমস্ত

ভুবন ভাস্বর হইয়া ওঠে, আর মানুষ তাহার অভাবে স্বতঃস্ফূর্ত্ত শোকে বিমুক্ত হইয়া যায়।

একবিংশ ও শেষ কবিতায় দুজন মহিলাকে কবি আপনার অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

মহাশূন্যে দূরতম জগতের পারে,
ব্যথিত নিঃশ্বাস মোর চলিছে রভসে,
নবদৃষ্টি জাগ্রত যা প্রেমের পরশে,
অজানিত পথে পথে লয়ে যায় তারে।
ওই দূর লোকান্তরে সৃষ্টি যবে থামে,
হেরে নারী মহীয়সী আলোক-উজ্জ্বল
আরাধিছে পদ যার জ্যোতিষ্ক মণ্ডল,
সবিস্ময় রহে স্তব্ধ পুণ্য দেব ধামে।
মোর পাশে ফিরি যবে অনুভূতি তার
প্রকাশি বলিলে মোরে পারিনা বুঝিতে
ভাষাতীত বোধ সে যে অপূর্ব্ব মধুর,
ঝঙ্কারে সে বাণী ত'ার অন্তরে আমার
প্রেয়সীর স্মৃতিসুধা পাঠায় খুঁজিতে
অনুভবে আসে তাই মাধুরী বঁধূর।

এই কবিতা শেষ হইলে কবি আদেশ পাইলেন। মানুষ কভু কোনও নারীর জন্য যাহা লেখে নাই, তাহাই কবি বিয়াত্রিচের স্মৃতিতে লিখিবেন সংকল্প করিলেন। কবি তাই প্রেমের দেয়ালি নিভাইয়া দিলেন। কিন্তু ইহার পর হইতে বিয়াত্রিচ তাঁহার অলোকসামান্য সুষমা ও ঐশ্বর্য্য লইয়া কবির চিত্তক্ষেত্রে লীলা করিতে লাগিলেন। বঁধূর প্রণয়ব্যাকুল নয়ন-যুগল কবির শোকদীর্ণ মুখে জ্যোতির উচ্ছ্বাস ফুটাইয়া তুলিল! কবি ধন্য হইয়া গেলেন। সাথে সাথে বিশ্বমানব ও সেই মিলনের উৎসবে আপনাকে বিলাইয়া দিল।

এই কাব্য দান্তের প্রথম রচনা। ইতালীয় ভাষায় প্রথম বিশুদ্ধ গদ্য এই কাব্যেই পাওয়া যায়। প্রেমের কবিতার মধ্যে উচ্চাসন পাইলেও এই কাব্যে হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্তিমতী যে পিপাসা সৃষ্টির আদিদিন হইতে নরনারীর জন্য ভোগ করিয়া আসিয়াছে, তাহা ইহাতে নাই। নারীর প্রতি নরের

সেই বুভুক্ষু মিলনাকাঙ্ক্ষা দান্তের কাব্যে তেমন ফুটে নাই। সেই

লাখ লাখ যুগ হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে পর রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

দান্তের মধ্যে নাই। কবির প্রিয়া তাহার রূপলাবণ্যে মূর্ত্তিমতী হইয়া সাধারণ মানুষের প্রাণে আসিয়া প্রতিঘাত করে না। কবি যেন ভাবিয়া চিন্তিয়া রহিয়া সহিয়া প্রেম করিতেছেন। প্রথম দর্শনেই যদিও প্রেম জন্মিল, তবুও কবি প্রণয়িণীর মর্ত্ত্যজীবনকে সমস্ত হৃদয় দিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষায় যেন ব্যাকুল ন'ন। প্রিয়ার অধরে লাস্যের বিজলীচ্ছটা ও সুনম্র অভিবাদনই কবির পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য এ প্রেম উচ্চস্তরের ও উচ্চদরের, কিন্তু ইহার কোথাও মানুষের মন ভুলানো পাগল-করা পীরিতি-বন্যা জাগে নাই।

এই জন্যই বহু সুধী সমালোচক বিয়াত্রিচের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁহারা বিয়াত্রিচের মধ্যে আদর্শ রমণীর চিত্র বা ভাগবতজ্ঞানের রূপক দেখিতে পান। আমাদের মনে হয়, বিয়াত্রিচ সত্যিকার রক্ত-মাংসের মানুষ, কারণ কবিতায় বিয়াত্রিচের জীবনের খুঁটি নাটি যে সব পরিচয় আছে—তাহার রূপক ব্যাখ্যা করা অসম্ভব, আর করিলেও তাহা অতিবুদ্ধিরই, পরিচয় হইয়া দাঁড়ায়। তবে কবি যখন তাঁহার কাব্য লিখিয়াছেন, তখন তাঁহার প্রেম ঘনীভূত হইয়া গেছে, তখন রূপকে ছাড়িয়া অরূপকে ধরিবার ক্ষমতা কবির জন্মিয়াছে। কাঁচা ও সবুজ প্রেমের মাতলামী নবজীবনের কোন চরণেই নাই। সে প্রেম শান্ত ও সংযত, ধ্যানগম্ভীর ও সমাহিত। যে প্রেম স্রোতের মত তীরকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, এ সে প্রেম নয়। এ প্রেম ভরানদীর মত ধীর ও নীরব। আড়ম্বর নাই, উচ্ছ্বাস নাই, অথচ সমস্তপ্রাণ—সমস্ত দেহ এই প্রেমের নিঃস্তব্ধ সঞ্চারে উদ্বেল ও কম্প্র।

তাহার তরুণ বয়সের এই কবিতা অবজ্ঞার নয়, কারণ দান্তের মহাকাব্যে বিয়াত্রিচের কার্য্য কলাপ সম্যগ্-ভাবে বুঝিতে হইলে নবজীবনের তরুণী বিয়াত্রিচের কল্যাণী ছবিটী আমাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। তাহার উপর ইহাতে কবির তরুণ সুকোমল প্রাণের যে মনস্তত্ত্ব পাই তাহাতে কবিকে বুঝিবার যথেষ্ট সুবিধা হয়। সপ্তবিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত কবির জনের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে কবির সমগ্র জীবনের ছায়া

পাওয়া যায়। সুকোমল সহৃদয় প্রণয়পিপাসু চিত্তে প্রিয়তম জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসনদণ্ড যে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিল শেলাঘাতও বোধ হয় সেরূপ তীব্র জ্বালাময় নহে। পদলালিত্য ও সুকুমার বচনবিন্যাসে কবির নানা অনুভূতির চিত্র যেন চিত্র-শালিকায় একটীর পর একটী করিয়া সাজানো আছে।

নবজীবনের মধ্যে কবির রাজনৈতিক জীবনে যে উত্থান পতন হয় তাহার আভাস সূচিত আছে। তখনকার লোকে গুপ্ত-সমাচার-বিনিময়ে অভ্যস্ত ছিল। রাজনৈতিক দলের প্রত্যেকের এক একটী গুপ্ত ভাষা ছিল। সেই গুপ্তভাষার অর্থানুসারে ব্যাখ্যা করিলে কবি রাজনৈতিক যে দল সমর্থন করেন বিয়াত্রিচ সেই দলের সূচনা করিবে। তাঁহার প্রেম এই দলের প্রতি অনুরক্তি বুঝাইবে। কিন্তু বাহিরের লোকের কাছে সেই পুরাতন যুগের ফ্লোরেন্সের যুদ্ধ বিগ্রহের সূক্ষ্ম বর্ণনায় কোন রস উদ্রেক করিবার আশা দুরাশা।

বিয়াত্রিচের প্রতি কবি যে অত্যাসক্তি ও অতিভক্তি দেখাইয়াছেন তাহাতে অনেকে মনে করেন কবি কোন লৌকিক নারীর প্রতি এরূপ সম্মান দেখাইতে চান নাই। তাঁহারা ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ করিয়া বলেন বিয়াত্রিচ জ্ঞানের রূপক; তাঁহার সখীগণ জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ।

এইরূপ নানা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অর্থ ভিটানুওভা হইতে বাহির করিতে পারা যায়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দান্তের ব্যক্তিগত জীবনের হাসি-কান্নার হীরাপান্নার ছবি খুলিয়া দেখিলে নবজীবনকে আমরা যথার্থ স্বরূপে দেখিব। এ প্রেম শুদ্ধ ও বুদ্ধ, পরকীয়া রসের নিগূঢ় মাধুরী মাখা এই প্রেমের ইতিহাস বাঙ্গালীর গৌরব-দীপ বৈষ্ণবসাহিত্যে জ্বলন্ত আছে বলিয়া বাঙ্গালী দান্তেকে অখণ্ড আনন্দে উপভোগ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করি। মাধুরীর সহিত মহত্ত্ব, মঙ্গলের সহিত সৌন্দর্য্য, কামনার সহিত সংযম, বিরহের সহিত শান্তি, উচ্ছ্বাসের সহিত উদ্বেল পরিপূর্ণতার সমন্বয়ে নবজীবন চিরজ্জ্বোল কীর্ত্তিদীপ হইয়া বিশ্বায়তনে জ্বলিবে।

(৫)

ইতালীয় ভাষায় তাঁহার যে দ্বিতীয় গ্রন্থ রচিত হয় তাহার নাম "ভোজ"। বুভুক্ষু সাধারণ তত্ত্বকথার বিরাট ভোজে যোগদান করিবার আনন্দ হইতে বঞ্চিত ছিল; কবি তাহাদিগকে ডাকিয়া সেই অপূর্ব্ব সামগ্রী বিতরণ করিলেন।

লাতিনভাষার শব্দসম্পদময় সৌন্দর্য্যে তাঁহার বাণী মণ্ডিত না করার জন্য দান্তেকে কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল অদূর ভবিষ্যতে যে গৌরব আসিবে, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বোধ হয় তিনি তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। কবির মাতৃভাষার স্বপক্ষে সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী যুক্তিজাল আমাদিগের বিশেষ করিয়া অনুধাবন কর উচিত। বাংলা দেশে প্রায় শত বৎসর যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি, সে শিক্ষা শুধু বাহিরের জিনিষ হইয়া রহিল, আমাদিগের অন্তরকে স্পর্শ করিল না। বিদ্যার বিভিন্ন অঙ্গে আমাদের বুদ্ধি কোন ফলই উৎপাদন করিল না, ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়। কিন্তু এই পরিতাপের কারণ আমাদের শিক্ষা বিদেশীয়ভাষায় দেওয়ায় আমাদের দেহের শিরায় শিরায় ভাবসঞ্চালন করিতেছেনা। সে শুধু ক্ষণিকের যাদুর মত জ্বলিয়া নিভিয়া যাইতেছে।

কবি 'নব জীবনের' পর প্রণয়-রাগরক্ত উন্মত্ত-উচ্ছ্বাসের যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন। সে সব কবিতায় কবির দুরন্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রেমের ছাপ রহিয়া গেছে। প্রবাসে কবি যখন বীরের মত জীবনকে বরণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন গত জীবনের সমস্ত ক্লেদকে ধৌত করিয়া আপনাকে সুনির্ম্মল করিবেন, এই আশায় কবি তাহার চতুর্দ্দশটী কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। ইতালীর অভ্যুদয়ের মন্ত্রের উদ্ভাবনকারী ঋষি আপনার সমস্ত অকল্যাণ ও অসুন্দরকে কল্যাণে ও সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে চাহিলেন। কিন্তু সে প্রয়াস সর্ব্বাঙ্গীন অসম্পূর্ণতা পাইল না। কবি যদিও আপনাকে মালিন্যরাহুগ্রাস হইতে মুক্ত করিলেন, কিন্তু তাহার আরব্ধ ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল না। ভূমিকা ও কেবল তিনটী টীকা মাত্র লেখা হইয়াছিল। বিয়াত্রিচের মৃত্যুর পর কবি যে সকল দার্শনিক গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, তাহাদিগের প্রভাব এই গ্রন্থে বিশেষ রূপে পরিলক্ষিত হয়। বোয়েথিয়াস, আরিস্ততল, একুইনাস যে তত্ত্বকথা বলিয়াছেন, কবি অনুপম ভাষায় এই গ্রন্থে তাহার অনুপম রূপ দিয়াছেন। কবি তত্ত্বকথাকে বোয়েথিয়াসের অনুকরণে "করুণাময়ী মহিলা" রূপে চিত্রিত করিলেন ও বিয়াত্রিচকে তাহার সহিত মিলাইয়া দিলেন। যদি সমস্ত গ্রন্থ লেখা হইত, তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞ দান্তের নিকট আমরা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর য়ুরোপের সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বারের চাবি পাইতাম; কিন্তু তাহা হইল না। কর্ম্মসুবিপুল জীবনে কল্পনার চেয়ে কর্ম্মের ডাক ছিল বেশী। সম্রাটের আগমনে তাঁহার অদৃষ্ট নূতন পথে পরিচালিত হইবে বলিয়া কবি ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু, মহাজ্ঞানী দান্তেকেও ভাগ্যের ক্রুর পরিহাস সহিতে হইয়াছিল। প্রথম

ও দ্বিতীয় কবিতার টীকায় কবি তাঁহার জ্যোতির্বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন। জ্যোতিষ্কমণ্ডলের পরিভ্রমণ ও তাহাদিগের অধিষ্ঠিত দেবতাগণের সম্যক্ পরিচয় দিয়াছেন। মানুষের আত্মার স্বরূপ কি, কেমন করিয়া সোপানের পর সোপান আরোহণ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হইতে হয় তাহা ও প্রেমের শাশ্বত প্রভাব এবং চিররহস্যময় মাধুরী—কবি সুললিত ভাষায় সকলের পক্ষে সুগম করিয়াছেন। তৃতীয় কবিতার টীকায় আরিস্ততলের নীতি অবলম্বন করিয়া কবি সুন্দর নীতিশাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন। প্রীতি-মধুরতার সহিত বীরত্বের সম্বন্ধ, ধর্ম্ম কাহাকে বলে, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি, বিভিন্ন বয়সে মানুষের কি কি কর্ত্তব্য—কবি তাহার বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

ক্ষাত্র-ধর্ম্ম।

লেখক—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার, ভকিল।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কিন্তু সমাজগঠনে যদি উপরিউক্ত চারি বর্ণের বৃত্তিকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে রাখার সুবিধা না দিত, যদি একবর্ণ অন্য বর্ণের বৃত্তিতে অনভ্যস্ত না থাকিত, এককথায় যদি কোন বৃত্তি কোন বর্ণের একচেটিয়া বা monopoly হইয়া না দাঁড়াইত, তাহা হইলে বহিঃশত্রুর আক্রমণকালে দেশে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য তিন জাতিও যুদ্ধে অগ্রসর হইত। শত্রুর আক্রমণ রক্ষার জন্য একমাত্র ক্ষত্রিয়ের উপর নির্ভর করিতে হইত না; বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা যথেষ্ট পরিমাণে সম্ভব হইত। যদিচ কোন যুদ্ধে বিদেশী জয়লাভ করিতে সক্ষমও হইত, তথাপি একটী মাত্র যুদ্ধে সমগ্রদেশ কখনই তাহাদের পদানত হইয়া পড়িত না। নির্ব্বিবাদে দেশের ধনরত্নলুণ্ঠন তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। প্রতিইঞ্চি স্থান তাহাদিগকে যুদ্ধ করিয়া—দেশের সন্তানের রক্তে রঞ্জিত করিয়া তবে অধিকার করিতে

হইত। মুষ্টিমেয় ক্ষত্রিয়-সৈন্যকে জয় করিয়াই তাঁহারা সুফল পাইতেন না, দেশ দখল করিতে পারিতেন না, দেশে রাজত্ব স্থাপন করিতে পারিতেন না। এত বড় বিরাট্ ভারতের সমগ্র অধিবাসীর রক্তে স্নান না করিয়া মুষ্টিমেয় বিদেশী সৈন্য লইয়া দিল্লীর, ইন্দ্র-প্রস্থের বা কণৌজের সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারিতেন না! এই বর্ণবিভাগের কুফলে রাজশক্তি নির্ভরশীল ছিলেন তাঁহার সামান্য ক্ষত্রিয়-সৈন্যের উপর এবং সেই সৈন্য একবার পরাজিত হইলে, ছত্রভঙ্গ হইলে, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাজসিংহাসন ভূম্যবলুষ্ঠিত হইত। কিন্তু যদি ঐ রাজশক্তি সমগ্র চতুর্ব্বর্ণের উপর নির্ভরশীল হইতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণজাতির মধ্য হইতে কত দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্যর উদ্ভব হইত, বৈশ্যজাতির মধ্য হইতে কত সুতনন্দন কর্ণের মত বীরের উদ্ভব হইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না এবং একটী মাত্র ঘায়ে তাসের ঘরের মত রাজ-সিংহাসন ভাঙ্গিয়া পড়িত না।

এখন দেখা যাউক্, এই যে বর্ণবিভাগ, ইহা অন্যান্য দেশে কি ভাবে কার্য্য করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ ইংলণ্ডের কথাই ধরা যাউক্। ভারত-বর্ষের ন্যায় ইংলণ্ডেও চারিটী বর্ণ-বিভাগ দৃষ্ট হয় যথা—ধর্ম্মযাজক (Clergy-men) যোদ্ধা (Soldier) সদাগর (Merchant & firmar) মজুর (day labourer,) এই চারি সম্প্রদায় এতদ্দেশের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সমান এবং ঐ চারি বর্ণের বৃত্তিতে তাহারাও অধিকারী। বিগত মহাযুদ্ধে যখন জার্ম্মাণীর সঙ্গে ইংরাজকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তখন ইংলণ্ডের বেতনভোগী যোদ্ধৃগণকেই যে কেবল মাত্র যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল তাহা নহে। যদি ইংলণ্ডকে জার্ম্মাণীর সমরে কেবল মাত্র ঐ সকল যোদ্ধার উপর নির্ভর করিতে হইত, তাহা হইলে এতদিন হয়ত ইংলণ্ডের অস্তিত্ব সাগরগর্ভে বিলীন হইত। এই মহাযুদ্ধের হোতা ছিলেন কাহারা? উপরিউক্ত চতুর্ব্বর্ণের মানবমণ্ডলী। রাজাদেশে কি ধর্ম্মযাজক, কি সদাগর, কি মজুর সকলের মধ্য হইতে উপযুক্ত সক্ষম লোককে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে এই তিন জাতি ভারতের ন্যায় ক্ষত্রিয়বৃত্তিতে বিমুখ ছিলেন না। বৃত্তি বর্ণগত না থাকায় মহাসমরে ইংলণ্ড জয়লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু ভারতের মত যদি কোন বর্ণের বৃত্তি কেবল মাত্র সেই বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে যে ইংলণ্ডের দশা কি হইত তাহা অনুমান করা বিশেষ

বৃদ্ধিসাপেক্ষ নহে। এতদ্ভিন্ন, ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতে ভারতবর্ষ, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া হইতেও সৈন্য গিয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ—জাপানের দিকে দৃষ্টি করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? জাপানেও ভারতবর্ষের ন্যায় চারিটী বর্ণ ছিল এবং ভারতবর্ষের ন্যায় ঐ চারি বর্ণের বৃত্তি স্বীয় স্বীয় বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। জাপানে ক্ষত্রিয়-জাতির নাম ছিল সামুরাই (Samurai) বা সংগ্রামশীল জাতি। যুদ্ধ-বিদ্যা ছিল এই জাতির ধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের একচেটিয়া; অন্য জাতি যুদ্ধবিদ্যার ধার ধারিত না। ফলে দেশরক্ষার জন্য রাজশক্তি নির্ভরশীল ছিল ঐ একমাত্র সামুরাই জাতির উপর এবং তাহারাও ভারতের ক্ষত্রিয়জাতির ন্যায় অহঙ্কারী ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জাপানের রাজা মিকাডো ইহা লক্ষ্য করিয়া ছিলেন। জাপানের সৌভাগ্য ক্রমে ঐ সময় তাহার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এক সর্ব্বদর্শী, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ নরপতি। তিনি চতুর্ব্বর্ণের গণ্ডীচ্ছেদ করিয়া, এই বর্ণবিভাগানুযায়ী যে বৃত্তি ছিল, তাহা সর্ব্ববর্ণের মধ্যে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম সামুরাই ভিন্ন অন্য জাতি হইতেও সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন—তিনিই সর্ব্বপ্রথম army open to all castes নীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনিই প্রাথমিক শিক্ষার ন্যায় যুদ্ধ-বিদ্যা সর্ব্বজাতির অবশ্যশিক্ষণীয় করিয়াছিলেন। ফলে জাপানের ক্ষাত্র-শক্তি প্রাবল্য লাভ করিয়াছিল। দেশ মধ্যে ক্ষাত্র শক্তি জাগরূক হওয়ায় এবং সামুরাই জাতির গণ্ডিভেদ করায় অন্যান্য জাতিও উৎসাহিত হইয়া প্রবল বেগে উন্নতির পথে ধাবমান হইয়াছিল; ফলে দেশে ক্ষাত্র শক্তি, ব্রাহ্মণ্য-শক্তি ও বৈশ্য-শক্তি সকল শক্তিই প্রবুদ্ধ হওয়ায় দেশ সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল এবং কবি হেমচন্দ্রের "অসভ্য জাপান" ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সুসভ্য, উন্নতিশীল ও প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বৃত্তি বর্ণানুযায়ী হওয়ায় যে কুফল ফলিয়াছিল, মিকাডোর বিচক্ষণতায় তাহা দূরীভূত হওয়ায় দেশ জাগ্রত হইয়াছিল। ভারতে কি এমন কেহ নাই যে মিকাডোর ন্যায় দেশকে প্রবুদ্ধ করিতে—জাগরূক করিতে সক্ষম হয়েন?

এখন দেখা যাউক্ ভারতের এই যে অধঃপতন, ইহা কি ভাবে সংঘটিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—উপরিউক্ত চতুর্ব্বর্ণের বৃত্তি সেই সেই বর্ণগত হইয়া পড়ায় এইরূপ কুফল প্রসব করিয়াছে। ব্রাহ্মণ কেবল মাত্র

অধ্যয়ন, যজন, যাজনাদি লইয়া থাকায় এবং আত্মরক্ষা, ধনোপার্জ্জন প্রভৃতি অন্য তিন জাতির বৃত্তির সাধনা না করায় দুর্ব্বল, দরিদ্র ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে তাঁহাদের বর্ণগত বৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন বৃত্তির সাধনা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। যদিচ বর্ত্তমানে তাঁহারা দারিদ্রের তাড়নায় ধনোপার্জ্জনে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তথাপি তাঁহারা উক্ত গণ্ডী ভেদ করিয়া চতুর্ব্বর্ণের বৃত্তি সমূহের সাধনা যে চতুর্ব্বর্ণের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য, তাহা স্বীকার করিতে উৎসুক নহেন। ফলে জাতির মধ্যে একটা বিশৃঙ্খল ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। চতুর্ব্বর্ণ ভেদ করিয়া বহু সহস্র জাতির উদ্ভব হইয়াছে। তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট স্থান নিরূপণ জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে শ্লোকের পর শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। চতুর্ব্বর্ণকে ভাঙ্গিয়া পিশিয়া মুছিয়া ফেলিয়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য তিন বর্ণকে একমাত্র শূদ্র আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে; এবং অনুলোম প্রতিলোম প্রভৃতি বিবাহের কল্পনা করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া এই আখ্যাত শূদ্র জাতি হইতে বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি সমাজে খাড়া করা হইয়াছে। বিভিন্ন ব্যবসায় হইতে যে বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি নামকরণ বা সৃষ্টি হইয়াছে, ধর্ম্মগ্রন্থের দোহাই দিয়া, এই সহজ সরল পথ লোকের চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার প্রচেষ্টার ফলে জাতিভেদ বাড়িয়া চলিয়াছে। এক জাতি অন্য জাতিকে ঘৃণা, ঈর্ষ্যা ও অবিশ্বাসের চক্ষে দর্শন করিতেছে। কোন্ জাতি বড়, কোন্ জাতি ছোট, কে জলাচরণীয়, কে অন্ত্যজ—ইহা লইয়া বিবাদ বাধিতেছে, দলাদলি ঘটিতেছে। বিবাহপ্রথা অসংযত হওয়ায় বহু অনূঢ়া ও বহু বিধবার সৃষ্টি হইতেছে। শিশু ও বালিকা-বিবাহ, বিবাহে বর ও কন্যাপণ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বহু পুরুষ অবিবাহিত ও বহু যুবতী অনূঢ়া থাকিয়া এবং বহু স্ত্রীলোক অল্পবয়সে বিধবা হইয়া পাপপথের পথিক হইতেছে। বিবাহে ব্যভিচার ঘটিতেছে। এই জাতিভেদের ফলে দেশ দুর্ব্বল, শতধা বিভক্ত, অকর্ম্মণ্য ও আলস্য-পরায়ণ হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ বহু জাতিতে বিভক্ত না হইয়া যদি চতুর্ব্বর্ণ পরস্পর পরস্পরের বৃত্তিতে উদাসীন না হইতেন, একে অন্যের বৃত্তিকে ঘৃণা বা ঈর্ষার চক্ষে না দেখিতেন, সকলেই এই বৃত্তি চতুষ্টয়ের সাধনা করিতেন, তাহা হইলে কখন ভারত পরাধীন হইত না।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই যে বিভাগ—ইহা জাতির বিভাগ নহে

মানবের গুণ বা ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা, ক্ষত্রিয় দ্বারা বিদ্যা, বৈশ্য দ্বারা ধনোপার্জ্জন ও শূদ্রের দ্বারা সেবা-ধর্ম্ম সূচিত হইতেছে। সমাজের প্রথমাবস্থায় ব্যক্তির গুণ বা ধর্ম্ম (inclination বা taste) অনুসারে যে যে কার্য্যে ব্রতী হইত, তাহাকে সেইরূপ আখ্যা প্রদান করা হইত। যেমন কোন এক ব্যক্তির চারিটী পুত্র, তাহার একটী ব্রহ্মবিদ্যা, একটী যুদ্ধবিদ্যা একটী কৃষি বা ব্যবসায় এবং একটী মুটেরীর কার্য্য অনুশীলন করিত, তাহার একটী ব্রাহ্মণ, একটী ক্ষত্রিয়, একটী বৈশ্য ও অন্য শূদ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইত। ক্রমে ইহা ভারতের মাটির গুণে বংশগত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল এবং হিন্দুজাতির পতনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাম লোপ পাইয়া সকলে শূদ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বারুজীবিজাতি যদিচ বৈশ্যবর্ণান্তর্গত—কারণ তাহাদের প্রধান ধর্ম্ম কৃষি ও বাণিজ্য—এককথায় ধনোপার্জ্জন, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাদিগকে অন্য তিন বর্ণের বৃত্তি ভুলিলে চলিবে না। ব্রাহ্মণের ন্যায় অধ্যয়ন, ব্রহ্ম-বিদ্যালাভের প্রচেষ্টা, ক্ষত্রিয়ের ন্যায় যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা বা শারীরিক বলের উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টাও তাহাদিগকে করিতে হইবে এবং শূদ্রের সেবা-ধর্ম্মেরও অনুশীলন করিতে হইবে,—এক কথায় চতুর্ব্বর্ণের বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন অনুশীলন করিতে হইবে। আজকাল ক্ষত্রিয়-বৃত্তির অনুশীলন বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আত্মরক্ষা, পরিবার পরিজন ও ধনরত্ন—রক্ষা অসম্ভব। গ্রামে গ্রামে কুস্তির আখড়া, ব্যায়ামের সমিতি সংগঠন করিতে হইবে। সন্তান-সন্ততিগণকে শৈশব হইতে শরীররক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে। সকলে হয় ত কুস্তিগির পালোয়ান বা স্যাণ্ডোর ন্যায় বলশালী না হইতে পারেন, কিন্তু ব্যায়ামকৌশল-শিক্ষা সকলের পক্ষে অসম্ভব নহে। ব্যায়াম-কৌশল অভ্যস্ত হইলে, অতিশয় বলবান্ লোকের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা সুসাধ্য হয়। জাপানে একরূপ ক্রীড়া আছে, তাহার নাম জুজুৎসু। ইহার কৌশল অতি সুন্দর। জুজুৎসু শিক্ষা করিলে একজন দুর্ব্বল লোকও অতি সহজে একজন বলবান্ লোককে ধরাশায়ী করিতে সমর্থ হয়। মানবশরীরে কতগুলি মর্ম্মস্থল, সেই সব মর্ম্মস্থল কোথায় আছে এবং কি ভাবে ঐ ঐ স্থানে আক্রমণ করিলে শত্রুকে বিপদাপন্ন করা যায়, তাহার কৌশল-শিক্ষা জুজুৎসুর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ব্যায়াম-শিক্ষা দ্বারা শরীরকে যেমন বলশালী ও কর্ম্মঠ করা যায়, তেমন ব্যায়ামের

কৌশল জানা থাকিলে নিজের অপেক্ষা অধিক বলশালী লোকের হস্ত হইতেও সহজে আত্মরক্ষা করা যায়! বলের আরাধনা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাতে আর দ্বিমত থাকিতে পারে না। ছান্দোগ্যোপনিষদে এই কথাটী অতি সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে:—

"বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ভুয়োপি হ শতং
বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়তে।"

বারুজীবিজাতির মধ্যে কোন কোন স্থানে ব্যায়াম ও কুস্তির আখড়া গঠিত হইয়াছে জানাইলে বৈশ্য-বারুজীবি-সভা হইতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য সাহায্য প্রদান করা যাইবে।

সেক্রেটারী, বৈশ্য-বারুজীবি-সভা।

হিন্দু জাতির দুর্দ্দশা।

লেখক—(জনৈক হিন্দু)

হিন্দুজাতির দুর্দ্দশা বহুকাল হইতে আরব্ধ হইয়াছে। সেকন্দর বাদশাহ যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তাহার বহুপূর্ব্ব হইতে হিন্দুজাতির দুর্দ্দশার আরম্ভ হইয়াছে। সেকন্দর বাদশাহের আগমনের বহু পূর্ব্বেই বাহ্লীক, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, যাহা প্রাচীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহা পারশ্যরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এমন কি, পঞ্জাব পর্য্যন্ত পারশ্যরাজ্যের অধীন হইয়াছিল। জেন্দ-ভেস্থ গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, হপ্ত হীন্দ (সপ্তসিন্ধু) অর্থাৎ পঞ্জাব বা পঞ্চনদ প্রদেশ পারশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সেকন্দর পারশ্যদেশ জয় করিয়া বিজয়সূত্রে পারশ্যাধিপতি হয়েন। বাহ্লীক (Bactria) আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও পাঞ্জাব পারশ্যরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়াই সেকন্দর পারশ্যসম্রাটের স্থলাভিষিক্ত স্বরূপ ঐ সমস্ত প্রদেশ দাবী করেন এবং তাঁহার দাবী সামন্ত-রাজন্যবর্গের দ্বারা স্বীকৃত না হইলে তাহাদিগকে বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিতে প্রস্তুত হয়েন।

এই সময়েও আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান বাহ্লীক দেশ সমূহে হিন্দু ও বৌদ্ধ এবং অল্পসংখ্যক প্রাচীনপারসীকধর্ম্মান্তর্গত অগ্নির উপাসক বাস করিতেন। তাঁহারা সকলেই আর্য্যবংশসম্ভূত ছিলেন। সেকেন্দর শাহ গ্রীক্ জাতীয় আর্য্য-বংশসম্ভূত! সুতরাং হিন্দুদিগের সহিত তাঁহাদের আচার ব্যবহার, এবং ধর্ম্মের প্রভেদ খুব কম ছিল।

সেকেন্দর শাহ আফগানিস্থান, বাহ্লীক, বেলুচিস্থান হইতে কোন বাধা প্রাপ্ত হন নাই। পাঞ্জাবে আসিয়াও গান্ধারের অধিপতির নিকট হইতে বাধা প্রাপ্ত হন নাই। তৎকালীন গান্ধারের অধিপতি, তাঁহাকে পারশ্যসম্রাটের স্থলাভিষিক্ত স্বীকার করিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন এবং সামন্ত-মত ব্যবহারে তাঁহাকে আপ্যায়িত করেন, কিন্তু মহারাজা পুরু এবং ঐ প্রদেশস্থ অন্যান্য রাজন্যবর্গ সেকন্দারের অধীনতা স্বীকার করিতে অসমর্থ হওয়ায় পুরু এবং তাঁহার সাহায্যকারী রাজন্যবর্গ পরাভূত হয়েন।

পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায় যে—

১। যুদ্ধবিদ্যায় ভারতবাসীর অজ্ঞতা। ভারতবর্ষে চতুরঙ্গ—সেনার ব্যবস্থা ছিল। (চারিটি অঙ্গ—হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক) অর্থাৎ যাহারা পদস্থ তাঁহারা রথে চড়িয়া লড়াই করিতেন, তৎপরে হাতীতে, কেহ ঘোড়ায় কেহ বা মাটীতে দাঁড়াইয়া লড়াই করিতেন। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে এই চতুরঙ্গ—সেনার উল্লেখ দেখা যায়। চতুরঙ্গসেনার প্রচলন বহুদিন ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছিল। সেকেন্দরের সময় রথের ব্যবহার পাওয়া যায় না, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক দৃষ্ট হয়। হাতীর লড়াই বড় বিপজ্জনক। হাতী একবার ভয় পাইলে এরূপ দৌড় দেয় যে তাহাকে সংযত করা কঠিন। এই হাতীর লড়াই ভারতবর্ষে দুর্দ্দশার একটী কারণ। মহারাজা পুরু এই হাতীর জন্য যুদ্ধে হারিয়াছিলেন। ভারতের পশ্চাদ্-বর্ত্তী ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, হাতীর লড়াই ভারতবর্ষে একটী বিশেষ বিপদের কারণ হইয়াছিল।

২। প্রাচীন ভারতের নিয়ম ছিল যে যুদ্ধে পলায়ন কাপুরুষতা, এবং যুদ্ধে যাহারা পলায়ন করে তাহাদের নরকপ্রাপ্তি হয়; সম্মুখ সমরে যাহারা প্রাণ ত্যাগ করে তাহারা স্বর্গে যায়। মেঘনাদবধ-কাব্যে মহাকবি মধু-সুদন "পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা" এই বর্ণনা দ্বারা বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া ভয়ের জন্য পলায়ন করা যে নিতান্ত কাপুরুষতা সে

বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু retreat বা পশ্চাৎ গমন বলিয়া যে যুদ্ধকৌশল আছে তাহার ব্যবহার ভারতবর্ষ জানিত না এবং retreatএ যে কাপুরুষতা নাই তাহা ভারতবর্ষ বুঝিত না। তজ্জন্যেই ভারতবর্ষের ভাগ্যলক্ষ্মী অনেক সময়ে একটী যুদ্ধের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইয়া যাইত। এই যে সেদিন বেলজিয়ম প্রদেশ জার্ম্মানবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হইল; তখন ভারতবর্ষের নীতি অনুসরণ করিলে বেলজিয়ম জার্ম্মানদেশের অধীন হইয়া যাইত। বহুসংখ্যক শিক্ষিত সৈন্যের সম্মুখে অল্পসংখ্যক সৈন্য উপস্থিত করিলে ধ্বংস একরূপ সুনিশ্চিত। বেলজিয়ম যখন দেখিলেন যে সম্মুখ-সমরে জার্ম্মানীর সহিত প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব, তখন বেলজিয়মের রাজা সসৈন্য রাজ্যের বাহিরে গিয়া শক্তি-বৃদ্ধির চেষ্টা করিলেন এবং কৃতকার্য্য হইলেন। প্রবল শত্রুর সহিত সম্মুখ সমর বা যুদ্ধে অপলায়ন—এই নীতি সমীচীন নহে। ছত্রপতি শিবাজী ইহা বুঝিয়াছিলেন এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। প্রাচীন শাস্ত্রোনুমোদিত যুদ্ধে তিনি কখনও ওরংজেবের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না।

৩। কোন বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে যুদ্ধকার্য্য সীমাবদ্ধ। যে দেশেই যুদ্ধকার্য্য কোন বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ করা যায়, সে দেশ তখনই বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়। ভারত-বর্ষে যখনই যুদ্ধকার্য্য ক্ষত্রিয়-নামধারী শ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ হইল, তখনই একবার ভাবী বিপদের বীজ উপ্ত হইল। একই শ্রেণীর মধ্যে দেশরক্ষার ভার নিবদ্ধ হওয়ায় অন্যান্য শ্রেণীরা তদ্বিষয়ে উদাসীন হইলেন। ক্ষত্রিয়েরাও দেশরক্ষার কর্ত্তা বলিয়া আপনারা অত্যন্ত অহঙ্কার আরম্ভ করিলেন। সমাজে অশান্তি ও বিরোধ উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল। একতার অভাব হইল এবং দেশ আক্রান্ত হইলে পরস্পর সাহায্য করা দূরে থাকুক পরস্পরকে অপদস্থ করার চেষ্টা বলবতী হইতে থাকিল। সমস্ত ক্ষমতা ক্ষত্রিয়দের হাতে যাওয়ায় তাঁহারাও ক্রমে বিলাসী হইয়া উঠিলেন এবং স্বীয় ব্যবসায়ে ক্রমে অদক্ষ হইয়া পড়িলেন। এই অসুবিধার নিরাকরণার্থ পঞ্জাবপ্রদেশে দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ সকল শ্রেণীকেই যুদ্ধকার্য্যের অধিকার দিয়াছিলেন। তাহার ফলও হাতে হাতে ফলিয়াছিল। মহারাজা রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর কেন পাঞ্জাব ইংরাজদিগের নিকট হারিয়াছিল, তাহা এস্থলে বিবৃত করা সম্ভব নহে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাহার কারণ পারিবারিক কলহ।

৪। অশ্বমেধযজ্ঞ। ভারতপতনের অন্যতম একটী কারণ অশ্বমেধ যজ্ঞ-প্রথা। ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রাজা ছিলেন। কোন কোন রাজা প্রজার দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন, কেহ কেহ উত্তরাধিকার-সূত্রে রাজ-সিংহাসন পাইতেন। সামন্ত রাজাদিগের উপরে যে রাজা থাকিতেন, তাঁহাকে রাজরাজচক্রবর্ত্তী বা সর্ব্বভৌম রাজা বলা হইত। যিনি সার্ব্বভৌম রাজা হইতে চাহিতেন, তাঁহারই অশ্বমেধযজ্ঞ করিবার প্রয়োজন হইত। একটি অশ্ব চারিদিকে লইয়া যাওয়া হইত। অশ্ব না ধরাই হইল অধীনতা-স্বীকার, আর অশ্ব ধরিলেই যুদ্ধ বাধিয়া যাইত। যখন কোন সামন্ত রাজা ধন সঞ্চয় করিতে পারিতেন, এবং সৈন্য বৃদ্ধি করিতে পারিতেন, তিনি তখন অশ্বমেধের অভিলাষী হইতেন। এই অশ্বমেধ দেশমধ্যে একটী স্থায়ী অশান্তি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল।

৫। বর্ণভেদ:— বর্ণভেদ যাহা আজকাল জাতিভেদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহাও ভারতবর্ষের একটী দুর্দ্দশার কারণ হইয়াছিল। পশুদের মধ্যে বর্ণভেদ দেখা যায়—কিন্তু বর্ণভেদ-হেতু তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ দৃষ্ট হয় না। ভিন্ন বর্ণের গো, অশ্ব, বিড়াল পরিদৃষ্ট হয়। শ্বেত, লোহিত, কৃষ্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণের অশ্বের পরস্পরের মধ্যে মিলনের অভাব দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য জন্তুর মধ্যেও বর্ণভেদ-হেতু কোন বিদ্বেষ পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু জানিনা কি কারণে বর্ণভেদই মানুষের মধ্যে বিদ্বেষের একটী প্রধান কারণ হইয়াছে, এবং এই বর্ণভেদজনিত বিদ্বেষ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যখন শ্বেতবর্ণের আর্য্যজাতি কৃষ্ণবর্ণের সংস্রবে আসেন, তখনই একটী সামাজিক গণ্ডগোলের সূচনা হয়। শ্বেতকৃষ্ণাদি-বর্ণের বিবাদ এখনও পৃথিবীর মধ্যে চলিতেছে। এমেরিকার আদিম অধিবাসী তাম্রবর্ণ। য়ুরোপ-খণ্ডের জাতি সমূহ শ্বেতবর্ণ। চীনা, জাপানী প্রভৃতি জাতিরা পীতবর্ণ। এফ্রিকার জাতি সমূহ কৃষ্ণবর্ণ। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীরা শ্বেতবর্ণ এবং দ্রাবিড় বা তামিল জাতি কৃষ্ণবর্ণ। ভারতবর্ষে অন্যান্য অনেক জাতিই ছিল যেমন নাগ প্রভৃতি। এই নাগজাতি চীনজাতি বলিয়া বোধ হয়। আর্য্যদিগের সহিত ভারতবর্ষীয় নাগজাতি, দ্রাবিড়জাতি এবং অন্যান্য জাতির সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ক্রমে সমস্ত জাতিই আর্য্যসভ্যতা গ্রহণ করে। যখন আর্য্যেতর জাতিসমূহ আর্য্য সভ্যতা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে, তখন বর্ত্তমানে যাহাকে জাতিভেদ বলে তাহা ছিল না। মানুষের স্বীয় স্বীয় গুণানুসারে তাহারা

সমাজে সম্মান নির্ণীত হইত। এই সময় ভারতের উন্নতির সময় ছিল। কিন্তু যখন ভারতে কাল্পনিক শ্রেষ্ঠত্ব অশ্রেষ্ঠত্বের বিধান উপস্থিত হইল, তখনই ভারতবর্ষের পতনের সময় আসিল। বহুকাল পূর্ব্বে ভারতের যে পতন হইয়াছে সেই পতনই আছে আর উত্থান হয় নাই। হিন্দু-সমাজ এখন সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত। পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ বহ্নি এতই প্রজ্বলিত যে তাহা সমাজকে একেবারে ভস্মসাৎ করিতে উপক্রম করিয়াছে। নিম্নবর্ণের জাতিদিগকে যে প্রকারে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহারা এখন তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টায় আছে। সমাজ নূতন করিয়া গঠন না করিলে আর চলিবে না।

সমাজের নূতন গঠন।

হিন্দু-সমাজ হইতে অযৌক্তিক জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক মানুষকেই তাহার গুণানুসারে সমাজে স্থান দিতে হইবে, তাহা হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। যে সব দেশে জাতিভেদ নাই, সে সব দেশেও ছোট বড় আছে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যাহারা ছোট, তাহাদিগের বড় হইবার বাধা নাই। হিন্দু-সমাজেও তাহাই করিতে হইবে। জল অনাচরণীয়তা একেবারে দূর করিতে হইবে। শারীরিক শৌচ থাকিলে কাহারও প্রদত্ত জলপানে বাধা থাকিবেনা। হিন্দুজাতির উন্নতির সময় ভোজ্যান্নের এত খুটী-নাটী বিচার ছিল না। ব্রহ্মাগ্নি, ব্রহ্মহবি, ব্রহ্মার্পণ ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা সমস্ত অন্নই শোধিত করা যাইতে পারিত। বাহ্যশৌচ থাকিলে সকল অন্নই গ্রহণ করা যাইতে পারিত। দেবালয় প্রভৃতি হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা হইত না। সকল জাতিকেই হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করা যাইতে পারিত। সকল জাতিকেই বেদ শিখান যাইতে পারিত। নিম্নবর্ণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য কেহ পতিত হইত না। যেই খুটি-নাটি আরম্ভ হইল, সেই হিন্দু-সমাজের দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। খুটি-নাটি পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু-সমাজকে বৈদিক যুগের ধর্ম্মে যাইতে হইবে। তাহা না হইলে ইহার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপত্তি।

অনুবাদক—শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম এ, বি এল বিদ্যানিধি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'নির্ব্বাণ' এই শব্দটী দ্বারা বুদ্ধ কি লক্ষ্য করিতেন—এতৎসম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ তর্কজালের ভূয়সী অবতারণা হইতে দেখা গিয়াছে। 'নির্ব্বাণ' শব্দের অর্থ কি নিত্যসত্তা, না সত্তার শাশ্বতিক অভাব? এই বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই স্বাধীন মত আদরণীয় বটে, কিন্তু আমার মতে এই 'নির্ব্বাণ' শব্দটীর অর্থ প্রতিপাদন করিতে যাহারা আগ্রহান্বিত, তাঁহাদের কেবল বৌদ্ধ-সাহিত্যের আলোচনা না করিয়া, বৌদ্ধযুগের পৌর্ব্বিকালিক সাহিত্যেরও পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক, যেহেতু খৃষ্টানদিগের 'নিউ টেষ্টামেণ্ট' বুঝিতে হইলে যেরূপ 'ওল্‌ড টেষ্টামেণ্ট'এর আলোচনা অপরিহার্য্য, তদ্রূপ বুদ্ধের নীতিতত্ত্ব ও দার্শনিক গবেষণা গুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বৌদ্ধযুগের পৌর্ব্বকালিক সাহিত্যের অনুশীলন একান্ত আবশ্যক।

বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী সংস্কৃতভাষায় পারদর্শী ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা যখন পালিভাষায় আত্মন্, ব্রহ্মন্, নির্ব্বাণ প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক শব্দ ব্যবহার করিতেন, তখন তাঁহারা যে ঐ সকল শব্দ তাহাদের প্রচলিত অর্থেই ব্যবহার করিতেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। প্রাচীন ও আধুনিক উভয়যুগের সংস্কৃতভাষায়ই 'নির্ব্বাণ' শব্দটী জড়জগৎ হইতে চরম মুক্তি ও পরমাত্মার সহিত পুনর্মিলন এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং বুদ্ধ যে এই অর্থ গ্রহণ না করিয়া ঐ সংস্কৃতমূলক শব্দটী আত্যন্তিক ধ্বংস বা সম্পূর্ণ বিলুপ্তি অর্থে প্রয়োগ করিবেন তাহা স্বাভাবিক নহে। নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ ধ্বংস নহে, ইহার অর্থ চরম সত্যের বা পরমাত্মার প্রণাশ নহে, ইহার অর্থ ব্যক্তিত্বের বিলুপ্তি বা জীবাত্মার বিনাশ।

বুদ্ধের মতে যে সদ্‌ধারণা, সৎচিন্তা, সদ্‌বাক্য, সৎকর্ম্ম, সজ্জীবিকা, সৎপ্রচেষ্টা, সন্‌মনন ও সদ্‌ধ্যান দ্বারাই নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারা যায়

বুদ্ধের পৌর্ব্বকালিক যুগে ঐ সদ্ধারণা, সৎচিন্তা প্রভৃতিই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সুতরাং বুদ্ধের নির্ব্বাণ—প্রাপ্তির উপায় ও বুদ্ধের পৌর্ব্বকালিক যুগের মোক্ষলাভের উপায় এই উভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। যাহা মোক্ষের স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই শাশ্বত সুখ বেদনার নিরাস, শান্তির আধার, সত্তাজলধির পরপারের অপার্থিব অরূপ শান্তভাব; সেই সত্য অসীম, অনির্ব্বচনীয় অনাদি অনন্তই বুদ্ধের নির্ব্বাণের স্বরূপ। তথাপি প্রতীচ্য পণ্ডিতেরা বলিতে চাহেন, বুদ্ধের নির্ব্বাণ শব্দটীর দ্বারা ধ্বংস বা প্রণাশ পরিলক্ষিত হইতেছে।

জনসাধারণে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করিবে ইহা ভগবান্ বুদ্ধের অভিপ্রায় ছিল না; তাঁহার মতে সাধারণ লোকের পক্ষে তাঁহার প্রদর্শিত মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া চলাই বিধেয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতায় এই মধ্যপন্থার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বুদ্ধ যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন সুভদ্রা বুদ্ধকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"ষড়্‌দর্শনের পণ্ডিতগণ কি সকলেই সকল প্রকার ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন, অথবা কেহ কেহ কোন কোন ব্যবস্থায় অনভিজ্ঞ বা অল্পাভিজ্ঞ ছিলেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন,—'বর্ত্তমান সময়ে এই বিষয় আলোচনা করিবার অবকাশ নাই। যিনি প্রকৃত জ্ঞানী তিনি মৎপ্রদর্শিত পন্থাই একমাত্র পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিবেন। সুভদ্রা, যে বিষয়ে উনত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে অদ্যাবধি আমি স্বয়ং অভিজ্ঞতা লাভ করি নাই, এমন কোনও বিষয়ে আমি তোমাকে কোনও কথা বলিব না। আমি শুদ্ধ ও পূর্ণ জ্ঞানের উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হইয়াছিলাম এবং সৎপন্থা অবলম্বন করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছি।' এই যে নির্ব্বাণের কথা বুদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা কি ভাবাত্মক না অভাবাত্মক। উদীচ্য বৌদ্ধগণ বলেন, ইহা ভাবাত্মক; দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধগণের মতে ইহা অভাবাত্মক।

আমি আমাকে বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষজ্ঞ বলিয়া ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু আমার এই অনুরোধ যে, আমার সোদরপ্রতিম ধর্ম্মপাল যিনি কলিকাতায় আসিবার পর হইতেই আমার সহিত সুপরিচিত হইয়াছেন, সেই ধর্ম্মপালের বন্ধু শ্রমণ সিদ্ধার্থ—যিনি সিংহলের ভবিষ্য প্রধান ধর্ম্মযাজক এবং যাঁহাকে আমরা সকলেই বঙ্গদেশের রাজা সিংহবাহুর জ্ঞাতিরূপে আমাদের দেশে অভিনন্দিত করিতেছি তিনি এবং ধর্ম্মপালের অন্যান্য বন্ধুগণ ও তাঁহার অনুগত অনুবর্ত্তিগণ—খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে সিংহলে যাঁহাদের উপনিবেশ

স্থাপিত হইয়াছে এবং যাহারা ভগবান্ বুদ্ধের প্রচারিত সুমহৎ তথ্যগুলির বহুলপ্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা পাঠ করুন, তাহা হইলে তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে, হিন্দুধর্ম্মের ও বৌদ্ধধর্ম্মের কর্ম্মসম্বন্ধিনী ব্যবস্থা একই এবং উভয় ধর্ম্মের ভেদ কেবল অসারবিষয়ক, উভয়ধর্ম্মের মধ্যে বাস্তব কোন ভেদ নাই। আমি এই বিষয়টী আমার 'বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ' নামক প্রবন্ধে প্রতিপাদিত করিবার প্রয়াস করিয়াছি। উক্ত প্রবন্ধে সন্নিবদ্ধ তর্কজালের পুনরুল্লেখ করিবার ইচ্ছা আমার নাই; কিন্তু জিজ্ঞাসুদিগের জন্য আমি এই প্রবন্ধের সহিত উক্ত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ করিতে কুণ্ঠিত হইব না। এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে বুদ্ধের 'অনাত্মবাদ' ও বেদান্তের 'জীবাত্মার অস্বাতন্ত্র্যবাদ' মূলতঃ বিভিন্ন নহে।

বুদ্ধের সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা এই যে, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ অসুরদিগকে বিপথে লইবার জন্যেই বুদ্ধরূপে নবম অবতার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অসুরগণও ত ভগবানেরই সৃষ্টি! তাহা হইলে ভগবান্ কি এতই নীচ যে তিনি অসুরদিগকে বিপথে লইয়া যাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন না? আমি আমার 'রিলিজিয়ন্ অব্ লভ্' বা 'প্রেমের ধর্ম্ম' নামক গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছি যে, হিন্দুদিগের দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি তাঁহাদের জীবনের উচ্চতর ও বিশুদ্ধতর স্তরে উপনীত হইবার আদর্শ স্বরূপ। বুদ্ধও হিন্দুদিগের জীবনের আদর্শ স্বরূপ; যেহেতু তিনি হিন্দুদিগের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ও বিজ্ঞতম পুরুষ বলিয়া পরিগণিত। বুদ্ধ হিন্দুপরিবারে জন্মলাভ করিয়া হিন্দুভাবেই লালিত পালিত হইয়াছিলেন এবং হিন্দুভাব লইয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; এরূপ অবস্থায় হিন্দুমন্দিরে অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তির পার্শ্বে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া হিন্দুর নিকট বিহিত ভক্তি ও পূজা লাভ করিতে না পারিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। অন্যান্য দেব দেবীর ন্যায় বুদ্ধও হিন্দুজীবনের আদর্শ—সত্যের আদর্শ, সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেমের আদর্শ, সর্ব্বভূতে দয়ার আদর্শ। হিন্দুদিগের অন্যান্য দেবদেবীর অর্চ্চনার ন্যায় বুদ্ধের অর্চ্চনারও পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহার শাস্ত্রীয় বচনও আছে। যাঁহারা এই পদ্ধতি ও তাহার শাস্ত্রীয় বচন অবগত হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা দয়া করিয়া আমার নিকট পত্র লিখিলেই

সবিস্তর জানিতে পারিবেন। যদি আমরা আমাদের অতীত গৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে বাসনা করি, তাহা হইলে সততই আমাদিগকে বুদ্ধের ন্যায় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" ইহা ব্যক্তির পক্ষে যেরূপ প্রযোজ্য জাতির পক্ষেও তদ্রূপ।

বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতের যে গৌরব ছিল, বৌদ্ধযুগে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বুদ্ধের পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম কেবল ভারতের চতুঃসীমায়ই আবদ্ধ ছিল, তাহা বৌদ্ধপ্রচারকগণ ভারতের বাহিরে অনেক সূদূর দেশে প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ সকল দেশের অধিবাসিগণ আমাদের অযোগ্যতা-নিবন্ধন আমাদিগকে সম্মানার্হ বোধ না করিলেও আমাদের ভারতবর্ষকে অদ্যাপি পুণ্য-ভূমি বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য-ভাগ হইতে বৌদ্ধযুগ আরম্ভ হয় এবং ঐ যুগের মহিমা সপ্তশতাধিক সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত সংরক্ষিত হইয়াছিল। এমন কি, মধ্যে মধ্যে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম রাষ্ট্রীয়-ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত না, তখনও উহা জনসাধারণের ধর্ম্মরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। পরিশেষে খৃষ্টাব্দীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম তাহার উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত হইল এবং যে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের চরম অভ্যুদয় হইয়াছিল সেই বঙ্গদেশ হইতেও উহা বিলুপ্ত হইয়া গেল।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের কারণ কি? এতৎ সম্বন্ধে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে 'ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্' যাহা বলিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।'বুদ্ধের ভজন তাহার প্রভবস্থান ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত হইয়াছে কেন--এই বিষয়ে অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন এবং অনেকেই এ বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়াছেন। কিয়দ্দিন পূর্ব্বেও অনেকেই সাধারণতঃ এই ধারণার বশবর্ত্তী ছিলেন যে, ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু এই ধারণা সমীচীন নহে। কখনও কখনও শশাঙ্ক প্রমুখ হিন্দুরাজাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে ও সাময়িক অত্যাচার করিতে দেখা গিয়াছে; কিন্তু এই অভিযান ও অত্যাচার ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের মুখ্য কারণ নহে। হিন্দুর অত্যাচার অপেক্ষা স্থানে স্থানে মুসলমান আক্রমণকারী দিগের দ্বারা সংঘটিত বীভৎস হত্যাকাণ্ডই অনেক স্থান হইতে বৌদ্ধধর্ম্মকে অপসারিত করিবার বলবত্তর কারণ হইয়াছিল।

ক্রমে ক্রমে লোকের অজ্ঞাতসারেই বৌদ্ধধর্ম্ম এরূপ ভাবে হিন্দুধর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছিল যে, হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তি ও পৌরাণিক কথা এবং বৌদ্ধদিগের দেবমূর্ত্তি ও পৌরাণিক কথা এই উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য উপলব্ধি করা যাইত না; এই জন্যেই বৌদ্ধধর্ম্মের পতন ও হিন্দুধর্ম্মে তাহার সমন্বয় সাসাধিত হইয়াছে।' 'ভিনসেণ্ট স্মিথ' তাঁহার উক্তির সমর্থন কল্পে দৃষ্টান্ত স্বরূপ নেপালে অদ্যাপি বৌদ্ধগণের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, নেপালে অদ্যাপি বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে।

আমার মতে যে কারণে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পতন হইয়াছিল বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের কারণও তাহাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যখন ভগবান্ বুদ্ধের প্রচারিত পরোপকারব্রতের আদর্শ হইতে স্খলিত হইতে লাগিলেন, তখন হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন আরম্ভ হইল। অজ্ঞ ব্যভিচারপরায়ণ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী-গণ উক্ত আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া আর কাহারও শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জ্জন করিতে পারিলেন না। এ যুগে চৈতন্যদেবের অনুবর্ত্তিগণও চৈতন্যের আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া নৈষ্ঠিক হিন্দু সম্প্রদায়ের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহারা 'মুণ্ডিত সম্প্রদায়'—এই বিদ্রূপাত্মক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আজকাল সকলেরই অশ্রদ্ধাভাজন হইয়া পড়িয়াছেন। শঙ্কর নব-বৌদ্ধধর্ম্মের 'শাশ্বত অভাব বাদ' খণ্ডন করিয়া যখন হিন্দুধর্ম্মের "নিত্য সনাতন ভাব বাদ" প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখনই হিন্দুধর্ম্ম নবজীবনে উদ্বুদ্ধ হইল। যখন বৌদ্ধধর্ম্মের পরহিতৈষণাব্রতের আদর্শ ও দার্শনিক গবেষণার আদর্শ এই উভয় আদর্শেরই আকর্ষী শক্তি বিলুপ্ত হইতে লাগিল, তখনই শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু সন্ন্যাসী সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম্মের অভিনব তান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রচার করিতে লাগিলেন। শঙ্করের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের ন্যায়ই জাতিভেদ মানিতেন না। তাঁহারা প্রচার করিতে লাগিলেন যে, এই জগৎ যেরূপ শাশ্বত ও সনাতন হিন্দুধর্ম্মও তদ্রূপ। হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অসার বলিয়া পরিগণিত হইল এবং জনসাধারণের মধ্যে অনেকে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ বা সর্ব্বপ্রধান সমানাধিকারবাদী ইস্‌লাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন।

নেপালে বর্ত্তমান যুগে বৌদ্ধদিগের অবস্থা আমি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমার মনে হয়, বৌদ্ধধর্ম্ম আর না

থাকাই বাঞ্ছনীয়। যখন বৌদ্ধ প্রচারকগণ সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চীন, কোরিয়া, জাপান, শ্যাম, তির্ব্বত, মঙ্গোলিয়া, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি সুদূর দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরবের দিন ছিল; তৎকালে বাঙ্গালীরাও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার কল্পে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বৌদ্ধভারতের সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করিয়া অদ্যাপি প্রত্যেক ভারতবাসীই তাঁহার অন্তরে প্রভূত গৌরব অনুভব করেন।

মৌর্য্যবংশের আদিপুরুষ হিন্দু চন্দ্রগুপ্ত মহান্ ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বৌদ্ধ অশোক চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষা মহীয়ান্ হইয়াছিলেন। অশোকের প্রভাবেই বৌদ্ধধর্ম্ম সার্ব্বজনীন-ধর্ম্ম হইতে পারিয়াছিল। আমার বন্ধু ধর্ম্মপাল ভারতের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর নিকট বুদ্ধদেবের 'দশ সংখ্যক নির্দেশ' ও 'অষ্টবিধ মার্গ' প্রচার করা তাঁহার জীবনের ব্রত করিয়াছেন। এই প্রচার কার্য্য যে ভারতবাসীর পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক তাহা আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি; যেহেতু বুদ্ধ যখন প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখনও জনসাধারণের মধ্যে যেরূপ আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষের অভাব পরিলক্ষিত হইত, অদ্যাপি সেই [রূপই] আছে। মৌর্য্য গুপ্ত ও পালবংশের বৌদ্ধ রাজাদিগের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মের যে প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা বিবৃত করিবার অবকাশ আমার নাই; তথাপি সংক্ষেপে বলিতেছি যে, বঙ্গোপসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে দিল্লী ও জলন্ধর পর্য্যন্ত] ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বতের অধিত্যকা পর্য্যন্ত যে পালবংশীয় রাজাদিগের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, তাঁহারা বঙ্গদেশের মহাগৌরবের কারণ। ধর্ম্মপালই ষট্‌সংখ্যকবিদ্যালয়-সমন্বিত ও সপ্তাধিকশতমন্দিরযুক্ত বিক্রম-শিলার প্রসিদ্ধ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রায় সার্দ্ধ চতুঃশত বর্ষ কাল পালবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ঐ সময়ে বঙ্গদেশ ভারতের একটী মহাশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। পালবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালে শিল্পকর্ম্ম ও জ্ঞান-চর্চ্চার বিশেষ অভ্যুদয় দেখা গিয়াছিল। ধীমান্ ও তৎপুত্র বীতপাল নিপুণ চিত্রকর, 'ব্রোঞ্জ' ধাতুর আবিষ্কারক ও সুদক্ষ ভাস্কররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। পালরাজগণ তাঁহাদের রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিশেষতঃ দিনাজপুরে যে বহুসংখ্যক পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাদের প্রজাহিতপরায়ণতার নিদর্শন এবং তদ্দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে সূর্য্যবংশীয় রাজগণ যেরূপ প্রজাদিগের নিকট যে

কর লইতেন ঐ করের শতগুণ কল্যাণজনক কার্য্য প্রজাদিগের হিতার্থে অনুষ্ঠান করিতেন, পালবংশীয় রাজগণও তদ্রূপই করিতেন।

(ক্রমশঃ)

ভক্তি-কথা।

লেখক—শ্রীআদ্যনাথ কাব্যতীর্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দুঃখ হানি ও সুখপ্রাপ্তি ভগবৎ-সাক্ষাৎকার ব্যতীত হইতে পারে না। মানবের নিকট যাহা সুখ-পদবাচ্য, তাহা দুঃখের অগ্রদূত মাত্র। এজগতে ধন, জন, দারা পুত্র, ঐশ্বর্য্য, মান, প্রতিষ্ঠা, যশঃ এমন কিছুই নাই যাহাতে বিষাদের ছায়াশূন্য সুখ দিতে পারে। তবে, এমত যদি হয়, অনাসক্তভাবে শাস্ত্রোপদেশ মত আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহা হইতে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে—তাহার ফলে জ্ঞান-জন্মিতে পারে—তাহার ফলে মুক্তি হইতে পারে। কিন্তু বিষয়ী আকণ্ঠ বিষয়সাগরে ডুবিয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে। কোন বিধি নিষেধই সে গ্রাহ্য করে না। জগতে নিত্য নব নব ব্যাধি, জলপ্লাবন, ভূকম্প, ঝটিকাবর্ত্ত দুর্ভিক্ষ, তজ্জন্য অসংখ্য লোকক্ষয় এসব কেন হয়? কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি হয় না; যাহা, মনুষ্যের বিপত্তির হেতু, তাহা মনুষ্যের অদৃষ্ট ব্যতীত ঘটে না। শুভাদৃষ্টের শুভফল. দুরদৃষ্টের অশুভফল, ইহা অনিবার্য্য! কারণ ও প্রয়োজন ভিন্ন কিছুই উৎপন্ন হয় না, অন্যথা অকারণকার্য্যোৎপত্তি-দোষ জন্মে। মানবের সুখদুঃখের কারণও সে স্বয়ং। ঈশ্বরে দোষারোপ করিলে, তাঁহার পক্ষপাতিত্ব দোষ জন্মে। ফল কথা, মুক্তি ও বন্ধন মানবের আয়ত্ত। যদি বল, মন তাহাকে যে পথে পরিচালিত করিয়াছে, সে সেই পথেই চলিয়াছে। তাহাহইলে, বুদ্ধি, বিবেক সকল মানবেরই

থাকে, তবে মানব জানিয়াশুনিয়া কুপথে পদার্পণ করে কেন? এই দেহের ভিতর মহামোহের সহিত প্রবোধচন্দ্রের প্রতিনিয়ত যুদ্ধ হইতেছে। একটী প্রবৃত্তির সন্তান, আর একটী নিবৃত্তির সন্তান। কর্ম্মফলে যাহার অন্তররাজ্যে যে পক্ষ বলবান্ হয় তাহারই জয় হয়। এই জীবনসংগ্রামে জয়ী হইত হইতে হইলে আদ্যাশক্তি মহামায়ার শরণাগত হইতে হয়। তিনি যদি শক্তি সঞ্চার করেন, তাহা হইলেই জয়ী হওয়া যায়। গীতায় অর্জ্জুন ও ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে বৃষ্ণিবংশাবতংস! ইচ্ছা না থাকিলেও বলপূর্ব্বক কে পাপপথে নিয়োজিত করে? প্রশ্নোত্তরে ভগবান্ বলিলেন—রজোগুণসমুৎপন্ন কাম, ক্রোধ—ইহারাই বলপূর্ব্বক অনিচ্ছা সত্বেও মানবকে পাপপঙ্কে নিপাতিত করে। উহাদের আশা অপুরণীয় এবং উহারা অতি ভীষণ। ধূম যেমন অগ্নিকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ উহারা বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতঃ মন্দপদার্থে ভাল বোধজন্মাইয়া মনকে নিমগ্ন করে। আত্ম-বিনাশ, নরহত্যা, ব্যভিচার, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, হিংসা, চৌর্য্য, দস্যুতা প্রভৃতি যাবতীয় অসৎকার্য্যই ঐ সব রিপুর প্রেরণায় ঘটিতেছে। শিশুপাল বধ কাব্যে মাঘ কবি লিখিয়াছেন, "বদ্ধমূলস্য মূলংহি মহদবৈরতরোঃস্ত্রিয়ঃ" এক রমণীই জগতে শত্রুতার মূল। কাব্যে পুরাণে, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। কামাদি-রিপু যে বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। বিমল জ্ঞানে কখনও মানব অসৎ কর্য্য করিতে পারে না। সুতরাং বেশ বুঝা যায়, যিনি কামাদিরিপু জয় করিতে সমর্থ হন, মুক্তি তাঁহার করতলগত। জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব যে রিপুর পরতন্ত্র হয় এবং তাহা দ্বারা চালিত হইয়া অত্যা-সক্ত এবং রিপুচরিতার্থ করে, পরজন্মে তাহাকে পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশে পুনরায় সেই রিপুর অধীন হইতে হয়। সুতরাং জনন-মরণ-প্রবাহ নিরুদ্ধ হয় না। খরস্রোতে নীয়মান কোন প্রাণী যেমন নদীকুলস্থ বৃক্ষ-মূল বা বেতসলতাদি সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া আত্ম-রক্ষা করিতে সক্ষম হয়, তদ্রূপ কর্ম্মাকৃষ্ট মানব যদি একান্ত চিত্তে সাধু মহাত্মাদিগের অভয় চরণ ধরিতে পারে, তবেই সে রক্ষা পায়। ভাল লাগুক বা না লাগুক, তবুও শাস্ত্রগুরুর আদেশ মত ধর্ম্মানুশীলন করা কর্ত্তব্য। করিতে করিতে অভ্যাস জন্মে, তাহা হতে বুদ্ধির-বিকাশ হয়, বুদ্ধির-বিকাশ হইলেই পরোক্ষ বিষয় চর্চ্চা করিতে বাসনা জন্মে। তাহা হইতে অন্তর-রাজ্যে অনুসন্ধান আরব্ধ হয়। পরে মনে ভগবৎ সত্তার আভাস প্রতিফলিত হয়। তখন মন আর বিষয়ের দিকে ফিরিয়াও চায়না।

অবশ্য আমি কাহাকে ও স্বীয় আশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বা স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিতে বলিতেছিনা। আমার কথা হইতেছে এই যে, সবাইকেই লক্ষ্য স্থির রাখিতে হইবে। সেই লক্ষ্যই বিশ্বের মুল শ্রীভগবান্। তাঁহাহইতেই আমরা নির্গত হইয়াছি, আবার তাঁহাতেই মিশিতে হইবে, এই উদ্দেশ্য স্থির রাখা আবশ্যক। আর এক ভগবান্ই নিত্য আর সবই অনিত্য—ইহাও মনে রাখিতে হইবে। এ আমার দেশ নহে, এ আমার বিদেশ, আর ভগবচ্চরণই স্বদেশ—ইহা বেশ মনে রাখিতে হইবে। তিনি এ প্রবাসে খেলা করিতে পাঠাইয়াছেন, অনাসক্ত ভাবে তাঁহার প্রতি মন রাখিয়া খেলা করিয়া নিজ দেশে যাইতে হইবে। যত দিন সেই নিজ দেশে না পৌঁছান যাইবে, ততদিন কিছুতেই শান্তি মিলিবেনা। খেলারসাথীগুলিকেও এমত ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, যেন তাহারা আমার মত সবাই স্বদেশে যাইতে সমুৎসুক হয় এবং আমার সহায় হয় মানব-সম্পর্কেই ধরণী দুঃখময়ী হইয়াছে। কেন মানব অদৃষ্টাধীন হইল? তাহার কর্ম্মই তাহার হেতু। পাপ পুণ্য দিয়া ঈশ্বর কাহাকেও জগতে পাঠান নাই। অনাদিকাল জীবের যাতায়াত চলিতেছে। এই যাতায়ত সেই স্বদেশে না যাইতে পারিলে নিবৃত্ত হইবেনা। এই জন্যই ভগবদারাধনার একান্ত প্রয়োজন।

ভগবানের ইষ্টানিষ্ট কিছুই নাই। মানবের নিজ ইষ্টলাভের জন্য ভগবদারাধনার নিতান্ত প্রয়োজন। সত্ত্বাদিগুণ, কামাদিরিপু সমস্তই প্রকৃতিসম্ভূত, প্রকৃতির হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ভগবানের শরণাপন্ন হইতেই হইবে। তাঁহার শরণাগত হইলে সমস্ত প্রবৃত্তিই অন্তর্ম্মুখী হইয়া যায়। সুতরাং তাহাদের অনিষ্টকারিতাশক্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায়। অনাহারে অনিদ্রায় ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় বিষয়ী বিষয়ের চিন্তা করে, তজ্জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। তাদৃশ ঐকান্তিকভাব ভগবদ্বিষয়ে জন্মিলে কখনই ভগবান্ দুর্লভ হয়েন না। বনে, কোণে ও মনে ভজনা করিতে হয়। মন স্থির হইলে, তখন আর কোন বিপদ্ থাকে না। ভগবানের প্রীতি উৎপাদনার্থ কর্ম্ম করিতে হয়। তাহাও না পারিলে, ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে, তখনই বলিতে পারা যায়, "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" যেমত ভাবে, পরিচালিত করিতেছ" সেই ভাবেই কাজ করিতেছি। ধর্ম্ম অল্প মাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ করে। নিজ পুরুষকার প্রকাশে প্রাক্তনকে ধ্বংস করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত বীরের কার্য্য।

অবশ ভাবে কর্ম্মজনিত ভাবস্রোতে ভাসিয়া যাওয়া কাপুরুষতার কার্য্য। এইক্ষণভঙ্গুর মানবজীবন নিশ্চয়ই সকল করিব—এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা চাই। মানবের দ্বিবিধ দৃষ্টি আছে, বাহ্যদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি। বাহ্যদৃষ্টিতে বস্তু ইন্দ্রজাল বিভূতিবৎ দেখিতে পায়। একটী মনোমোহিনী উর্ব্বশীতুল্য রমণী তাঁহার সৌন্দর্য্য, কেশ, বেশ, কটাক্ষ, মধুর হাস্য, হাব-ভাব, কামচেষ্টা, বাহ্যদৃষ্টিতে সহজেই মনুষ্যকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে। ক্রমশঃ তাহার প্রতি আসক্তি, ও লোভ জন্মিতে থাকে। বাসনা পূর্ণ হইবার বাধা জন্মিলে ক্রোধের উদয় হয়। তাহা হইতে অজ্ঞানতা, স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ, তাহারপর নাশ পর্য্যন্ত ঘটে। এইত বাহ্যদৃষ্টির ফল। অন্তরদৃষ্টিতে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে, অস্থি, মাংস, মেদ, মজ্জা, রস, রক্ত, ধমনী, শিরা, চর্ম্ম, এইসব ভিন্ন মনোমোহিনী রমণীমূর্ত্তিতে মনোমোহনের কোন বিষয়ই দেখা যায় না। এই জন্য অন্তশ্চক্ষুর সাহায্যে সমস্ত বস্তুর স্বরূপ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক তাহাতে বৈরাগ্য উৎপাদন করিতে হয়। তাহা হইতে কামাদি রিপু শান্ত হয়। তাহা হইলেই মন স্থির হয়। মন স্থির হইলেই তখন পরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইতে থাকে। এইরূপেই জীবনের ক্রমোন্নতি হইয়া থাকে। বিষয়রাজ্যে যেমন কার্য্য সিদ্ধি জন্য অনেক কাল প্রতীক্ষা করিতে হয়, তাহাতে সহিষ্ণুতা আবশ্যক হয়; সেইরূপ সাধনমার্গেও কাল প্রতীক্ষা ও সহিষ্ণুতার আবশ্যক।

দুদিন ডাকিয়া ভগবান্‌কে পাইলাম না বলিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে চলিবে না। বনিয়াদি চাষা যেমন ফসল হউক বা না হউক চাষ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না; সেইরূপ সাধনমার্গে আজ হইলনা বলিয়া পলায়ন করিলে সব ব্যর্থ হইবে। এমন কোন্ দেশে বা স্থানে ভগবান থাকেন, যেখানে তোমার ডাক পৌঁছে না। তিনি সর্ব্বব্যাপী বিশ্বেশ্বর। তোমার হৃদয়েই তিনি আছেন, মায়া-যবনিকাচ্ছন্নদৃষ্টি তুমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছ না। সাধনা করিলে, অবশ্যই একদিন দেখা পাইবে। বিশ্বাস কর তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। যুগ যুগ ধরিয়া বিচার করিলেও তাঁহাকে জানা যায় না। বিশ্বাস কর তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। যুগ যুগ ধরিয়া বিচার করিলেও তাঁহাকে জানা যায় না। বিশ্বাসের এতই শক্তি, যে, বিশ্বাস বলে শিষ্য তরিয়া যায়, গুরু পড়িয়া থাকেন। এই জন্য ভক্তিশাস্ত্রমতে বিশ্বাস প্রধান সাধন। অন্যে বলেন—অন্ধ বিশ্বাস আশ্রয় করা যায় না। বিশ্বাসের কি চক্ষু আছে?

যে, সে অন্ধ হইবে? এক বলিতে হয় বিশ্বাস, না হয় বলিতে হয় মিথ্যা, কিন্তু সত্য বস্তু কখনও মিথ্যা হয় না। বিশ্বাস, সেই সত্য বস্তুকেই মিলাইয়া দিয়া থাকে। বিশ্বাসের শক্তিতে যদি বস্তু পাওয়া যায়, তবে, বিশ্বাস অবিশ্বাস করিব কেন? ভক্তিমার্গে গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসস্থাপন অবশ্য কর্ত্তব্য। বস্তু লাভ হইলে, তখন বিশ্বাসের উপকারিতা বুঝা যায়। সত্যবস্তু আঁধারেও মিলে, আর মিথ্যা বস্তু আলোকেও মিলে না। ভগবান সত্যবস্তু, তাই বিশ্বাসেও মিলে। ভগবৎসঙ্গ বা ভক্তসঙ্গের এমনি অনির্ব্বচনীয় শক্তি, যে লৌহ স্বর্ণ হইয়া যায়। পুরাণের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন, দেখিতে পাইবেন নরঘাতক, দস্যু রত্নাকর কিরূপ ছিল, পরে নং-সঙ্গে কিরূপ হইয়া গেল। ভক্তের অবস্থা মস্তিষ্কের বিকার নহে, উন্মা[illegible] নহে, অলৌকিক অবস্থা। যুগাবতারদিগকে বিষয়কীট নরপশুরা উন্মাদ [illegible] উপেক্ষা করে। যাহারা নরকের যাত্রী, তাহারা স্বর্গের যাত্রী দিগকে ভু[illegible] নিন্দা করে—ভগবান স্বয়ং আসিলেও মনুষ্যবুদ্ধিতে অগ্রাহ্য করে। ভ[illegible] কৃপা অথবা ভগবৎকৃপা ভিন্ন নিজ শক্তিতে ভগবানকে পাওয়া সুদুর্ল[illegible] তবে তাঁহাকে একান্ত চিত্তে ডাকিতে থাকিলে তিনিই পাবার উপায় অ[illegible] প্রকাশ করিয়া দিয়া থাকেন। সতত যে অনন্যচিত্তে তাঁহাকে স্মরণ ক[illegible] তিনি কি তাহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারেন? ভক্তরাজ মাহাত্মা তুলসী[illegible] বলিয়াছেন, সুখের অবস্থায় লোকে হরিকে ডাকে না, দুঃখে পতিত হইলেই অবিরত ডাকিতে থাকে। অতএব হে প্রভো! আমায় সতত বিপদ্ দাও, যেন সর্ব্বদা তোমায় ডাকিতে পারি। ভক্তের প্রার্থনা অতি সুন্দর, অতি মনোহর। গীতায় ভগবানও অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন পীড়িত, জিজ্ঞাসু, ধনার্থী জ্ঞানী এই চারি প্রকার লোক আমার ভজনা করে। দুরাচার হইয়াও যে ভগবদ্ ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়াই মানিতে হইবে। অসৎপথে পদস্খলন হইলেও ভগবদ্ভক্ত বিনষ্ট হয় না। ভগবান [illegible] তাহাকে পথ দেখাইয়া দেন। অতএব ভগবানের রাতুল চরণে [illegible] হইলে আর কোনই ভাবনা বা ভয় থাকে না। জীবের ভীষণ [illegible]? মৃত্যু ভয়! ভগবচ্চরণাগতের আর মৃত্যুভয় থাকে না। ভয় [illegible]রণ যে স্মরণ করে, তাহার আবার ভয় কি? অগ্নি, শস্ত্র, বিষ, জল, [illegible] কোন পদার্থ হইতেই তাহার মৃত্যুভয় নাই। তাহার জন্মদুঃখই শেষ হইয়া যায়। এককথায় তাহার সমস্ত দুঃখই শেষ হইয়া যায়। সে [illegible]

সুখের অবস্থা, মানব তাহা কল্পনা করিতেও পারে না। জগতে এমন কোন বস্তু আছে যাহাতে আমরা তাদৃশ সুখভাগী হইতে পারি? এমন কে সুহৃদ্ আছে, যে, আমাদিগকে সেই অবস্থায় লইয়া যাইতে পারে? ধন, জন, দারা সুত, সুহৃদ্, সে খানে কার্য্যকর নহে। প্রাণ ছাড়িয়াও যদি ভগবান্‌কে পাওয়া যায় তবে, সেও মহাসৌভাগ্য। কেনন, আমরা চাই সুখসিন্ধু গোকুলইন্দুনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে। সংসারকারামুক্ত করিয়া যদি তিনি আমাদিগকে কাছে ডাকিয়া লন্ তাহা হইলে, আমরা চিরকৃতার্থ হইয়া তাঁহার চরণে বিক্রীত হইয়া রই। যার সঙ্গ জীবমাত্রেরই একান্ত প্রার্থনীয় ও ইষ্ট, ব্রজাঙ্গনাগণ যদি তাহাই লাভ করিয়া থাকেন, তবে, তাঁহারা বিশ্বজননমস্য না হই। নিন্দার পাত্র হইবেন কেন? এবিষয় পূর্ব্বে আমি বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি। না জানিলেও ভগবানই যে জীবের একমাত্র প্রিয়, ইহা যথার্থ। তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারা যায় না। তিনিই একমাত্র প্রেমাস্পদ ও আরাধ্য। আমরা সামান্য মানবের জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইব, "যদি তাহাকে পাই তবেই ঘরে ফিরিব, নচেৎ এজীবন বিসর্জ্জন করিব।" ভগবানের জন্য সেরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই না কেন? সমস্ত জীবনটাই সংসার চিন্তায় গত হইল, পুত্রের চিন্তা, ধনের চিন্তা, পত্নীর চিন্তা, বিষয়—বিভবের চিন্তা, এইরূপ নানা চিন্তায় অমূল্য জীবন-কাল শেষ হইল। কিন্তু যাহাদের জন্য জীবনপাত করিলাম তাহারা আমার জীবনের—আত্মার কি উপকার সাধন করিল? যদি বল, পুত্র ধনোপার্জ্জন দ্বারা, পত্নী সেবা শুশ্রূষাদ্বারা তোমায় সুখী করিয়াছে। সত্যকথা, কিন্তু তাহারা আমার পারলৌকিক জীবনের কি হিত সাধন করিয়াছে? এখন কেহ যদি আমায় ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিত তবে সে, নিতান্ত পর হইলেও আমার প্রিয়সুহৃদ্‌স্থানীয় হইত। যে, জীবনের ইষ্ট সাধন করে, সেই ইষ্ট। যে পথ দেখাইয়া দিয়া থাকে, সেই বন্ধু। যে গুরু জগদ্‌গুরুকে দেখাইয়া দিয়া সুখী করিতে অসমর্থ, তিনি অর্থগৃধ্নু মাত্র। আমার সাধন সম্বল, পুণ্যবল নাই, সুতরাং আমি চাই ভগবানের দয়া। কাঙ্গাল দেখে যদি তিনি দয়া করেন, তবেই আমি চরিতার্থ হইতে পারি। নচেৎ আমার শক্তি নাই, ভক্তিও নাই। যিনি সংসার-পারাবার হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ গুরু; তাঁহার ঋণ অপরিশোধ্য। ধর্ম্মদর্শী ঋষিগণ দেখিয়াছেন, এক ভগবান ভিন্ন অন্য কোন পদার্থে সুখ নাই।

সুতরাং ভগবানই জীবনের একমাত্র প্রার্থনীয়। কিন্তু, পথের বিশ্বের বাধা, সেও আমার কর্ম্মফল। কামাদি প্রবল রিপু, সতত ইন্দ্রিয়গণকে কুপথে পরিচালিত করিতেছে। মনও তাহাদের অধীন। সুতরাং যে সর্ষপ দিয়া ভূত তাড়াইব, তাহাকেই ভূতে পাইয়াছে। এমত অবস্থায় এক ভগবানের কৃপা ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। তাই কি তাঁহাকে ভাবিতে পারি, না ডাকিতে পারি। যখন তাঁহাকে স্মরণ করিতে বসি, তখনই একটা না একটা সংসারের কাজ আসিয়া উপনীত হয়। অমনি সে ভাবটুকু হারাইয়া যাই। এমন কোন দয়ালু মহাত্মা আছেন, যিনি দগ্ধ উদরটা যাহাতে জয় করিতে পারি তাহার উপায় বলিয়া দেন। তাহা হইলে, এই মুহূর্ত্তেই ছার সংসার ত্যাগ করির। গৃহাদি দগ্ধ করিয়া বনাশ্রমে চলিয়া যাই। যদি উদরের চিন্তা কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হয়, তবুও সংসারের কোলাহল সতত শ্রবণে প্রবেশ করে। আমি চাই স্বর্ণ, পাই ধুলিমুষ্টি। সমস্তই আমার দুর্ভাগ্য। কমলাকান্তের যাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি হয়, তাহার কোনই অভাব থাকে না। একটী সামান্য পক্ষী পুষিলে তাহার বিরহ সহ্যকরা যায় না, যাহারা ভগবৎসঙ্গ সুখ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের ভগবদ্বিরহ কত অসহ্য, তাহা আমরা কল্পনা করিতেও পারিনা। বৃন্দাবন হইতে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে তাঁহার বিরহে ব্রজের পশুপক্ষিগণ ও আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিল। ব্রজাঙ্গনাদিগের কৃষ্ণবিরহের তীব্র যাতনার সহস্রাংশের একাংশও যদি আমাদের হৃদয়ে উদয় হয়, তাহা হইলে অনায়াসে আমরা ভগবানকে পাইতে পারি। ব্রজলীলার বিষয় অনুভব করা মনুষ্যবুদ্ধির দুরধিগম্য ব্রজবাসিগণের মত সৌভাগ্য দেবগণেরও নাই, আমরা কোন্ ছার কীট। যাহারা ভগবানের অনুসন্ধান করিয়াছে, তাহারা না পাইলে বলিতে পারে, আমরা ভগবানকে পাইলাম না। আমরা কখনও ভগবানের নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করি না, তখন আমরা কিরূপে বলিতে পারি যে, ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। কিন্তু, তাঁকে পাওয়া চাই, নচেৎ ধর্ম্ম কথামাত্রে পর্য্যবসিত হয়। কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার, সাজসজ্জা, শঙ্খ, ঘণ্টা, ফুলচন্দন ছড়ান, গালবাদ্য প্রভৃতি ধর্ম্ম নহে। সাধারণ জ্ঞান, জ্ঞান নহে। নিশ্চিত জ্ঞানের বিষয় যে, ভগবান্ তিনিই ব্রহ্ম। জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এই তিনটী বিষয় চাই। জ্ঞাতা জীবাত্মা, জ্ঞেয় ভগবান, জ্ঞান তাঁর প্রত্যক্ষ। এই হইলেই ধর্ম্ম পূর্ণাঙ্গ হইবে। সাধনার পথে যিনি অগ্রসর তাঁহাকেও ধার্ম্মিক বলা যায়। কিন্তু সমস্ত

বাসনা বলি দিয়া একমাত্র ভগবান্‌কেই প্রার্থনা করিতে হইবে। ভক্তিশূন্য জ্ঞানও বৃথা, যোগও বৃথা। ভগবান বলিয়াছেন. হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়মন্দিরে বিরাজ করেন। ভগবদ্বাক্য সার্থক করা আবশ্যক। হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া জ্ঞান নয়নে তাঁহার চরণ যুগল দেখিয়া শ্রদ্ধা-চন্দনে, ভক্তি-প্রসূনে সেই চরণযুগল অর্চ্চনা করিয়া, হৃদয়-সিংহাসনে স্থাপন করিতে হইবে। ভগবান বলিয়া দিয়াছেন, হৃদয়েই ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন, দেশান্তর খুঁজিতে হইবে না, মাঠে, ঘাটে, মন্দিরে, মসজিদে, অনুসন্ধান জন্য ছুটিতে হইবে না। নৈষধচরিতরচয়িতা কবি শ্রীহর্ষ নৈষধকাব্যে লিখিয়াছেন' সবিধেঽপিনসূক্ষ্ম সাক্ষিণী, বদনালঙ্কৃতম ভ্রমক্ষিণী' আমাদের এই যে চক্ষুরিন্দ্রিয়, নিকটস্থ সূক্ষ্ম বস্তুও প্রত্যক্ষ করিয়া সাক্ষী দিতে পারেন, সে কেবল মুখের শোভাজনক। চক্ষুর ন্যায় আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রমাণ দিতে পারে না। অতএব ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের সত্যতা বিষয়ে নিশ্চয় করা যায় না তাহা হইলে ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবান প্রত্যক্ষীভূত নহেন, সুতরাং তিনি অসিদ্ধ, একথা বলা চলে না। তিনি নিশ্চয়ই আছেন, নচেৎ বিশ্ব প্রপঞ্চ থাকিত না, ইহাই প্রমাণ। তিনি মনুষ্যকল্পিত প্রমাণের বহির্ভূত। মানব যখন ভ্রম-প্রমাদশূন্য নহে, তখন তাহার নির্দ্দিষ্ট প্রমাণও অভ্রান্ত নহে।

(ক্রমশঃ)

—:০:—